উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই ১২B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স', 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং 'ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি

উপাচার্য

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Commerce (Honours) Commerce (NCO)
Course Type: Discipline Specific Elective (DSE)

Course Title : উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং স্টার্ট আপ
(Entreprenenship Development and Start Ups)
Course Code: NEC-MG-03

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, 2025
First Print : March, 2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি ও জাতীয় শিক্ষানীতি (2020) অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission & NEP-2020.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Bachelor of Commerce (Honours) Commerce (NCO)

Course Type: Discipline Specific Elective (DSE)

Course Title : উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং স্টার্ট আপ

(Entreprenenship Development and Start Ups)

Course Code: NEC-MG-03

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

ড. অনির্বাণ ঘোষ
(Chairperson)
Professor of Commerce, NSOU

ড. সজল কুমার মাইতি
Professor of Commerce (PG Dept.)
Goenka College of Commerce
Business Administration

সি.এ. শুভায়ন বসু
Former Associate Professor of Commerce
Ananda Mohan College

ড. বিশ্বজিৎ ভদ্র
Associate Professor, NSOU

ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce
NSOU

চিত্তরঞ্জন সরকার
Professor of Commerce
NSOU

ড. আশিস কুমার সানা
Professor of Commerce
University of Calcutta

ড. সুদর্শন রায়
Asst. Professor of Commerce,
NSOU

: রচনা :

ড. বিশ্বজিৎ ভদ্র
Associate Professor, NSOU

: সম্পাদনা :

ড. উত্তম কুমার দত্ত
Professor of Commerce, NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :

ড. সুদর্শন রায়
Asst. Professor of Commerce,NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অনন্যা মিত্র

নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Course Type: Discipline Specific Elective (DSE)
Course Title : উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং স্টার্ট আপ
(Entreprenenship Development and Start Ups)
Course Code: NEC-MG-03

পর্যায়-১

একক–1 : উদ্যোক্তা 9

একক–2 : উদ্যোগ 32

একক–3 : উদ্যোক্তার গুণাবলী 49

একক–4 : উদ্যোগের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন 60

পর্যায়-২

একক–5 : উদ্যোগ গ্রহনের সহযোগী বিষয়সমূহ 75

একক–6 : কারবারি ধারণা উৎসসমূহ এবং সম্ভাব্যতা 90

একক–7 : সম্পদ সংগ্রহ এবং ভারতবর্ষে পারিবারিক কারবারি উদ্যোগ 118

একক–8 : নতুন উদ্যোগ 144

পর্যায়-১

উদ্যোগ উন্নয়ন এবং নতুন উদ্যোগ (স্টার্টআপ)

[Entrepreneurship Development and Start Ups]

একক–1 : উদ্যোক্তা [Entreprenent]

1.0 উদ্দেশ্য
1.1 প্রস্তাবনা
1.2 ভূমিকা
1.3 উদ্যোক্তা—অর্থ ও সংজ্ঞা
1.4 উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য
1.5 উদ্যোক্তার কার্যাবলি
1.6 উদ্যোক্তার ধরণ
1.7 সারাংশ
1.8 প্রশ্নাবলি

1.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবস্থিত হবেন—

- উদ্যোক্তা সম্পর্কে ধারণা
- উদ্যোক্তার অর্থ ও সংজ্ঞা
- উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য
- উদ্যোক্তার কার্যাবলি
- উদ্যোক্তার ধরণ

1.1 প্রস্তাবনা

সাধারণভাবে উদ্যোগ বা উদ্যোগ গ্রহণ হল এক মানবিক প্রচেষ্টা যা লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়।, উদ্যোগ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপাদান। এটি প্রথম এক প্রচেষ্টা যা ঝুঁকিবহুল এবং যার মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন থাকে। এই উদ্যোগ গড়ে তুলতে উদ্যোক্তার প্রয়োজন কারণ উদ্যোক্তা না থাকলে উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং উদ্যোগ হল উদ্যোক্তাদের পরিশ্রমের ফসল যা কোনো নতুন সুযোগের বাস্তবায়ন ঘটায়। উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকে যা না থাকলে উদ্যোগ উন্নয়ন সম্ভব নয়। উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরণ আছে যেমন অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তা, সামাজিক উদ্যোক্তা, প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা ইত্যাদি। কীভাবে উদ্যোক্তা উদ্যোগ উন্নয়নে সাহায্য করে তা এই একক থেকে ধারণা পাওয়া যাবে।

1.2 ভূমিকা

সাধারণভাবে উদ্যোগ বা উদ্যোগ গ্রহণ হল এক মানবিক প্রচেষ্টা যা লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সবধরনের মানবিক প্রচেষ্টাই কারবারি জগতে উদ্যোগ হিসাবে গণ্য হয় না। অর্থনীতিবিদ্‌রা উৎপাদনের উপাদান হিসাবে **মূলধন, কাঁচামাল** ও **শ্রমের** সাথে সাথে **উদ্যোগকেও** একটি উপাদান হিসাবে গণ্য করেন। কাজেই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপাদান। বস্তুত উদ্যোগ হল এমন এক প্রচেষ্টা যা **ঝুঁকিবহুল, গতানুগতিক কারবারি প্রচেষ্টা নয়** এবং যার মধ্যে **সৃজনশীলতা** ও **উদ্ভাবন** থাকে। অর্থাৎ উদ্যোগের মধ্যে নতুনত্ব যেমন থাকে তেমনি উদ্যোক্তার মধ্যেও উদ্ভাবনী ক্ষমতা থাকতে হবে। সেকারণে 'উদ্যোগ' মানুষের চারিত্রিক গুণাবলি হিসাবেও গণ্য হয় প্রচলিত প্রবচন হিসাবে প্রায়শই শোনা যায় যে, 'উদ্যোগী মানুষেরাই সাফল্য লাভ করে'। অর্থাৎ যাদের মধ্যে সাহস, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তা থাকে তারাই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। যদিও উদ্যোগ শব্দটি সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারবারি ক্ষেত্রে উদ্যোগ বলতে বোঝায় এক নতুন ধরনের কারবার বা কারবারি প্রক্রিয়া যা আগে পরীক্ষিত হয়নি এবং যা নতুন এক ব্যবসায়িক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উদ্যোগের মাধ্যমে কারবারের বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটে। এছাড়াও কোনো অঞ্চল বা সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোনো আকর্ষণীয় সুযোগকে সদ্ব্যবহার করে যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেন তখনই উদ্যোগের সূচনা হয়। উদ্যোগজনিত সুযোগ বলতে সেই পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বোঝায় যাতে নতুন পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হয় বা প্রক্রিয়া বা সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় বা নতুন কোনো বাজারে উৎপাদন মূল্যের থেকে বেশি মূল্যে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং কোনো নতুন পণ্য বা সেবা বা নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বা নতুন বাজার উদ্ভাবনও উদ্যোগ হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং উদ্যোগের মূল বিষয়টি হল প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে নতুন কোনো উদ্ভাবন যা নতুন পণ্য বা সেবা হতে পারে, নতুন কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে পারে বা নতুন বাজারে পণ্য বা সেবার উপস্থাপন হতে পারে। অর্থাৎ উদ্যোগের মধ্যে নতুনত্ব (newness) থাকতেই হবে। এই নতুনত্ব আবার সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের উপর অনেকটাই নির্ভর করে। পরিবেশ-পরিস্থিতি সদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতা যেমন অনেক পুরানো ধ্যান-ধারণা, পদ্ধতি-প্রকরণ, পণ্য বা সেবার ধ্বংস করে তেমনি সাথে সাথে নতুন নতুন সুযোগের সৃষ্টি করে। সেকারণেই অনেকে উদ্যোগকে **'ধ্বংসাত্মক সৃজনশীলতা'** বলে অভিহিত করেন। তবে পরিবর্তনশীল জগতে এই নতুন নতুন সুযোগ সকলের চোখে পড়ে না। যারা এর সন্ধান পায় তাদেরই উদ্যোক্তা বলা হয়। উদ্যোক্তারাই সুযোগ-সন্ধানী ও তারা নতুন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উদ্যোগ গড়ে তোলে ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে উন্নত করে। এর ফলেই সুযোগের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়, শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ ও সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

পরিশেষে উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনায় সংক্ষেপে বলা যায় যে উদ্যোগ হল কোনো নতুন সুযোগের সম্ভাবনার বাস্তবায়ন যা এক বা একাধিক ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এবং যার ফলে

নতুন কোনো পণ্য বা সেবার উদ্ভাবন ঘটে বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন কোনো পদ্ধতির প্রবর্তন হয় যার ফলে উৎপাদন মূল্য হ্রাস পায় বা নতুন কোনো ব্যবসার মাধ্যমে বা প্রচলিত ব্যবসার মাধ্যমে নতুন কোনো বাজারে পণ্য বা সেবার উপস্থাপনা করা হয়। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় যেমন ঝুঁকি থাকে তেমনি সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতাও থাকে।

1.3 উদ্যোক্তা—অর্থ ও সংজ্ঞা

উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা সমার্থক। একটিকে বাদ দিলে অন্যটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। উদ্যোগ গড়ে তুলতে উদ্যোক্তার প্রয়োজন হয়—কারণ উদ্যোক্তা না থাকলে উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে না। উদ্যোক্তা হল এক বা একাধিক ব্যক্তি যারা মুনাফার উদ্দেশ্যে কোনো নতুন ধরনের ব্যবসা গড়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে উদ্যোগ হল উদ্যোক্তাদের পরিশ্রমের ফসল যা কোনো নতুন সুযোগের বাস্তবায়ন ঘটায়। যদিও উদ্যোগ কথাটি অর্থনৈতিক পরিসীমার মধ্যেই বেশি ব্যবহৃত হয় এবং অর্থনীতিবিদরা, 'উদ্যোগকে' উৎপাদনের উপাদান হিসাবে গণ্য করেন তবুও উদ্যোগকে সবসময়ই অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা ঠিক নয়। সামাজিক উদ্যোগও একধরনের উদ্যোগ যেখানে মুনাফা অর্জন মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

'উদ্যোক্তা' শব্দটি তুলনামূলকভাবে নতুন এবং ফরাসি শব্দ 'entreprendre' থেকে এটি উদ্ভূত হয়েছে। এর অর্থ হল একজন সংগঠক যে বিনোদনমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য শিল্পীদলের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু উদ্যোক্তার এই অর্থগুলি বর্তমানে অপ্রচলিত বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এর কারণ হল উদ্যোক্তা শব্দটি খুব বেশি প্রাচীন নয় এবং এর অর্থ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন শতকে এর অর্থ যেভাবে ব্যবহৃত হত তা নীচের সারণীতে তুলে ধরা হল।

সময়কাল (Period)	**যে অর্থে ব্যবহার হত (Meaning used)**
ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে	যেসব ব্যক্তি সামরিক অভিযানের সঙ্গে যুক্ত থাকত তাদের উদ্যোক্তা বলা হত।
সপ্তদশ শতকে	যেসব ব্যক্তি প্রযুক্তিমূলক কার্য-কলাপের সাথে যুক্ত ছিল অর্থাৎ কোনো কিছু নির্মাণ বিশেষত দুর্গ নির্মাণ করত তাদের উদ্যোক্তা বলা হত।
অষ্টাদশ শতকের শুরুতে	যে ব্যক্তি অর্থনৈতিক ও মানবিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকত তাদের উদ্যোক্তা বলা হত।

বস্তুত ফরাসি অর্থনীতিবিদ রিচার্ড কেন্টিলন (Rechard Cantilon) প্রথম কারবারি ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে উদ্যোক্তা হল সেই ব্যক্তি যে উৎপাদনের উপাদান ক্রয় করে যাতে সেগুলি সংযুক্ত করে একটি বিপণনযোগ্য পণ্য তৈরি করতে পারে। তখন থেকেই উদ্যোক্তা বলতে এমন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বোঝায় যে বা যারা একটি নতুন ব্যবসা গড়ে তোলার ঝুঁকি বহন করে বা

কোনো নতুন ধারণা, পণ্য বা সেবার প্রচলন করে। উদ্যোক্তা কথাটি 1933 সালে পরিমার্জিত হয়েছিল এবং কারবারি ক্ষেত্রে এর জায়গা হয়েছিল এবং এর সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে বলা হয়েছিল 'যে ব্যক্তি কোনো উদ্যোগের দায়িত্ব গ্রহণ করে বিশেষত একজন ঠিকাদার যে মূলধন ও শ্রমের মধ্যবর্তী হিসাবে কাজ করে'।

উদ্যোক্তার সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় যে উদ্যোক্তা হল এক বা একাধিক ব্যক্তি যারা কারবারি সুযোগকে সনাক্ত করে, কারবারি উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে এবং কারবারের অসুবিধাগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে সৃজনশীল সমাধান প্রয়োগ করে ও কারবারের ঝুঁকি বহন করে। অপর একটি উদ্যোক্তার সংজ্ঞা খুবই যথাযথ বলে মনে করা হয়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী 'উদ্যোক্তা হল এমন এক ব্যক্তি যে তার পরিবেশের মধ্যে নতুন পরিস্থিতিকে চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করে এবং প্রয়োজনমতো অর্থনৈতিক ববস্থার মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করে।' এগুলি ছাড়াও উদ্যোক্তার অন্যান্য যেসব সংজ্ঞা গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হল।

আন্তর্জার্তিক শ্রমিক সংগঠন (ILO) প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—"উদ্যোক্তা হল সেইসব ব্যক্তি যাদের কারবারি সুযোগ দেখার ও মূল্যায়ন করার ক্ষমতা রয়েছে এবং যারা প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে যাতে সাফল্য সুনিশ্চিত হয়।"

রিচার্ড ক্যান্টিলন (Richard Cantillon) প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং তিনি অনিশ্চিয়তার বিষয়টি তাঁর সংজ্ঞায় তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে "একজন উদ্যোক্তা হল এমন ব্যক্তি "যে উৎপাদনের উপাদানগুলি নির্দিষ্ট দামে ক্রয় করে অনিশ্চিত দামে প্রিয় করার উদেশ্যে"।

2008 সালে ভারতের National Knowledge Commission প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী উদ্যোক্তা হল—"জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতার পেশাগত প্রয়োগ এবং কোনো ধারণাকে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে যে বা যেসব ব্যক্তি কোনো কারবারি সংস্থা গড়ে তোলে বা কোনো প্রতিষ্ঠিত কারবারে বৈচিত্র্য আনার উদেশ্যে কোনো কার্যকলাপ গ্রহণ করে যার মাধ্যমে সম্পদের সৃষ্টি হয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় ও সামাজিক সুফল পাওয়া যায়।"

পরিশেষে উদ্যোক্তার সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে উদোক্তা হল এক বা একাধিক ব্যক্তি যারা পরিবেশের পরিবর্তনের সুযোগকে সনাক্ত করে, সৃজনশীলতার দ্বারা সুযোগের উন্নয়ন ঘটায় এবং তা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে অর্থনৈতিকভাবে সে বা তারা এবং সমাজ উপকৃত হয় এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ঝুঁকি বহন করে। সংক্ষেপে উদ্যোক্তা হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাণ্ডারী।

1.4 উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য

উদ্যোক্তার মধ্যে কিছু বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং তার জন্যই তারা কারবারি জগতে অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য হয়। উদ্যোক্তা একজন ব্যক্তি হতে পারে বা একাধিক ব্যক্তি হতে পারে যারা কারবারি ক্ষেত্রে নতুন কোনো পণ্য বা প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে একটি কারবারি সংস্থা গড়ে তোলে।

তাদের বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা অন্যান্য কারবারিদের থেকে আলাদা। এগুলিকে তাদের চারিত্রিক গুণাবলি হিসাবেও গণ্য করা যায়। নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

1. **নূতনত্বের প্রবর্তন** (Innovativeness) : উদ্যোক্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নূতনত্বের প্রবর্তন। গতানুগতিক কারবারি ধারণার বাইরে গিয়ে উদ্যোক্তা নূতন কিছু প্রবর্তনের পরিকল্পনা করে। এর মধ্যে যেমন নূতন পণ্য প্রবর্তন থাকতে পারে, তেমনি নূতন উৎপাদন পদ্ধতি বা নূতন বাজার বা নূতন কারবার বা নূতন বন্টন পদ্ধতি ইত্যাদি থাকতে পারে। তবে মূল কথা হল যে প্রচলিত ও গতানুগতিক ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে নূতন কিছু করতে হবে। নূতনত্বের প্রবর্তন হল ধারাবাহিক অনুসন্ধান যার উদ্দেশ্য হল সুযোগকে সনাক্ত করা বা নূতন ধারণা বা নূতন পণ্য প্রবর্তন করা।

2. **সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা** (Need for Achievement) : উদ্যোক্তার মধ্যে সাফল্যের চাহিদা থাকে। কারণ এই চাহিদা না থাকলে তার পক্ষে নূতন কিছু প্রবর্তনের ঝুঁকি বহন করা সম্ভব নয়। এই চাহিদাই তাকে সাফল্যের জন্যই লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে। **ম্যাকলিল্যান্ড**-এর (Mcclelland) সাফল্যের চাহিদা তত্ত্বটি উদ্যোগের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। এই তত্ত্ব অনুসারে উদ্যোক্তার মধ্যে যদি সাফল্যের চাহিদা না থাকে তাহলে তার মধ্যে প্রচেষ্টা অর্থাৎ সফল হওয়ার ইচ্ছা গড়ে ওঠে না। একজন ব্যক্তি যার মধ্যে সাফল্যের তীব্র চাহিদা থাকে, সে বা তারা নিজেরাই সমস্যার সমাধান করতে পারে। নিজেদের প্রচেষ্টার দ্বারাই একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি পেরিয়ে যায় এবং তারা উচ্চ কর্ম-দক্ষতার দ্বারা নূতন কিছু প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সফল হয়।

3. **নিয়ন্ত্রণের সঞ্চারপথ** (Locus of Control) : নিয়ন্ত্রণের সঞ্চারপথ হল এমন এক বৈশিষ্ট্য যা একজন ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন সমস্যা কীভাবে সমাধান করবে সে ব্যাপারে ধারণা দেয়। আর একজন উদ্যোক্তাকে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাই তার ক্ষেত্রে এই সঞ্চারপথের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এরূপ সঞ্চারপথ দু'ধরনের—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। যে ব্যক্তির মধ্যে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের সঞ্চারপথ থাকে তারা সাধারণত দৃঢ়চেতা হয় না। তারা ভাগ্য বা নিয়তির উপর সবকিছু ছেড়ে দেয় এবং পরিস্থিতি মোকাবিলা করার কোনো প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। কাজেই এরূপ ব্যক্তি উদ্যোক্তা হতে পারে না।

   অন্যদিকে যেসব ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ সঞ্চারপথ থাকে তারা সবকিছু পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ছেড়ে দেয় না। তারা মনে করে ভাগ্য নয়, প্রচেষ্টার দ্বারাই ভাগ্য গড়ে তুলতে হয়। তাই তারা প্রতিকূল পরিবেশকে কীভাবে অনুকূল করা যায় তার জন্য চেষ্টা চালায়। সেজন্যই বলা হয় যে একজন উদ্যোক্তার মধ্যে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সঞ্চারপথ থাকা প্রয়োজন।

4. **ঝুঁকি বহনের ইচ্ছা** (Will of risk bearing) : কারবারি ক্ষেত্রে কম-বেশি ঝুঁকি থাকেই। সেজন্যই বলা হয় যে কারবারের মুনাফা হল ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। একটি উদ্যোগের ক্ষেত্রেও ঝুঁকি থাকে এবং বলা ভালো যে উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ বেশিই। কারণ উদ্যোগ হল এমন এক কারবারি প্রচেষ্টা যা আগে পরিক্ষীত হয়নি। গতানুগতিক কারবার থেকে উদ্যোগ

অনেকাংশেই পৃথক। উদ্যোক্তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে তাদের মধ্যে ঝুঁকি বহনের মানসিকতা ও ইচ্ছা দুই-ই থাকতে হবে।

5. **অনিশ্চয়তাকে বরদাস্ত করা** (Tolerance for uncertainty) : কারবারি জগৎ অনিশ্চয়তায় ভরা। অনিশ্চয়তা হল এমন এক অবস্থা যা উদ্দেশ্য গঠনের অন্তরায় বা বাধা হিসাবে কাজ করে। একজন উদ্যোক্তার অনিশ্চয়তা অর্থাৎ অনিশ্চিত পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তা বিচলিত হয়ে পড়লে সমস্যা আরো জটিল হয়ে যায়। সেকারণে অনিশ্চয়তাকে মোকাবিলা করার জন্য একজন উদ্যোক্তাকে আরও বেশি করে পরিস্থিতি-সচেতন হতে হয়, কৌশলী, সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হয়। একজন দক্ষ উদ্যোক্তার মধ্যে এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

6. **আত্মবিশ্বাস** (Self Confidence) : আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরাই জীবনে সাফল্য পায়। যেসব ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস কম তারা সহজে সাফল্য পায় না। আত্মবিশ্বাস হল একজন মানুষের মানসিক অবস্থা যা তাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহস দেয় এবং সাফল্যের দিকে চালনা করে। একজন উদ্যোক্তার মধ্যে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে নিজের প্রতি আস্থা অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস থাকে। এর জোরেই সে একটি উদ্যোগ গড়তে এগিয়ে আসে এবং উদ্যোগের কাজকর্ম পরিচালিত করে ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকে।

7. **ধনাত্মক প্রেরণা** (Positive Motion) : প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিত্বের অনুভূতি ও আবেগ থাকে যা তাদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ক্রিয়াশীল করে। এই ক্রিয়াশীল করার পিছনে থাকে প্রেরণা। প্রেরণা ধনাত্মক হলে কাজের মধ্যে গতি আসে, সহজেই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হয়। ধনাত্মক প্রেরণা ব্যক্তিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কাজেই একজন উদ্যোক্তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যও পুরোদমে বর্তমান থাকে। অন্যথায় তার পক্ষে অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করে ও ঝুঁকি বহন করে উদ্যোগ গঠন ও উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

8. **সৃজনশীলতা** (Creativity) : উদ্যোক্তার সৃজনশীল ধারণার উপর উদ্যোগ গড়ে ওঠে। সৃজনশীলতা ধনাত্মক প্রেরণা ও নতুনত্ব প্রবর্তনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। নতুন উদ্যোগ গঠনের পিছনে সর্বাধিক অবদান থাকে সৃজনশীলতার। কাজেই উদ্যোক্তা একজন সৃজনশীল মানুষ হিসাবে গণ্য হয়। এরকম বহু কারবারি ধারণার উদ্ভব হয়েছে সৃজনশীলতার মাধ্যমে। তবে এরূপ ধারণা এমন হবে যাতে বাস্তব জগতে সেগুলি বাণিজ্যিকভাবে সম্পাদনযোগ্য হয়।

9. **সুযোগের সনাক্তকরণ** (Identification of opportunity) : আমাদের পরিবেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তনই নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে সবাই এই পরিবর্তন লক্ষ করলেও এই পরিবর্তনের ফলে যে সুযোগের সৃষ্টি হয় তা অনুধাবন করতে পারে না। কিন্তু উদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যার দূরদৃষ্টি রয়েছে এবং সে পরিবর্তনজনিত সুযোগ অনুধাবন করতে পারে এবং এই সুযোগকে ফলপ্রসূ করার জন্যই উদ্যোগ গড়ে তোলে। কাজেই একজন উদ্যোক্তার পরিবেশের পরির্বতন-জনিত সুযোগ অনুধাবন করার

বৈশিষ্ট্য আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে। কারণ সুযোগ হল বীজ যা উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে মহীরূহে পরিণত হয়।

1.5 উদ্যোক্তার কার্যাবলি

একজন উদ্যোক্তায় কার্যাবলি শুধু হয় কারবারি ধারণার চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে এবং শেষে হয় উদ্যোগের প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া ও তা পরিচালনার মধ্য দিয়ে। 1971 সালে **পিটার কিলবি** (Peter Kilby) উদ্যোক্তার তেরোটি কাজের উল্লেখ করেছিলেন। এই তালিকা অনুযায়ী উদ্যোক্তার কাজ শুরু হল কারবারি ধারণার উন্মেষ এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও ভালো কারবারি ধারণা নির্বাচনের মাধ্যমে। এছাড়াও কারবারের উদ্দেশ্য স্থির করা, প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ, পণ্য বিশ্লেষণ ও বাজার গবেষণা, কর্মী সংগ্রহ ও কারবারি কার্যকলাপ শুরু করা ইত্যাদি তার কাজের মধ্যে পড়ে। তবে বোঝার সুবিধার জন্য উদ্যোক্তার কার্যাবলিকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল—

1. উদ্যোগ সংক্রান্ত কার্যাবলি
2. ব্যবস্থাপনামূলক কার্যাবলি
3. প্রসারমূলক কার্যাবলি
4. বাণিজিক কার্যাবলি।

নীচে প্রতিটি কার্যাবলি সংক্রান্ত ধারণা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

1. উদ্যোগ সংক্রান্ত কার্যাবলি (Entrepreneural functions): উদ্যোগ সংক্রান্ত কার্যাবলি বলতে বোঝায় মুলত ঝুঁকি বহন, সংগঠন গড়ে তোলা ও নুতনত্বের প্রবর্তন করা। একজন উদ্যোক্তাকে এই কাজগুলি আবশ্যিকভাবে সম্পাদন করতে হয়। নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

(a) **ঝুঁকি বহন** (Risk-bearing) : উদ্যোগ হল ঝুঁকির কাজ কারণ অনিশ্চয়তার মধ্যে উদ্যোগ গড়ে তুলতে হয়। **রিচার্জ ক্যান্টিলন** একজন উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের কাজকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন আঠারো শতকে। অনিশ্চয়তার ঝুঁকি আগে থেকে নির্ধারণ করা যায় না এবং এই ঝুঁকি বিমাযোগ্যও নয়। উদ্যোক্তাকে যেসব অর্থনৈতিক কাজ করতে হয় তা অনিশ্চয়তার ঝুঁকি বহন করেই করতে হয়। আর এই ঝুঁকি বহন করতে না চাইলে উদ্যোগ গড়ে তোলাই সম্ভব হয় না। কাজেই উদ্যোক্তার প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল উদ্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি বহন করা।

(b) **সংগঠন গড়ে তোলা** (Organising) : সাধারণভাবে সংগঠন বলতে বোঝায় উদ্যোগের সাংগঠনিক কাঠামোয় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন করা ও কর্ম পরিবেশ গড়ে তোলা। সুতরাং উদ্যোক্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কারবারি প্রতিষ্ঠানে একটি মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা যাতে উদ্যোগের উদ্দেশ্য সহজেই পূরণ হয়।

(c) **নূতনত্বের প্রবর্তন বা উদ্ভাবন সংক্রান্ত কাজ** (Function as innovator) : **জোসেফ. এ. স্যুম্পিটার** (Joseph A. Schumpeter) 1934 সালে উদ্যোক্তাকে নুতনত্বের প্রবর্তনকারী হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে একজন আবিষ্কারক নতুন পদ্ধতি, নতুন পণ্য, নতুন কাঁচামাল ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। অন্যদিকে একজন নতুনত্ব প্রবর্তনকারী এসব আবিষ্কারকে বাণিজ্যিক রূপ দেয়। এই ধারণা অনুযায়ী একজন উদ্যোক্তার কাজ হল অর্থনৈতিক সুযোগ অন্বেষণ করা, সেগুলির মূল্যায়ন করা, উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করা, বাজারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও প্রতিষ্ঠানকে প্রসারিত করা।

2. **ব্যবস্থাপনামূলক কার্যাবলি** (Managerial functions) : উদ্যোক্তাকে যেসব কাজ সম্পাদন করতে হয় তার অনেকটাই জুড়ে থাকে ব্যবস্থাপনামূলক কার্যাবলি। একজন উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনামূলক কাজগুলি হল—

(i) **পরিকল্পনা প্রণয়ন** (Planning) : সাধারণভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন হল ভবিষ্যতে কী করা হবে তা আগাম স্থির করা। ভাগ্যের হাতে ভবিষ্যৎকে ছেড়ে না দিয়ে যাতে নির্দিষ্ট পথে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয় তার ব্যবস্থা করাই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। এটি একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও কর্মসূচি স্থির করা হয়। বস্তুত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা স্থির করেন কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, কখন করতে হবে, কে করবে এবং কোন পদ্ধতিতে কাজটি করতে হবে।

(ii) **সংগঠন গড়ে তোলা** (Organising): উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনামূলক কাজের মধ্যে **দ্বিতীয় অগ্রগণ্য কাজটি** হল প্রতিষ্ঠানে একটি সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা। উদ্যোগ দু-ধরনের উপাদান নিয়ে কাজের রূপায়ণ ঘটায়। এগুলি হল মানব উপাদান যেমন কর্মী ও অ-মানব উপাদান যেমন কাঁচামাল, মেসিন ইত্যাদি। এদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কাজটি করে সংগঠন। কাজেই উদ্যোক্তার এই কাজটি হল কর্মী, কাঁচামাল, মেসিন ও অর্থ ইত্যাদিকে একত্রিত করে পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণের ব্যবস্থা করা।

(iii) **কর্মীপদ পূরণ** (Staffing) : উদ্যোগের অ-মানব সম্পদ যত বেশিই থাকুক না কেন কোনো উদ্যোগই মানব-সম্পদ ছাড়া এক পাও চলতে পারে না। উদ্যোক্তার একার পক্ষে উদ্যোগের সমস্ত কাজ করা অসম্ভব। তাই তার অন্যতম কাজ হল উদ্যোগের উপযোগী দক্ষ কর্মী সংগ্রহ করা, ব্যবস্থামূলক কাজ হিসাবে উদ্যোক্তার কাজ হল কত কর্মী প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা, তাদের যোগ্যতা ঠিক করা, সংগ্রহের উৎস স্থির করা, কর্মী নির্বাচন করা, কর্মীদের পারিশ্রমিক স্থির করা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা ও তাদের কাজের কালান্তিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা। যে উদ্যোগে যত বেশি দক্ষ কর্মী থাকে সেই উদ্যোগের সাফল্য লাভের সম্ভাবনাও তত বেশি হয়।

(iv) **নির্দেশদান** (Directing) : পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন গড়ে তোলা ও কর্মীপদ পূরণ হল।

উদ্যোগ গঠনের প্রস্তুতিমূলক কাজ। উদ্যোক্তার নির্দেশদানের কাজের মাধ্যমেই উদ্যোগের কাজকর্ম শুরু হয়। নির্দেশদান হল কর্মীদের কী কাজ করতে হবে, কখন করতে হবে বা কীভাবে করবে এসব সংক্রান্ত নির্দেশ বা জাতকরণ। নির্দেশদানের মাধ্যমে কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের বণ্টন হয়। নির্দেশনা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ক্রিয়াশীল হয় না। নির্দেশনার মাধ্যমে উদ্যোক্তা যেমন কর্মীদের কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয় সাথে সাথে তাদের কর্তৃত্ব করার অধিকারও দিয়ে থাকে। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি সঠিক কর্মীর দ্বারা সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক ব্যয়ে সম্পন্ন না হলে উদ্যোক্তার উদ্দেশ্য সফল হয় না।

(v) **নিয়ন্ত্রণ আরোপ** (Controlling) : এটি হল উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনামূলক কাজের শেষ পর্যায়ের কাজ। নিয়ন্ত্রণ আরোপ হল দেখা যে, কাজগুলি প্রকৃতই পরিকল্পনা মাফিক হয়েছে কিনা। এজন্য উদ্যোক্তাকে সম্পাদিত কাজের পরিমাপ করতে হয় ও পরিকল্পিত কাজের সাথে তুলনা করে দেখাতে হয় যে কোনো বিচ্যুতি ঘটেছে কিনা। যদি বিচ্যুতি ঘটে থাকে তাহলে তা সংশোধনের ব্যবস্থাও উদ্যোক্তাকেই করতে হয়।

3. প্রসারমূলক কার্যাবলি (Promotional functions): ব্যুৎপত্তিগতভাবে প্রসার কথার অর্থ বৃদ্ধি। নীচে এদের সম্বলে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল—

(i) **কারবারি ধারণার সনাক্তকরণ ও নির্বাচন** (Identification and selection of business idea): উদ্যোক্তারা একটি লাভজনক উদ্যোগ গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু একটি লাভজনক কারবারি উদ্যোগ গড়ে তোলা খুব সহজ নয় এবং একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কারবারি ধারণা নির্বাচন করতে হয়। একজন ইচ্ছুক উদ্যোক্তা তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং যেসব তথ্য যে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে সেগুলি বিশ্লেষণ করে সে সম্ভাব্য একাধিক কারবারি ধারণা পেতে পারে। এই ধারণাগুলি পরীক্ষা করে সে সর্বাধিক উপযোগী ধারণাটিকে বেছে নেয় এবং তার প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়। একে 'সুযোগ-পরীক্ষা ও সনাক্তকরণও' বলা হয়। এরপর নির্বাচিত ধারণাটিকে কারবারি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় অর্থাৎ ব্যয়-প্রতিদান বিশ্লেষণ (cost-benefit analysis) করা হয়। এর মাধ্যমে প্রত্যেক উদ্যোগের জন্য কত ব্যয় হবে এবং প্রতিদানে কী পরিমাণ আয় হবে তা দেখা হয়। এদের মধ্যে যে কারবারি ধারণার প্রতিদান সর্বাধিক সেটিকে নির্বাচন করা হয় এবং এই ধারণার উপর নির্ভর করেই উদ্যোগ গড়ে তোলার পদক্ষেপ উদ্যোক্তা গ্রহণ করে।

(ii) **কারবারি পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি** (Preparation of business plan or project report): উদ্যোক্তার পরবর্তী কাজটি হল সম্ভাব্য উদ্যোগের জন্য একটি কারবারি। পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করা। কারবারি পরিকল্পনা হল ভবিষ্যত কার্যক্রমের রূপরেখা যার সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে কারবারি উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়। এদিক

থেকে বিচার করলে কারবারি পরিকল্পনা হল পরিকল্পিত কাজের দলিল। যদিও কারবারি পরিকল্পনা তৈরি বাধ্যতামূলক নয় তথাপি একটি উদ্যোগ গড়ে তুলতে এটি খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং উদ্যোগ গঠন সহজ হয়। আবার যেসব উদ্যোক্তা ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে উদ্যোগ গড়তে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটি কারবারি পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করা আবশ্যক। অন্যথায় তারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে না। এই প্রতিবেদনে ইচ্ছুক উদ্যোক্তা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য যেমন থাকে তেমনি উদ্যোগের অবস্থান, প্রয়োজনীয় জমি, বাড়ি, মেসিনপত্র, কাঁচামাল, পরিবহন ও যোগাযোগ, কর্মী, অন্যান্য উপকরণ সহ প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ, কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ, মূলধনের বিভিন্ন উৎস, সমভঙ্গ বিন্দু (BEP) এবং পরিকল্পনা প্রয়োগের সময়সূচি বিশদে উল্লেখ করা হয়। কাজেই পরিকল্পিতভাবে একটি উদ্যোগ গড়ে তুলতে হলে উদ্যোক্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল উদ্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা ও এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন তৈরি করা যাতে সাবলীলভাবে উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে।

(iii) **অর্থ সংগ্রহ** (Collection of finance) : প্রকল্প প্রতিবেদনের মাধ্যমে উদ্যোগ গড়ে তুলতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেটি ঠিক করা হয় এবং সম্ভাব্য উৎসগুলি চিহ্নিত করা হয়। অর্থের প্রয়োজনীয়তা বিষয়টি বিশদে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয় কারণ প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে না পারলে উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। তাই অর্থ সংগ্রহের উৎসগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে ভাগ করা হয়—স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎসও বিশদে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়। এর সাথে সাথে স্বল্পমেয়াদি মূলধন কোন্ কোন্ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি মূলধন কোন্ কোন্ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে তা স্থির করতে হয়। একটি কোম্পানি-উদ্যোগের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ শেয়ার মূলধন থাকবে এবং ইক্যুইটি শেয়ার ও প্রেফারেন্স শেয়ারের পরিমাণ কী হবে এবং ঋণপত্র বিলি করা হলে কী ধরনের ঋণপত্র বিলি করা হবে তা স্থির করতে হয়। এছাড়াও ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলে সম্ভাব্য উৎসসহ সবকিছু বিশদে প্রকল্প প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়। এরপর উদ্যোক্তার কাজ হল সম্ভাব্য উৎসগুলির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা ও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। অর্থ সংগ্রহ হলে উদ্যোক্তা উদ্যোগের পরবর্তী কাজকর্ম শুরু করেন।

4. **বাণিজ্যিক কার্যাবলি** (Commercial functions) : একবার উদ্যোগ গড়ে উঠলে তার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। কাজেই উদ্যোগের বাণিজ্যিক কাজগুলি যেমন উৎপাদন, বিপণন, হিসাবরক্ষণ ইত্যাদি যাতে যথাযথভাবে পরিচালিত হয় তা দেখার দায়িত্বও উদ্যোক্তার। নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

(i) **পণ্য বা সেবার উৎপাদন** (Production of goods or services) : উদ্যোগ একবার গড়ে উঠলে তার উৎপাদন শুরু হয়। অর্থাৎ উদ্যোগ পণ্য বা সেবা উৎপাদন শুরু করে। উৎপাদনের জন্য উদ্যোক্তার কাজ হল কারখানার জায়গা নির্বাচন করা, কারখানার নক্শা চূড়ান্ত করা, উৎপাদিত পণ্যের আকার স্থির করা এবং গবেষণা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। এগুলি ছাড়াও পণ্যসংক্রান্ত উদ্যোক্তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হল উৎপাদন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা, উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা, কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করা ও যথাযথভাবে সেগুলি মজুত করার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। বস্তুত উদ্যোগের উৎপাদন প্রক্রিয়া অনেকাংশেই এসব কাজের উপর নির্ভর করে বিশেষত উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ-এর উপর।

(ii) **বিপণন** (Marketing) : উদ্যোগে যে পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হয় তা বিপণনের উদ্দেশ্যে। কারণ উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় না হলে উদ্যোগে মুনাফার সৃষ্টি হয় না। আর উদ্যোগে মুনাফা না হলে উদ্যোগ কারবারি জগতে টিকে থাকতে পারে না। একরণেই উদ্যোক্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল উৎপাদিত পণ্য যা সেবার বিপণনের ব্যবস্থা করা। ব্যবস্থাপণাগতভাবে বিপণন হল **পণ্য বিক্রয়ের কলা**। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপণন বিক্রয় নয়। বিক্রয় হল বিপণন নামক হিমশৈলের একটি চূড়া মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বিপণন হল সেইসব কারবারি কার্যকলাপ যা উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকে উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে নিয়ে যায়। বিপণন হল সঠিক জিনিসটি, সঠিক জায়গায়, সঠিক সময়ে, সঠিক দামে, সঠিক যোগাযোগ ও প্রসারের মাধ্যমে সঠিক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া। তবে বর্তমানে বিপণন ব্যবস্থাপনা বলতে এগুলিকেই বোঝায় না। আধুনিক বিপণন ক্রেতাকেন্দ্রিক। ক্রেতা সন্তুষ্টিই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এর উপাদানগুলি 4P দ্বারা সূচিত হয় এবং এই চারটি P হল— পণ্য, দাম, সম্মান ও প্রসার। একজন উদ্যোক্তা এই বিষয়গুলির উপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পণ্য বা সেবার বিপণন সংক্রান্ত কাজগুলি সম্পাদন করে। কারণ বিপণনে সাফল্য না পেলে উদ্যোগের সাফল্য পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিপণনের সাফল্যই উদ্যোগের সাফল্য। উদ্যোক্তার বিপণন সংক্রান্ত কাজগুলি হল বিপণন ও বাজার গবেষণা, উৎপাদন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা, প্রথিতকরণ, নামকরণ, মোড়কবন্ধন, মজুতকরণ, দাম নির্ধারণ ও পণ্য বা সেবার প্রসারমূলক কাজ।

(iii) **হিসাবরক্ষণ** (Accounting) : কোনো কারবারি উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন ও সম্পদ সৃষ্টি। উদ্যোগ এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পেরেছে কি পারেনি তা জানা যায় হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে। সংজ্ঞাগতভাবে হিসাবরক্ষণ হল কারবারের লেনদেনগুলি লিপিবদ্ধ করা, বিশ্লেষণ করা ও সঙ্কুচিত করার একটি কলা যা আর্থিক মূল্যে প্রকাশ করা হয় এবং প্রকৃত ফলাফল জানা যায়। হিসাবরক্ষণ প্রধানত চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়। এগুলি হল—(ক) লেনদেনগুলির লিপিবদ্ধকরণ, (খ) শ্রেণিকরণ, (গ) সংক্ষিপ্তকরণ ও (ঘ)

ফলাফল ব্যাখ্যা। প্রত্যেক উদ্যোগেই একটি লাভ-ক্ষতির হিসাব তৈরি করা হয় যেখান থেকে বোঝা যায় যে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে লাভ হয়েছে নাকি ক্ষতি হয়েছে এবং লাভ হলে কী পরিমাণ লাভ হয়েছে বা ক্ষতি হলে তার পরিমাণই বা কত। এটি ছাড়াও হিসাবকাল শেষে একটি উদ্‌বর্তপত্র তৈরি করা হয় যা থেকে উদ্যোগের আর্থিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। এসব কারণেই হিসাবরক্ষণ উদ্যোক্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে গণ্য হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিশেষে বলা যায় যে উদ্যোক্তাকে উদ্যোগ সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয় এবং এসব কাজের যথাযথ সম্পাদনের উপরই উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করে।

1.6 উদ্যোক্তার ধরণ

উদ্যোক্তার বিভিন্ন ধরন প্রকৃতপক্ষে তাদের শ্রেণিবিভাজন থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই শ্রেণিবদ্ধকরণ করার ফলে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোক্তা দেখতে পাওয়া যায়। তবে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন উদ্যোক্তার মূল প্রকৃতি সকলের ক্ষেত্রে একই থাকে। যেসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে উদ্যোক্তার বিভিন্ন ধরন গড়ে উঠেছে তা নীচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল—

উদ্যোক্তার বিভিন্ন ধরন—

1. উদ্যোগের প্রকৃতির ভিত্তিতে— (a) ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা, (b) শিল্পভিত্তিক উদ্যোক্তা, (c) কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা, (d) কোম্পানি উদ্যোক্তা।

2. প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর ভিত্তি— (a) প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা, (b) প্রযুক্তি-বহির্ভূত উদ্যোক্তা, (c) পেশাগত উদ্যোক্তা।

3. মালিকানার ভিত্তিতে— (a) বেসরকারি উদ্যোক্তা, (b) সরকারি উদ্যোক্তা, (c) যৌথ উদ্যোগের উদ্যোক্তা।

4. উদ্যোগের আকৃতির উপর ভিত্তি করে— (a) ছোট উদ্যোক্তা, (b) মাঝারি উদ্যোক্তা, (c) বড়ো উদ্যোক্তা।

5. কার্যমূলক চরিত্রের ভিত্তিতে— (a) নতুনত্ব প্রবর্তনকারী বা উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা, (b) অনুকরণকারী উদ্যোক্তা, (c) মন্থর উদ্যোক্তা।

6. এলাকার উপর ভিত্তি করে— (a) শহুরে উদ্যোক্তা, (b) গ্রামীণ উদ্যোক্ত।

7. লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে— (a) পুরুষ উদ্যোক্তা, (b) মহিলা উদ্যোক্তা।

8. বিশেষ ধরনের উদ্যোক্তা— (a) অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তা, (b) সামাজিক উদ্যোক্তা, (c) পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তা, (d) প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা।

উপরের শ্রেণিবিন্যাস থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোক্তা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এদের মধ্যে অনেক উদ্যোক্তাই বাস্তবে খুব কম দেখা যায় এবং একই উদ্যোক্তা একাধিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ একজন পুরুষ উদ্যোক্তা যদি গ্রামীণ এলাকায় তার উদ্যোগ গড়ে তোলে তাহলে তাকে গ্রামীণ উদ্যোক্তা বলা যায়। আবার সে যদি অন্য উদ্যোক্তার পণ্য অনুকরণ করে এবং সামান্য পরিবর্তন করে তার উদ্যোগে উৎপাদন করে তাহলে তাকে অনুকরণকারী উদ্যোক্তা বলা হয়। অর্থাৎ একজন উদ্যোক্তা বিভিন্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যাইহোক, নীচে এদের সম্বন্দে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

1. **উদ্যোগের প্রকৃতির ভিত্তিতে উদ্যোক্তা** (Entrepreneur based on nature of entrepreneruship) : উদ্যোগের কাজের প্রকৃতির ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদের চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল—ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা, উৎপাদক উদ্যোক্তা, কৃষি উদ্যোক্তা ও কোম্পানি উদ্যোক্তা। নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

   (a) **ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা** (Business entrepreneur) : ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হল যারা মূলত উদ্যোগের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উদ্যোগ হল একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা উৎপাদক বা বন্টনকারীর থেকে পণ্য ক্রয় করে খুচরা কারবারি বা ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করে।

   (b) **শিল্পভিত্তিক উদ্যোক্তা** (Industrial entrepreneur) : উদ্যোগ যখন কোনো পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে এবং বিক্রয় করে তাহলে সেই উদ্যোক্তাকে বলা হয় উৎপাদক উদ্যোক্তা। কাজেই এ ধরনের উদ্যোক্তাকে পণ্য বা সেবার উৎপাদন ও উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিপণন সংক্রান্ত কাজ করতে হয়।

   (c) **কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা** (Agricultural entreprenur) : কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা হল যারা এমন এক উদ্যোগ গড়ে তোলে যার প্রধান কাজই হল কৃষিকাজ। এ-ধরনের উদ্যোক্তা কৃষিকাজে পারদর্শী হয় এবং তারা জানে কীভাবে কৃষিকাজের জন্য জমি তৈরি করতে হয়। বীজ বপন করতে হয়, কীভাবে জমিতে সার প্রয়োগ করতে হয় এবং কৃষি-প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হয়। এ-ধরনের উদ্যোগ সাধারণত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষিকাজ করে থাকে।

   (d) **কোম্পানি উদ্যোক্তা** (Corporate entrepreneur) : কোম্পানি উদ্যোগ একটি বৃহদায়তন কারবারি উদ্যোগ যা সহজে গড়ে তোলা যায় না। আইনের অনেক শর্ত পূরণ করে কোম্পানি গঠন করা যায়। কোম্পানি উদ্যোগ বৃহত্তর পরিধিতে কাজকর্ম চালায়। কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রে এরূপ উদ্যোক্তা প্রবর্তক হিসাবে কাজ করে। এ ধরনের উদ্যোক্তা সাধারণত কোম্পানি পরিচালনায় দক্ষ হয়।

2. **প্রযুক্তি ব্যবহারের ভিত্তিতে উদ্যোক্তা** (According to use of technology) : বর্তমান যুগকে প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। জীবনের প্রতিটি কাজেই কোনো না কোনোভাবে প্রযুক্তি জড়িয়ে থাকে। আর একটি উদ্যোগও এর বাইরে নয় এবং একজন উদ্যোক্তাও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভর করে তিন ধরনের উদ্যোক্তা দেখা যায়। এরা হল— প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা, প্রযুক্তি ব্যবহার করে না এধরনের উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী উদ্যোক্তা। নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

(a) **প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা** (Technology based entrepreneur) : যেসব উদ্যোক্তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলে তাদেরকে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা বলা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে যেসব উদ্যোক্তা উদ্যোগ গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করে ও উদ্যোগের কাজকর্ম আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করে তারাই হল প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা।

(b) **প্রযুক্তি রহিত উদ্যোক্তা** (Non-technical entrepreneur) : যেসব উদ্যোক্তা আধুনিক প্রযুক্তি সেভাবে কাজে লাগায় না তারাই হল প্রযুক্তি রহিত উদ্যোক্তা। তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সেভাবে কাজে লাগাতে পারে না এবং উৎপাদন ও বিপণন ক্ষেত্রে অনুকরণ করতেই ভালোবাসে। এ ধরনের উদ্যোক্তা যে উদ্যোগ গড়ে তোলে তাকে আধুনিক হিসাবে গণ্য করা যায় না।

(c) **পেশাজীবী উদ্যোক্তা** (Professional entrepreneur) : এ ধরনের উদ্যোক্তা হল যারা উদ্যোগ গঠনে পারদর্শী এবং উদ্যোগ গঠনের সাথে সাথে তাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। এরা কোনো ব্যক্তির হয়ে উদ্যোগ গঠনে এগিয়ে আসে এবং উদ্যোগ একবার গঠিত হয়ে গেলে তারা উদ্যোগ পরিচালনায় থাকে না। কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রে পেশাজীবী প্রবর্তক হল এ-ধরনের উদ্যোক্তা যারা কোম্পানি গঠনের পর আর কোম্পানির পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনায় জড়িত থাকে না। অনেক সময় পেশাজীবী উদ্যোক্তা উদ্যোগ গঠনের পর সেটি বিক্রয় করে দেয় এবং অন্য কোনো উদ্যোগ গঠনে মনোনিবেশ করে। এ ধরনের উদ্যোক্তা উদ্যোগ গঠনে অত্যন্ত পারদর্শী হয়। এরা নিয়মিতভাবে নতুন নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটায় এবং ধারণাকে উদ্যোগে রূপান্তরিত করে।

3. **মালিকানার ভিত্তিতে** (On the basis of ownership) : মালিকানার ভিত্তিতে উদ্যোক্তা হল তিন ধরনের— বেসরকারি উদ্যোক্তা, সরকারি উদ্যোক্তা ও যৌথ উদ্যোক্তা। আসলে এই শ্রেণিবিভাগ উদ্যোক্তার ধরনের উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

(a) **বেসরকারি উদ্যোক্তা** (Private Entrepreneur) : যখন ব্যক্তি বিশেষ উদ্যোক্তা তার নিজস্ব উদ্যোগে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তখন তাকে ঘরোয়া উদ্যোক্তা বা বেসরকারি উদ্যোক্তা বলা হয়। উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ও অন্যান্য সম্পদ ওই ব্যক্তিই সংগ্রহ করে ও উদ্যোগে যোগান দেয়। সাধারণত এসব উদ্যোগ সীমিত সীমার মধ্যে কাজ করে কাজেই এর কাজের ব্যপ্তি কম।

(b) **সরকারি উদ্যোক্তা** (Government entrepreneur) : এমন কিছু জায়গা থাকে যেখানে বেসরকারি উদ্যোক্তা উদ্যোগ স্থাপনে বিশেষ উৎসাহ বোধ করে না কারণ এসব ক্ষেত্রে মুনাফার সম্ভাবনা কম থাকে। ফলে তারা উদ্যোগ গড়ে তুলতে আকর্ষণ বোধ করে না।

এরূপ ক্ষেত্রে সরকার এগিয়ে এসে উদ্যোগ গঠন করে। সাধারণত জনস্বার্থ রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে। এছাড়াও এসব উদ্যোগে অনেক বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় যা ব্যক্তিবিশেষ যোগান দিতে পারে না। সরকারি উদ্যোগ সাধারণত বৃহৎ আকৃতির হয় এবং মালিকানা ও পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপরেই থাকে। সেজন্য এগুলিকে সরকারি উদ্যোগ নামে অভিহিত করা হয়।

(c) **যৌথ উদ্যোক্তা** (Joint entrepreneure) : যেক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগ ব্যক্তিগত ও সরকারি সহায়তায় গড়ে ওঠে তখন তাকে যৌথ উদ্যোগ বলে এবং যারা এই উদ্যোগ গড়তে এগিয়ে আসে তাদের যৌথ উদ্যোক্তা বলা হয়। যেক্ষেত্রে উদ্যোগে লগ্নির পরিমাণ বিশাল এবং বিশেষজ্ঞ সুলভ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে সরকার অন্যান্যদের সাথে যৌথভাবে উদ্যোগ গড়তে এগিয়ে আসে। উভয়ে মিলিতভাবে উদ্যোগের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে এবং যৌথ নেতৃত্বে উদ্যোগ পরিচালিত হয়। উদ্যোগের মুনাফা উভয়ের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বন্টিত হয়। হলদিয়া পেট্রোক্যামিক্যালস হল যৌথ উদ্যোগের উদাহরণ।

4. **উদ্যোগের আকৃতিভিত্তিক উদ্যোক্তা** (Entreprenur according to the size of business enterprise) : উদ্যোগের আকৃতির উপর নির্ভর করেও উদ্যোক্তাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল ছোটো উদ্যোক্তা, মাঝারি উদ্যোক্তা ও বড়ো উদ্যোক্তা। নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

(a) **ছোটো উদ্যোক্তা** (Small-scale entrepreneur) : যেসব উদ্যোগ আকারে ছোটো এবং সীমিত পরিসীমার মধ্যে উদ্যোগের কার্যকলাপ চালায় সেই সমস্ত ক্ষেত্রের উদ্যোক্তাকে ছোটো উদ্যোক্তা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে যেসব উদ্যোগের মেসিনপত্রে লগ্নির পরিমাণ 1 কোটি টাকার বেশি নয় সেগুলিই হল ছোটো উদ্যোগ এবং এই ধরনের উদ্যোক্তাকে ছোটো উদ্যোক্তা বলা হয়।

(b) **মাঝারি উদ্যোক্তা** (Medium-scale entrepreneur) : ছোটো এবং বৃহদাকার উদ্যোগের মাঝে অবস্থান করে মাঝারি উদ্যোগ। এদের কাজের পরিধি ছোটো উদ্যোগের থেকে বেশি কিন্তু বৃহৎ উদ্যোগের থেকে কম। এরূপ উদ্যোগে কলকারখানা ও যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ 1 কোটি টাকার বেশি কিন্তু 5 কোটি টাকার কম। এ ধরনের উদ্যোগের উদ্যোক্তাকেই মাঝারি উদ্যোক্তা বলা হয়।

(c) **বড়ো উদ্যোক্তা** (Large-scale entrepreneur) : একটি বৃহদায়তন উদ্যোগের উদ্যোক্তাকে বড়ো উদ্যোক্তা বলা হয়। এ ধরনের উদ্যোগে কলকারখানা ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ 1 কোটি টাকার বেশি। অর্থাৎ উদ্যোক্তাকে 5 কোটি টাকার বেশি লগ্নি করতে হয় যাতে উদ্যোগ বৃহত্তর পরিধিতে কাজ করতে পারে।

5. **কার্যমূলক চরিত্র অনুসারে** (According to functional characteristics) : উদ্যোক্তার কার্যমূলক চরিত্রের ভিত্তিতেও বিভিন্ন ধরনের উদ্যোক্তা দেখা যায়। এগুলি হল— নতুনত্ব

প্রবর্তনকারী, অনুকরণকারী, মন্থর ও অলস উদ্যোক্তা। নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

(a) **নতুনত্ব প্রবর্তনকারী বা উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা** (Innovative entrepreneur) : এ ধরনের উদ্যোক্তার নতুন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকে এবং তারা উদ্যোগের জন্য নতুন কোনো প্রযুক্ত বা পণ্য বা প্রক্রিয়া বা বাজার ইত্যাদি প্রবর্তন করতে চায়। এরা সাধারণত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং অন্যদের থেকে আগে কোনো সুযোগ সনাক্ত করতে পারে। নতুনত্ব প্রবর্তনকারী বা উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা প্রচুর পরিমাণে তথ্য ও ধারণা সংগ্রহ করে এবং এগুলিকে কাজে লাগিয়ে উদ্যোগের জন্য নতুন নতুন পণ্য বা সেবার উদ্ভাবন করে।

(b) **অনুকরণকারী উদ্যোক্তা** (Immitative entrepreneur) : এ ধরনের উদ্যোক্তা প্রত্যক্ষভাবে নতুনত্ব প্রবর্তনকারী হিসাবে গণ্য হয় না। কিন্তু অন্যের সাফল্যকে অনুকরণ করে এবং তাদের ধারণা, পদ্ধতি এবং প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে নতুন পণ্য বা সেবা প্রবর্তন করে। জাপান, চীনের মতো দেশগুলিতে পশ্চিমী দুনিয়ার বিভিন্ন সফল পণ্যকে অনুকরণ করে নিজের দেশে অনুরূপ পণ্য উৎপাদন করে এরকম অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। একারণেই এদের অনুকরণকারী উদ্যোক্তা বলা হয়। এসব উদ্যোক্তা অন্যের গবেষণালব্ধ ধারণাকে চুরি করে এবং আইন বাঁচানোর জন্য তার মধ্যে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রবর্তন করে। এদের নীতি হল যাতে 'সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে'।

(c) **মন্থর উদ্যোক্তা** (Fabian entrepreneur) : এ ধরনের উদ্যোক্তার নতুন কিছু প্রবর্তনের কোনো ইচ্ছাই থাকে না। এরা গতানুগতিকভাবে উদ্যোগ চালাতে ভালোবাসে। নতুনত্ব প্রবর্তনের পিছনে তাদের এই অনীহার কারণ হল যে, তারা মনে করে উদ্যোগে কোনো পরিবর্তনের ফলে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে এবং বর্তমান কাজকর্ম ব্যাহত হবে। তাই তারা উদ্যোগে কোনো ধরনের পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক হয় না। কেবলমাত্র যখন পরিবর্তন করা ছাড়া উদ্যোগের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তখনই তারা উদ্যোগে অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটায়। এসব কারণেই এ ধরনের উদ্যোক্তাকে মন্থর উদ্যোক্তা বলে।

(d) **অলস উদ্যোক্তা** (Drone entrepreneur) : এ ধরনের উদ্যোক্তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো পরিবর্তন করতে চায় না। তারা মনে করে যেভাবে উৎপাদন চলছে সেভাবেই চলবে। এমনকি তারা ক্ষতিস্বীকার করবে কিন্তু প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পরিবর্তন করবে না। এদের অলস উদ্যোক্তা বলা হয়।

6. কাজের এলাকার ভিত্তিতে উদ্যোক্তা (Entrepreneur based on area of work): উদ্যোক্তার কাজের এলাকার উপর ভিত্তি করে দু-ধরনের উদ্যোক্তা দেখতে পাওয়া যায়। এরা হল—গ্রামীণ উদ্যোক্তা ও শহুরে উদ্যোক্তা। এদের সম্বন্ধে নীচে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

(a) **গ্রামীণ উদ্যোক্তা** (Rural entrepreneur) : যেসব ব্যক্তি গ্রামীণ ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ

গড়ে তোলে তাদেরই গ্রামীণ উদ্যোক্তা বলে। এসব উদ্যোক্তা সাধারণত কৃষি-কেন্দ্রিক উদ্যোগ বা কারবারি উদ্যোগ গড়ে তোলে। এসব উদ্যোক্তা সাধারণত গ্রামীণ এলাকাতেই বসবাস করে এবং একই এলাকাতেই তাদের উদ্যোগ গড়ে তোলে। গ্রামীণ উদ্যোগ গড়ে তোলার পিছনে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল সরকারি সহায়তা ও অনুদান। কারণ গ্রামীণ ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন গ্রামীণ প্রকল্প গ্রহণ করে এবং যারা ওই প্রকল্প অনুসারে উদ্যোগ গড়ে তোলে তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে, যেমন— প্রযুক্তিগত পরামর্শ, আর্থিক সহায়তা, বিপণন সহায়তা ইত্যাদি।

(b) **শহুরে উদ্যোক্তা** (Urban entrepreneur) : এ ধরনের উদ্যোক্তা শহরাঞ্চলে বসবাস করে এবং সাধারণত ওই এলাকাতেই তাদের উদ্যোগ গড়ে তোলে। এ ধরনের উদ্যোক্তা প্রধানত শিল্প উদ্যোগ বা কোম্পানি উদ্যোগ গড়ে তোলে। শহরাঞ্চলে যেসব উদ্যোগ গড়ে তোলা হয় সেগুলি মাঝারি বা বৃহৎ উদ্যোগ হিসাবে গণ্য হয়।

7. **লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে** (Based on gender): লিঙ্গভিত্তিক উদ্যোক্তাও দু-ধরনের। এরা হল পুরুষ উদ্যোক্তা ও মহিলা উদ্যোক্তা।

(a) **পুরুষ উদ্যোক্তা** (Male entrepreneur) : কোনো পুরুষ ব্যক্তি যদি কোনো উদ্যোগ গড়ে তুলে উদ্যোগ পরিচালনা করে তাহলে তাকে পুরুষ উদ্যোক্তা বলে। জামশেদজি রুস্তমজি টাটা, ধীরুভাই আম্বানি, সুভাষ চন্দ্র, রাহুল বাজাজ, মুকেশ আম্বানি ইত্যাদি উদ্যোগ গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে পথিকৃত। এরা সকলেই পুরুষ উদ্যোক্তা। এধরনের উদ্যোক্তারা সাধারণত নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলা ও পরিচালনাতেই বেশি জড়িত থাকে।

(b) **মহিলা উদ্যোক্তা** (Woman enterpreneur) : যখন কোনো মহিলা কোনো নতুন উদ্যোগ গঠন করে পরিচালনা করে তখন তাকে মহিলা উদ্যোক্তা বলে। বেশ কিছু বছর আগে মহিলা উদ্যোক্তার সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। কিন্তু বর্তমানে এদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের সাফল্যের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারী উদ্যোক্তা হিসাবে এরা আলাদা কোনো সুবিধা ভোগ করে না। এদেরকেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট লড়াই করতে হয়। ভারতবর্ষের কয়েকজন অগ্রণী মহিলা উদ্যোক্তা হলেন— আয়ুর্বেদ ও ভেষজ পণ্য উৎপাদনকারী শাহনাজ হুসেন, বায়েকন ওষুধ কোম্পানির ড. কিরণ মজুমদার শা, কামানি টিউব কোম্পানির প্রধান কার্যনির্বাহী কল্পনা সরোজ ইত্যাদি।

8. **বিশেষ ধরনের উদ্যোক্তা** (Special entrepreneur) : উপরোক্ত ধরনের উদ্যোক্তার বাইরেও কিছু বিশেষ ধরনের উদ্যোক্তা বর্তমানে দেখা যায়। তাদের কাজের বিশেষত্ব অনুসারে তাদের নামকরণ করা হয়েছে। এরূপ উদ্যোক্তাও চার ধরনের—অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তা, সামাজিক উদ্যোক্তা, পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা। এদের সম্বন্ধে নীচে ধারণা দেওয়া হল।

(a) **অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তা** (Intrapreneur) : অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তা অর্থাৎ intrapreneur শব্দটি 1978 সালে প্রথম গিলফোর্ড পিনচোত (Gillford Pinchot) ও এলিজাবেথ পিনচোত (Elizabeth S. Pinchot) তাঁদের একটি লেখায় ব্যবহার করেছিলেন। এই শব্দটির ভিত্তি হল অভ্যন্তরীণ (Internal) ও উদ্যোক্তা (Entrepreneur) যা মিলিত হয়ে অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তা গড়ে উঠেছে।

একজন অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তা হল কোনো কোম্পানির একজন কর্মচারী যার প্রধান কাজ হল কোনো উদ্ভাবনী ধারণার উন্নয়ন ঘটানো। অর্থাৎ এদের উদ্যোগের ঝুঁকি যেমন বহন করতে হয় না তেমনি উদ্যোগের সাফল্যের জন্য তারা কোনো সুবিধা পায় না। যা কিছু ঝুঁকি তা কোম্পনিই বহন করে এবং উদ্যোগের সাফল্য কোম্পনিই ভোগ করে। তবে একজন অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তা সাধারণত তার কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে এবং প্রয়োজনমতো সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের উদ্যোক্তার মধ্যে বেশিমাত্রায় অনুপ্রেরণা থাকে এবং বিশেষ কর্মদক্ষতা ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা থাকে। এছাড়াও তাদের উদ্ভাবনী দূরদৃষ্টি থাকে যা কোম্পানির অন্যদের মধ্যে দেখা যায় না। একজন উদ্যোক্তা ও একজন অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তার মধ্যে মূল পার্থক্য হল যে একজন উদ্যোক্তার নিজস্ব কোনো উদ্যোগ গড়া উদ্দেশ্য নয়। যে কোম্পানি বা সংস্থার হয়ে তারা উদ্ভাবনী প্রকল্পের কাজ করে সেই সংস্থাই ঠিক করে যে উদ্ভাবনী ফলাফল কীভাবে কাজে লাগাবে। অর্থাৎ এদের উদ্ভাবন কোম্পানিকে সাহায্য করে যাতে কাজের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটে। এ ধরনের উদ্যোক্তা কোম্পানিতে দীর্ঘকাল ধরে কার্যনির্বাহী নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে।

অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন— (i) **কেন কুটারাগি** (Ken Kutaragi) যিনি 1994 সালে জাপানে, সোনির যে প্লে স্টেশন গড়ে তোলা হয় তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। মিনো বাসটাউরাস (Mino Bastawras) যিনি এরোপ্লেনকে আরও উন্নত করেছিলেন একজন সফল অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তা। ভারতীয় অভ্যন্তরীণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রথম সারির উদ্যোক্তা হলেন— ধীরুভাই আম্বানি, আজিম প্রেমজি, বিজু রবীন্দ্রন, দিলীপ সাংভি ইত্যাদি।

(b) **সামাজিক উদ্যোক্তা** (Social entrepreneur) : সামাজিক উদ্যোক্তা বলতে বোঝায় যেসব উদ্যোক্তা সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে। এরা মুনাফার জন্য উদ্যোগ গড়ে তোলে না। তারা সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে। মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে এবং কালক্রমে সেগুলি পরিবর্তিত হয়েছে বা নিরসন হয়েছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এবং তারাই সমাজ গড়ে তোলে আর সামাজিক সমস্যাও মানুষেরই অবদান। কারণ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে উন্নয়নের নামে মানুষই বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার স্রষ্টা। আবার কিছু মানুষ এই সমস্যাগুলি নিরসনের জন্য এগিয়ে

আসেন ও কাজ করেন, তারাই হলেন সামাজিক উদ্যেক্তা। এদের সমাজসংস্কারক হিসাবেও গণ্য করা হয়। যদিও সামাজিক উদ্যোক্তা শব্দটি নতুন কিন্তু ধারণাটি পুরানো। এর গুরুত্ব ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ বিশ্বব্যাপী **যাদের আছে** (haves) এবং **যাদের নেই** (havenots) এদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। সামাজিক উদ্যোক্তারা এই পিছিয়ে পড়া গরীব মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা চালায়। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য তারা সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে এবং এসব মানুষের মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলিকেই কাজে লাগায় ও তাদের উন্নতি ঘটায়। এজন্য সামাজিক উদ্যোক্তার উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস, সৃজনশীলতাকে কাজে লাগায় এবং সর্বোপরি প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে এগিয়ে যায়, নতুন ঘটনার সূচনা হয় এবং সামাজিক সুফলের সাথে সাথে উন্নততর সমাজ গড়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায় যে সামাজিক উদ্যোক্তাকে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা হয়। এগুলি হল এ ধরনের উদ্যোক্তা— (i) বাণিজ্যিক সংস্থার সাথে সামাজিক প্রভাব সংযুক্ত করে, (ii) সামাজিক প্রভাবের জন্য উদ্ভাবন করে এবং (iii) সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে। এভাবে সমাজের যে রূপান্তর ঘটে তাতে প্রান্তিক মানুষজন যেমন উপকৃত হয় তেমনি সমাজও উন্নত হয়। বিশ্বব্যাপী পরিচিত ও সমাদৃত যেসব উদ্যোক্তা সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন— (i) **ফ্লোরেনস নাইটিঙ্গেল** যাঁকে আধুনিক নার্সিং বা সেবাদানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করা হয়; (ii) **বিনোবা ভাবে** ভারতের প্রথম শ্রেণির সমাজকর্মী ও ভূমিদান আন্দোলনের জনক; (iii) **সত্যম মিশ্র** যিনি **'দৃষ্টি'** নামে একটি ভারতীয় কোম্পানি গঠন করেছিলেন এবং গরীব মানুষদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন; (iv) **বাঙকার রায়** যিনি **'খালি পায়ের কলেজ'** (Barefoot college) গ্রামীণ এলাকায় স্থাপন করে নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিতদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং (v) বাংলাদেশের **ড. মহম্মদ ইউনিস**, মাইক্রো ক্রেডিটের জনক।

(c) **পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোক্তা** (Ecopreneur) : এ ধরনের উদ্যোক্তা কেবলমাত্র উদ্যোগের মাধ্যমে মুনাফা করে না। এরা পরিবেশ-বান্ধব পণ্য ও সেবার সৃষ্টি ও বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে উদ্যোগ গড়ে তোলে। এসব উদ্যোক্তা পরিবেশ কর্মী হিসাবে গণ্য হয় এবং পরিবেশের দূষণ ও অবনমনরোধে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের উদ্যোক্তা সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে উদ্যোগ গড়ে তোলে এবং এমনভাবে উদ্যোগ পরিচালনা করে যাতে উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব বজায় থাকে। এরা পরিবেশের সাথে ও পরিবেশের জন্য উদ্যোগ চালায়। এ ধরনের উদ্যোক্তা পুরানো সমস্যা সমাধানে নতুন উপায় খুঁজে বের করে এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণের সমস্যার সমাধানই এদের লক্ষ্য।

এরূপ উদ্যোক্তার উদ্দেশ্য আর্থিক মুনাফা অর্জন নয় এরা গুরুত্ব দেয় যে সামাজিক ঋণ কতটা পরিশোধ করা যায়, পরিবেশকে কীভাবে রক্ষা করা যায় এবং প্রকৃত দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ গড়ে তোলা যায়। এরা মূলত তিনটি পদ্ধতিতে কাজ করে যাদের 'triple bottom line' বলা হয়। এগুলি হল—

(i) **সামাজিক নিম্নরেখা** (Social bottom line) : উদ্যোগ কীভাবে তার সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করবে এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের প্রয়োজনে সাহায্য করবে।

(ii) **পরিবেশমূলক নিম্নরেখা** (Environmental bottom line) : পরিবেশ দূষণ কীভাবে কমানো যায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিশ্বের পরিবেশকে কীভাবে উন্নত করা যায়।

(iii) **আর্থিক নিম্নরেখা** (Financial bottom line) : উদ্যোগ কী পরিমাণ মুনাফা করতে সমর্থ এবং এই মুনাফা উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্বের জন্য কীভাবে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

এ ধরনের উদ্যোক্তাকে **সবুজ উদ্যোক্তাও** বলা হয় কারণ সবুজায়নের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে হ্রাস করা যায়। **ভিরাল দেশাই** (Viral Desai) হলেন ভারতের একমাত্র পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তা যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে **এলন মাস্ক** (Elon Musk) হলেন একজন পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তা যার সবুজ কারবারি মডেল বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে।

(d) **প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা** (Technopreneur) : প্রযুক্তি (technology) এবং উদ্যোক্তা (entrepreneur) শব্দ দুটি যুক্ত করে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তার (technopreneur) উদ্ভব হয়েছে। কলিন্স অভিধান প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'যেসব উদ্যোক্তা প্রযুক্তি ব্যবসা শুরু করে ও পরিচালনা করে তাদেরই প্রযুক্তি আজ সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এবং তাদের উপস্থিতি সদর্পে ঘোষণা করছে। এই বিশ্বে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষই জেনে বা না জেনে যেভাবেই হোক্ না কেন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। মানুষের কার্যকলাপও আজ প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে। সুতরাং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা যাদের বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়েও দেখা যেত না তারাও আজ সর্বত্র বিরাজমান। প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে যে এরা একাধারে প্রযুক্তিবিদ, একাধারে উদ্যোক্তা আবার ব্যবস্থাপকও।

প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তার অপর একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে 'প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা হল কারবারি পেশাজীবী যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন পণ্য সৃষ্টি করে বা কারবার স্থাপন করে। তাদের মধ্যে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল উদ্ভাবনী চিন্তাধারা ও ঝুঁকি বহন করার ইচ্ছা।' সুতরাং একজন প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তার মধ্যে যেসব চারিত্রিক

গুণাবলি থাকে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা;

(ii) উদ্যোগের মানসিকতা;

(iii) গতানুগতিক ভাবনার বাইরে গিয়ে ভাবা;

(iv) শক্তিশালী প্রযুক্তিগত দক্ষতা

প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল যারা প্রকৃতই বিশ্বজনীন। এঁরা হলেন—

(i) **এলন মাস্ক** (Elon Musk) : টেসলা, স্পেস-একস ও অন্যান্য বহু স্টার্ট-আপ কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁর উদ্ভাবনী চিন্তাধারা ও ঝুঁকি গ্রহনের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পে আলোড়ন তুলেছেন।

(ii) **সার্গেই ব্রিন** (Sergey Brin) : তিনি হলেন **'গুগল'**-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা যিনি একজন প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা কারবারি জগতে ইতিহাস রচনা করেছে।

(iii) **মার্ক জুকেরবার্গ** (Mark Zuckerberg) : মার্ক জুকেরবার্গ হলেন **'ফেসবুক'**-এর প্রতিষ্ঠাতা। একজন প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা হিসাবে তিনি সবচেয়ে বড়ো 'সোশ্যাল নেটওয়ার্ক' তৈরি করেছেন।

(iv) **জেফ বেজস** (Jeff Bezos) : জেফ বেজস একজন প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা যিনি বর্তমানে **'আমাজন'** সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহী এবং যিনি বিশ্বে **ই-কমার্স** ব্যবসাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়াও আর যাদের নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাঁরা **মাইক্রোসফ্ট** কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা **বিল গেটস্** (Bill Gates), **সাইট ডিগ** (Site Digg)-এর প্রতিষ্ঠাতা **কেভিন রোজ** (Kevin Rose) এবং **টুইটারের** (Twitter) প্রতিষ্ঠাতা **এভান উইলিয়ামস্** ইত্যাদি।

1.7 সারাংশ

এই এককটি থেকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে অবগত হলাম—

- উদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিকা
- উদ্যোক্তা সম্বন্ধে আমরা কী বুঝি
- উদ্যোক্তার কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিৎ
- উদ্যোক্তার কার্যাবলি কী কী
- উদ্যোক্তার ধরণ কত প্রকার

1.8 প্রশ্নাবলি

(ক) এম সি কিউ প্রশ্নাবলি :

1. Entrepreneur শব্দটি কোন্ বিদেশী শব্দ থেকে উদ্ভুত হয়েছে?
   (ক) গ্রীক শব্দ (খ) ফরাসি শব্দ
   (গ) হিব্রু শব্দ (ঘ) আরবি শব্দ
2. উদ্যোগ সংক্রান্ত কার্যাবলির মধ্যে নিম্নলিখিত কোনটি গ্রহণযোগ্য নয়?
   (ক) বিপণন (খ) ঝুঁকি বহন
   (গ) সংগঠন গড়ে তোলা (ঘ) নূতনত্বের প্রবর্তন
3. মালিকানার ভিত্তিতে উদ্যোক্তার মধ্যে নিম্নলিখিত কোন্‌জন পড়েন না?
   (ক) বেরসকারি উদ্যোক্তা (খ) মাঝারি উদ্যোক্তা
   (গ) সরকারি উদ্যোক্তা (ঘ) যৌথ উদ্যোক্তা
4. যে ধরনের উদ্যোক্তা প্রত্যক্ষভাবে অন্যের সাফল্যকে অনুকরণ করে এবং তাদের ধারণা, পদ্ধতি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে নতুন পন্য বা সেবা প্রবর্তন করে তাকে বলে—
   (ক) ছোটো উদ্যোক্তা (খ) সরকারি উদ্যোক্তা
   (গ) পেশাজীবী উদ্যোক্তা (ঘ) অনুকরণকারী উদ্যোক্তা
5. এলন মাস্ক, মার্ক জুকেরবার্গ কী ধরনের উদ্যোক্ত?
   (ক) সামাজিক উদ্যোক্তা (খ) পরিবেশ বান্ধব উদ্যোক্তা
   (গ) প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা (ঘ) মন্থর উদ্যোক্তা

উত্তর ঃ 1. (খ), 2. (ক), 3. (খ), 4. (ঘ), 5. (গ)।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. উদ্যোক্তার সংজ্ঞা দিন।
2. উদ্যোক্তার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
3. উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 'নূতনত্বের প্রবর্তন' শব্দটি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
4. অনিশ্চয়তাকে বরদাস্ত করা উদ্যোক্তার একটি গুণাবলি ধারণা দিন।
5. উদ্যোক্তার কার্যাবলির মধ্যে উদ্যোগ সংক্রান্ত দুটি কার্যাবলি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
6. ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা কাকে বলে?

7. প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তার সংজ্ঞা দিন।
8. পেশাজীবী উদ্যোক্তা সম্পর্কে ধারণা দিন।
9. অনুকরণকারী উদ্যোক্তা বলতে কী বোঝেন?
10. সামাজিক উদ্যোক্তা কাকে বলে?

(গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. সামাজিক উদ্যোক্তা কাকে বলে? এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।
2. উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
3. উদ্যোক্তার কার্যাবলীর মধ্যে উদ্যোগ সংক্রান্ত ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি আলোচনা করুন।
4. উদ্যোক্তার প্রসারমূলক ও বাণিজ্যিক কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
5. উদ্যোগের প্রকৃতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ভিত্তিতে কত ধরনের উদ্যোক্তা হয় তাদের সম্পর্কে ধারণা দিন।
6. কার্যমূলক চরিত্র অনুসারে ও কাজের এলাকার ভিত্তিতে যে ধরনের উদ্যোক্তা দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করুন।

একক–2 : উদ্যোগ [Entrepreneurship]

গঠন

2.0 উদ্দেশ্য
2.1 প্রস্তাবনা
2.2 উদ্যোগ গ্রহণের সংজ্ঞা
2.3 উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি
2.4 উদ্যোগের উপাদানসমূহ
2.5 উদ্যোগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ
2.6 উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব
2.7 উদ্যোগের ক্রমবিকাশ
2.8 উদ্যোগ কর্মজীবন হিসেবে
2.9 সারাংশ
2.10 প্রশ্নাবলী

2.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন—

- উদ্যোগ গ্রহণ বলতে কী বোঝায়?
- উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি, গুরুত্ব।
- উদ্যোক্তার সংজ্ঞা ও ভূমিকা।
- উদ্যোগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ
- উদ্যোগের উপাদনসমূহ
- উদ্যোগের ক্রমিবকাশ
- নতুন উদ্যোগ সংক্রান্ত ধারণা

2.1 প্রস্তাবনা

উদ্যোগ গ্রহণ হল একটি বিশেষ কর্মপ্রক্রিয়া। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সেই দেশের কারবার কেমনভাবে চলছে তার উপর অনেকাংশ নির্ভর করে। আবার কারবার এমনি এমনি গড়ে ওঠে

না। যে সব কারবার আজ খ্যাতির শীর্ষে তার পেছনে সংশ্লিষ্ট কারবারের উদ্যোক্তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এবং উদ্যোক্তাই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রতিষ্ঠান তৈরী করা থেকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সমস্ত বিষয়েই তীক্ষ্ণ নজর রাখেন এবং প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনশীল করে তোলেন। কীভাবে বিষয়গুলি সম্ভব তা এই একক থেকে ধারণা পাওয়া যাবে।

2.2 উদ্যোগ গ্রহণের সংজ্ঞা

উদ্যোগ হল এমন এক বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা যা কোনো সুযোগকে কাজে লাগায় ও নতুন কিছু সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ঝুঁকি গ্রহণ করে। যারা উদ্যোগ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন তাদের উদ্যোক্তা বলা হয়। উদ্যোক্তা একজন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি হতে পারেন। এই এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা ও শ্রমকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ বলা হয়। উদ্যোক্তার ইংরাজি শব্দ হিসাবে 'Entrepreneur' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও তা কিন্তু ফরাসি শব্দ 'Entreprendure' থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এর থেকেই উদ্যোগের ইংরাজি প্রতিশব্দ Entrepreneureship-এর উদ্ভব হয়েছে। বস্তুত সংক্ষেপে উদ্যোগ বলতে বোঝায় কোনো কিছু উদ্ভাবনের ক্ষমতা যার ফলশ্রুতিতে নতুন কিছু সৃষ্টি হয়। সেকারণে উদ্যোগ বলতে বোঝায় নতুন কিছু সৃষ্টি করার লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা, সংগঠন গড়ে তোলা, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় করা, ঝুঁকিবহন করা ও সাথে সাথে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করা। উদ্যোগের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। তবুও বিভিন্ন বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগের যেসব সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা নীচে তুলে ধরা হল।

বেনজামিন হিগিনস (Benjamin Higgins) উদ্যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "উদ্যোগ হল দূরদর্শিতার সঙ্গে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সুযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলি, কোনো নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য সংগঠন গড়ে তোলা, মূলধন সংগ্রহ ও কর্মী নিয়োগ, কাঁচামালের যোগান অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা এবং সংস্থার দৈনন্দিন কার্যকলাপ দেখভাল করার জন্য শীর্ষ ব্যবস্থাপকের নির্বাচন।"

রবার্ট রনস্টাড (Robert Ronstad) প্রদত্ত সংজ্ঞাটির গ্রহণযোগ্যতা সর্বাধিক। উদ্যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রনস্টাড বলেছেন, "ক্রমবর্ধমান সম্পদ সৃষ্টির সচল প্রক্রিয়াই হল উদ্যোগ। সম্পদ সৃষ্টিতে এক বা একাধিক ব্যক্তি যুক্ত থাকে যে ওইসব পণ্য বা সেবা নতুন নয়, তবুও উদ্যোক্তাকে ওইসব পণ্য বা সেবার মধ্যে নিজের দক্ষতা ও কর্মকুশলতার মিশ্রণ ঘটাতে হয় যাতে পণ্য বা সেবার মূল্য বৃদ্ধি পায়।" এই সংজ্ঞার সারবত্তা হল যে উদ্যোগ হল এমন এক প্রক্রিয়া যাতে উদ্যোক্তা দুঃসাহসিক কাজের ঝুঁকি বহন করে।

জে. সি. বার্না (J. C. Berna) সংক্ষিপ্তাকারে উদ্যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে "উদ্যোগ হল এক ধরনের মানবিক দক্ষতা। অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে উদ্যোগ হল দক্ষতা ও সক্ষমতার সংযুক্তিকরণ।"

প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ **পি. এফ. ড্রাকারের** (P. F. Drucker) মতে, "সম্পদকে প্রগতিশীল কাজের উদ্দেশ্যে পরিচালনা করাই হল উদ্যোগ গ্রহণ।"

এম. সি. গুপ্তা (M. C. Gupta) উদ্যোগ সম্পর্কে বলেছেন, "উদ্যোগ হল বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সুযোগ সন্ধানের কাজ। বিনিয়োগ ও সুযোগ সন্ধানের এই প্রক্রিয়ায় মূলধন সংগ্রহ ও উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সংগঠন গড়ে তোলা, মানবিক সম্পদ ও কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা, কৌশল চূড়ান্ত করা ও ব্যবস্থাপক নির্বাচন করা আবশ্যক।"

প্রায় একই সুরে উদ্যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **পল. এইচ. উইলকেন** (Paul H. Wilken) বলেছেন—"উৎপাদনে পরিবর্তন শুরু করাই হল উদ্যোগ। উদ্যোক্তা সবসময়ই পরিবর্তনের সন্ধান করেন, পরিবর্তনে সাড়া দেন এবং পরিবর্তনকে সুযোগ হিসাবে গণ্য করে পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই নিজের স্বার্থপূরণ করেন।"

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ **জোসেফ শুমপিটার** (Joseph Schumpeter) উদ্যোগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটি বিখ্যাত উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, "উদ্যোগ হল গঠনমূলক ধ্বংস শক্তি (A force of creative destruction)। অর্থাৎ কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রচলিত পদ্ধতিকে বাতিল করে নতুন ও অপেক্ষাকৃত ভালো পদ্ধতির প্রয়োগ প্রক্রিয়াই হল উদ্যোগ।"

পরিশেষে উপরের সংজ্ঞাগুলির প্রেক্ষাপটে উদ্যোগের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, "যে প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক ব্যক্তির ক্ষমতা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতার সমন্বয়ে উৎপাদিত কোনো পণ্য বা সেবার মধ্যে বিশেষ কোনো মূল্য সৃষ্টি করা যায় সেই প্রক্রিয়াকে উদ্যোগ বলে।"

2.3 উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন যে, উদ্যোগ গ্রহণ হল এমন একটি প্রচেষ্টা যার সাহায্যে ক্ষমতা, দক্ষতা, আকাঙ্ক্ষা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগানো যায়। উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি নীচে আলোচনা করা হল :

(ক) উদ্যোগ গ্রহণ একটি প্রক্রিয়া : উদ্যোগ গ্রহণ যেহেতু নির্দিষ্ট একটি কাজ করা নয়, পারস্পরিক বহু কাজের সম্মিলিত একটি প্রচেষ্টা, তাই এটিকে একটি প্রক্রিয়া বলা হয়।

(খ) সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন : সৃজনশীলতা হল একটি প্রতিভা যা নতুন ধারণার জন্ম দেয় এবং যার ফলস্বরূপ নতুন দ্রব্য এবং সেবা সৃষ্টি সম্ভব। এই নতুন সেবা এবং দ্রব্যকে নতুন স্তরে উন্নীত করাকে উদ্ভাবন বলে। উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি হল সৃজনশীলতা-উদ্ভাবন সৃষ্টিতে সাহায্য করা।

(গ) নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন : উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্ভব হয়। কাঁচামাল

সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে মানবিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার উদ্যোগ গ্রহণের অন্যতম প্রকৃতি।

(ঘ) **গতিশীলতা :** ব্যবসার পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়। যার সাহায্যে নতুন দ্রব্য ও সেবারও সৃষ্টি হয়। উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসার এই গতিশীলতা বজায় থাকে।

(ঙ) **ঝুঁকি গ্রহণ :** উদ্যোগ গ্রহণের অন্যতম প্রকৃতি হল ঝুঁকি গ্রহণ। নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও তার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি থকে। তাই বলা হয় উদ্যোগ গ্রহণের অন্যতম প্রকৃতি হল ঝুঁকি গ্রহণ।

(চ) **সামাজিক কাজ সম্পাদন :** নতুন নতুন প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদ্যোগ গ্রহণের অন্যতম কাজ যেহেতু নতুন উদ্যোগ প্রস্তুত করা, সেজন্য বলা যেতেই পারে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

(ছ) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের শিল্প ও সেবা উৎপাদনকারী সংস্থা গড়ে ওঠে এবং উদ্যোক্তার দক্ষতার উপর দাঁড়িয়ে সেই সব শিল্প তাদের সংশ্লিষ্ট দ্রব্য তৈরী ও বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে। এইরকমভাবে ক্রমান্বয়ে সমস্ত উদ্যোগগুলি আপন আপন কাজ সম্পাদন করার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

2.4 উদ্যোগের উপাদানসমূহ

উদ্যোগের উপাদানসমূহ বলতে বোঝায় যেগুলি ছাড়া একটি উদ্যোগ সাধারণভাবে গড়ে উঠে না। অর্থাৎ যেগুলি একটি উদ্যোগ বিশেষত বাণিজ্যিক উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে গণ্য হয়। উদ্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বই বা লেখা থেকে দেখা যা নীচের সাতটি উপাদানকে উদ্যোগের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এগুলি নীচে একটি তালিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হল :

উদ্যোগের উপাদানসমূহ :

1. সৃজনশীল ধারণা (Innovative idea)
2. অনুপ্রেরণা ও অঙ্গীকার (Motivation and commitment)
3. ক্ষমতা ও দক্ষতা (Ability and Skill)
4. সম্পদ (Resources)
5. কৌশল ও দূরদৃষ্টি (Strategy and Vision)
6. পরিকল্পনা ও সংগঠন (Planning and Organising)
7. বাজার সংক্রান্ত ধারণা (Idea of Market)

নীচে এই সাতটি উপাদান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল :

1. **সৃজনশীল ধারণা (Innovative Idia) :** প্রতিটি উদ্যোগ একটি সৃজনশীল ধারণার উপর গড়ে ওঠে। সৃজনশীল ধারণাই হল উদ্যোগের বীজ যা কালক্রমে বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়। সৃজনশীল বা সৃষ্টিশীল ধারণা হল যা নতুন কোনো বিষয়কে তুলে ধরে ও যার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা থাকে। এই সম্ভাবনার বিষয়টি সকলের চোখে ধরা পড়ে না। কেবলমাত্র উদ্যোক্তাদের চোখেই ধরা পড়ে। অর্থাৎ যারা নতুন কিছু গড়ে তুলতে চায় তারাই পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উদ্যোগ গড়ে তুলতে উৎসাহিত হয়। এই সৃজনশীল বা নতুন ধারণা ছাড়া কোনো উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। তাই এটি হল উদ্যোগের বীজ যা উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় পরবর্তীকালে পল্লবিত হয় ও নতুন নতুন পণ্য বা সেবা বা পদ্ধতির জন্ম দেয়।

2. **অনুপ্রেরণা ও অঙ্গীকার (Motivation and Commitment) :** অনুপ্রেরণা হল মানুষের আবেগজনিত আচরণ। মানুষের অভ্যন্তরীণ আবেগকে ক্রিয়াশীল করে উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালনা করাই হল অনুপ্রেরণা। উদ্যোগ গঠনের উদ্যোক্তার মধ্যে এই অনুপ্রেরণা থাকা আবশ্যিক। অনুপ্রেরণাই উদ্যোক্তাকে নতুন কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করে। সেকারণে একে 'ইচ্ছাশক্তি' বা 'মানসিক শক্তি'-ও বলা হয়। আর উদ্যোগ গড়ে তুলতে যেহেতু ঝুঁকি বহন করতে হয় তাই উদ্যোক্তার মধ্যে সেই ইচ্ছাশক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়।

   অন্যদিকে অঙ্গীকার হল কোনো কিছু করার শপথ। মানসিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে বলেই উদ্যোক্তারা উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তিগুলি মোকাবিলা করার শক্তি পায়। অঙ্গীকার নতুন কিছু সৃষ্টি করার সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাকে উদ্বুদ্ধ করে। সেকারণে অনুপ্রেরণা ও অঙ্গীকার উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে গণ্য হয়।

3. **ক্ষমতা ও দক্ষতা (Ability and Skill) :** উদ্যোগের সাফল্য অনেকাংশই নির্ভর করে উদ্যোক্তার ক্ষমতা ও দক্ষতার উপর। বস্তুত একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে কর্মীদের ক্ষমতা ও দক্ষতার উপর। এখানে ক্ষমতা বলতে শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষমতাকেই বোঝায় এবং দক্ষতা হল কর্মদক্ষতা অর্থাৎ কাজের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি, অপচয় ও দুর্ঘটনা হ্রাস। ক্ষমতা কমবেশি স্থিতিশীল কিন্তু দক্ষতা স্থিতিশীল নয়, পরিবর্তনশীল। একই কাজ বারে বারে করতে করতে অর্থাৎ অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করা যায়। উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সার্বিক ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করতে হয়। অন্যথায় উদ্যোগে সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয় না। সেকারণেই ক্ষমতা ও দক্ষতা হল উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

4. **সম্পদ (Resources) :** উদ্যোগের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য অর্থাৎ উদ্যোগের বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের জন্য সম্পদ সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যোগ গঠনে ও উদ্যোগের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সম্পদের প্রয়োজন। উদ্যোগের প্রয়োজনীয় সম্পদ

দু-ধরনের—বস্তুগত সম্পদ ও মানবিক সম্পদ। বস্তুগত সম্পদ আহরণের জন্য আবার আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়। উদ্যোগের কার্যকলাপ এই বস্তুগত ও মানসিক সম্পদের মিথস্ক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় ও উদ্যোগের উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়। তবে কোনো উদ্যোগই সম্পদ ব্যতিরেকে গড়ে উঠতে পারে না। তাই একে উদ্যোগের মৌলিক উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত হল মূলধন, পরিকাঠামো, কাঁচামাল, কর্মী ইত্যাদি।

5. **কৌশল ও দূরদৃষ্টি (Strategy and Vision) :** কৌশল হল এমন এক পরিকল্পনা যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়। অন্যদিকে দূরদৃষ্টি হল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমান। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা কৌশল স্থির করা হয়। কৌশল ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ঝুঁকি মোকাবিলা করা সহজ হয়। উদ্যোগ যেহেতু নতুন কিছু করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠে তাই অনিশ্চয়তার ঝুঁকি থাকেই। এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য উদ্যোক্তাদের যেমন দূরদৃষ্টি থাকা দরকার তেমনি ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলও স্থির করতে হয়। সেকারণেই কৌশল ও দূরদৃষ্টিকে উদ্যোগের উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।

6. **পরিকল্পনা ও সংগঠন (Planning and Organisation) :** পরিকল্পনা বলতে বোঝায় ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের রূপরেখা যা বর্তমানে স্থির করা হয়। পূর্বানুমানের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা রচিত হয়। উদ্যোগের সাফল্য অনেকটাই পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। প্রবাদ আছে যে ‘পরিকল্পনা সঠিক হলে অর্ধেক কাজ সমাপ্ত হয়’। তাই পরিকল্পনাকে সাফল্যের অগ্রদূত বলা হয়। উদ্যোগের ক্ষেত্রেও সঠিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। পরিকল্পনাহীন কোনো উদ্যোগ উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হয়। তাই উদ্যোগ গড়ে তুলতে সঠিক পরিকল্পনা অপরিহার্য।

   অন্যদিকে সংগঠন হল উদ্যোগের কর্মীদের কাজের সাথে যুক্ত করা ও তাদের মধ্যে দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন করা। সংগঠন ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। সঠিক কাজে সঠিক কর্মীকে সঠিক সময়ে নিযুক্ত করাই হল প্রতিষ্ঠানে সংগঠন গড়ে তোলা। সংগঠনের মাধ্যমেই উদ্যোগের বস্তুগত, আর্থিক ও মানবিক সম্পদ ক্রিয়াশীল হয়, লক্ষ্যসাধনে ব্রতী হয়। কাজেই উদ্যোগকে সফল করতে সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একারণে সংগঠনকে উদ্যোগের উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।

7. **বাজার সংক্রান্ত ধারণা (Idea of Market) :** উদ্যোগ হল একটি বাণিজ্যিক প্রয়াস। উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন কোনো পণ্য বা সেবা বা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এই নতুন পণ্য বা সেবা বাজারে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করাই উদ্যোগের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। উদ্যোগ সবসময়ই প্রচলিত পণ্য বা সেবার চেয়ে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে ক্রেতাদের অধিক সন্তুষ্ট করার ব্যবস্থা করে। আর যেহেতু ক্রেতাদের রুচি, পছন্দ, প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার মধ্য দিয়েই বাজার গড়ে ওঠে তাই উদ্যোক্তাদের বাজার সংক্রান্ত সঠিক ধারণা থাকা অত্যন্ত আবশ্যক।

কারণ উদ্যোগকে টিকে থাকতে হলে ও উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে হলে বাজার সংক্রান্ত ধারণা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেকারণেই বাজার সংক্রান্ত ধারণাকেও উদ্যোগের উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।

2.5 উদ্যোগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

উদ্যোগ গঠন ও উন্নয়ন কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার নয়। বরঞ্চ এটি হল একাধিক বিষয়ের সম্মিলিত ফল এবং এগুলি হল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ। উদ্যোগ গঠনে এই বিষয়গুলির ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় প্রভাবই থাকে। ধনাত্মক প্রভাব উদ্যোগ গঠনে সহায়তা করে আর ঋণাত্মক প্রভাব উদ্যোগ গঠনে বাধা দেয়। উদ্যোগের উদ্ভব ও উন্নয়নে এই বিষয়গুলিই নির্ধারণকারী বা প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। এই বিষয়গুলিকে প্রাথমিকভাবে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। নীচে রেখাচিত্রের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি তুলে ধরা হল :

উদ্যোগ গঠনকারী বা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

- 1. অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ (Economic factors)
  - (i) মূলধন (Capital)
  - (ii) শ্রমিক (Labour)
  - (iii) কাঁচামাল (Raw materials)
  - (iv) বাজার (Market)
- 2. অনার্থিক বিষয়সমূহ (Other factors)
  - (i) সামাজিক অবস্থা (Social condition)
    - (a) উদ্যোগের আইনানুগ বৈধতা (legitimacy)
    - (b) সামাজিক গতিশীলতা (Mobility)
    - (c) সামাজিক প্রান্তিকতা (Marginality)
    - (d) নিরাপত্তা (Security)
  - (ii) মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ
    - (a) চাহিদা পূরণ (Need achievement)
    - (b) মর্যাদা অপসারণ (Status withdrawal)
  - (iii) সরকারি কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি (Attitude and action of Government)

নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল—

1. অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ (Economic Factors) : অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে যেসব বিষয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দেয় সেই বিষয়গুলিই উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়নে সহায়তা করে। অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ বলতে প্রধানত বোঝায় মূলধন, শ্রমিক, কাঁচামাল ও বাজার। এদের সম্বন্ধে নীচে ধারণা দেওয়া হল :

(a) মূলধন : কোনো কারবারি উদ্যোগ গড়ে তুলতে প্রথমেই যার প্রয়োজন সর্বাধিক তা হল মূলধন। মূলধনের মাধ্যমই উদ্যোক্তা জমি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও শ্রমিক সংগ্রহ করে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করে। অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখা গেছে যে অর্থনীতিতে মূলধনের যোগান ভালো থাকলে বিনিয়োগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ও উদ্যোগ স্থাপনও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিলে মূলধনের অভাব উদ্যোগ স্থাপনে বাধা দেয়।

(b) শ্রমিক : উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। শ্রমিকরাই হল প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ যা কাঁচামালকে পণ্যে পরিণত করে ও উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখে। তাই উদ্যোগ স্থাপনে শ্রমিকের সংখ্যাগত মান ও গুণগত মান উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতার উপরও উদ্যোগ স্থাপন নির্ভর করে। অবশ্য বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কম সংখ্যক দক্ষ শ্রমিকের সাহায্যেই উদ্যোগ স্থাপন করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উদ্যোগের মূলধনের পরিমাণ বেড়ে যায়, কারণ উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। ভারতের মতো অধিক জনসংখ্যার দেশে শ্রমিক সহজলভ্য। তবে শ্রমিকদের গুণগত মান খুব উন্নত না হওয়ার কারণে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলতে হয়। অন্যথায় উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এদেশে শ্রমিক সমস্যা সেভাবে না থাকলেও মূলধন সংগ্রহই প্রধান সমস্যা বলে গণ্য হয়।

(c) কাঁচামাল : যেকোনো শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল পণ্যে পরিণত হয় যা ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। কাঁচামাল ছাড়া কোনো শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে না। যদিও প্রযুক্তি কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ হ্রাস করতে পারে কিন্তু কাঁচামাল ছাড়া উৎপাদন চালাতে পারে না। তাই বলা হয় যে কাঁচামালের সহজলভ্যতা উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে। অন্যভাবে বলা যায় যে কাঁচামালের সহজলভ্যতা পরোক্ষভাবে উদ্যোগ স্থাপনে ও উদ্যোগ উন্নয়নে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

(d) বাজার : উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বাজার বা বাজারের সম্ভাবনা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। উদ্যোগ হল একটি বাণিজ্যিক প্রচেষ্টা এবং সাফল্য নির্ভর করে বাজারের চাহিদার ধরন, প্রকৃতি ও গভীরতার উপর। উৎপাদিত পণ্য বাজারে গৃহীত হওয়ার

সম্ভাবনা থাকলে তবেই উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে। কারণ উৎপাদিত পণ্য বাজারেই বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত হয়। কাজেই বাজারের আয়তন ও গঠন উভয়ই উদ্যোগ স্থাপনে বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাই একচেটিয়ার বাজারে উদ্যোগ স্থাপন যত আকর্ষণীয় হয় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ততটা আকর্ষণীয় হয় না। তাই বলা হয় যে নতুন বাজারের উদ্ভব ও প্রসারের সাথে নতুন উদ্যোগও গড়ে ওঠে। আর বাজারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই উদ্যোগ গঠনের প্রধান নির্ণায়ক বিষয় হিসাবে গণ্য হয়।

2. অন্যান্য বিষয়সমূহ (Other Factors) : সমাজবিদ ও মনোবিদরা দাবি করেন যে উদ্যোগ স্থাপনে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে অপরিহার্য শর্ত হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু সেগুলি উদ্যোগ স্থাপনে ও উন্নয়নে একমাত্র শর্ত হিসাবে গণ্য হতে পারে না। তাঁরা আরও বলেন যে অর্থনৈতিক বিষয়গুলির উপস্থিতির সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়গুলির উপস্থিতিও উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য এবং এই বিষয়গুলি হল সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক। এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

(i) সামাজিক বিষয়সমূহ (Social factors) : এর অন্তর্ভুক্ত হল উদ্যোগের আইনানুগ বৈধতা, সামাজিক সচলতা, প্রান্তিকতা (marginality) ও নিরাপত্তা। নীচে এগুলি আলোচনা করা হল।

(a) উদ্যোগের আইনানুগ বৈধতা (Legal validity) : সামাজিক বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম অপরিহার্য বিষয় হল উদ্যোগের আইনানুগ বা আইনগত বৈধতা। **শুমপিটার** (Schumpeter) এধরনের বৈধতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে সামাজিক আবহাওয়া অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। **কোচ্‌রান** (Cochran) একে সাংস্কৃতিক ভাব (theme) ও অনুমোদন হিসাবে অভিহিত করেছেন। উদ্যোগ গঠন গতিশীল হয় যখন আইনানুগ বৈধতা বেশি মাত্রায় থাকে। অবশ্য বিপরীত অবস্থাতেও উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে যদি সেক্ষেত্রে সরকারি কার্যকলাপ উদ্যোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান করে।

(b) সামাজিক গতিশীলতা (Social dynamics) : সামাজিক গতিশীলতা বলতে সামাজিক ও ভৌগোলিক গতিশীলতার মাত্রা এবং একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে গতিশীলতার প্রকৃতিকে বোঝায়। তবে উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক গতিশীলতাকে নির্ধারণকারী বিষয় হিসাবে গণ্য করার ক্ষেত্রে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে বেশি মাত্রায় সামাজিক গতিশীলতা উদ্যোগ স্থাপনের সহায়ক। আবার অন্যান্য কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে সামাজিক গতিশীলতার মাত্রা কম হলে উদ্যোগ স্থাপনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তবে উভয়পক্ষই যে বিষয়ে একমত হন তা হল যে সামাজিক গতিশীলতার মাত্রা বা প্রকৃতি এককভাবে উদ্যোগ স্থাপনকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং উদ্যোগ স্থাপন সম্ভব করতে হলে এর সাথে অন্যান্য প্রভাবকারী বিষয়েরও উপস্থিতি থাকতে হবে।

(c) **প্রান্তিকতা (Marginality) :** বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সমাজের প্রান্তিক ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রবণতা বেশি। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের অবস্থান তাদের উপর একধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তৈরি করে। এর ফলে তারা উদ্যোগ স্থাপনের মাধ্যমে সমাজে তাদের অবস্থানকে উন্নত করতে চায়। তাদের প্রান্তিক অবস্থানের কারণে তারা যে অসুবিধা সম্মুখীন হয় তা দূর করার লক্ষ্যেই তারা উদ্যোগ স্থাপনে আগ্রহী হয়। তবে সমাজে প্রান্তিক অবস্থানই উদ্যোগ স্থাপনের কারণ হতে পারে না যদি না উদ্যোগ স্থাপনের অন্যান্য বিষয়গুলি অনুকূল হয়। সে কারণে উদ্যোগ স্থাপনের এটিই একমাত্র কারণ নয়।

(d) **নিরাপত্তা (Scecurity) :** অনেক উদ্যোগ বিশষজ্ঞ এই মত পোষণ করেন যে উদ্যোগজনিত নিরাপত্তা উদ্যোগমূলক আচরণকে প্রভাবিত করে। আবার অনেকে বলেন যে নিরাপত্তাহীনতা উদ্যোগ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে না বরঞ্চ বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তাহীনতা বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ স্থাপনের সাহায্য করে। বস্তুত নিরাপত্তা উদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। এর পিছনে কারণ হল যে উদ্যোক্তা যদি তার অর্থনৈতিক সম্পদ হারানোর ভয় পায় বা সে নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হয় তাহলে সে উদ্যোগ স্থাপনে অগ্রসর হতে চায় না কারণ এর ফলে তার সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

(ii) মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ ((Psychological factors) : উদ্যোগীয় তাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই উদ্যোগ স্থাপনে উদ্যোক্তার মনস্তাত্ত্বিক দিকের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা উদ্যোক্তার মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেসব তত্ত্ব দিয়েছেন সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

(a) **চাহিদা পূরণ :** এইসব উদ্যোগীয় তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে উদ্যোগ স্থাপনের পিছনে প্রধান কারণটি হল উদ্যোক্তার নিজস্ব চাহিদা পূরণ। সেকারণেই একে উদ্যোগ স্থাপনের অন্যতম প্রধান নির্ণায়ক বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। এঁদের মতানুযায়ী চাহিদা পূরণের ইচ্ছা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা যায়।

(b) **মর্যাদার অপসারণ :** সমাজে যেসব ব্যক্তি শ্রদ্ধার আসনে আসীন থাকেন তাঁদের এই মর্যাদা যদি পরবর্তীকালে অপসৃত হয় তাহলে তাদের মধ্যে উদ্যোগ স্থাপনের আগ্রহ জন্মে। কারণ তারা তাদের পূর্ব মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চায়। উদাহরণ হিসাবে এসব তাত্ত্বিকরা জাপানের উদ্যোগ উন্নয়নের বিষয়টি তুলে ধরেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার ফলে তার অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে বিশ্বে নিজের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য জাপান আধুনিক উদ্যোগ স্থাপনে এগিয়ে আসে ও তার অর্থনীতিকে মজবুত করতে সক্ষম হয়।

(iii) সরকারি কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি (Government actions and attitude) : সরকারি

কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি উদ্যোগ গঠনের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে। দেশের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিলে একটি স্বচ্ছ শিল্পনীতি তৈরি করে এবং উদ্যোগ স্থাপনে সহায়তা করে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন, মূলধন ও কাঁচামালের ব্যবস্থা, শিল্পের নিরাপত্তা ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার উদ্যোগ গঠনে সহায়তা করে। অর্থাৎ উদ্যোগীয় পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে ভারতবর্ষে সরকার বিভিন্ন শিল্প তালুক, রপ্তানি উন্নয়ন এলাকা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) ইত্যাদি গড়ে তুলে উদ্যোগ গঠনের সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। এছাড়াও এসব অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের বিশেষ ছাড়, বিশেষ উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারত সরকার 1991 সালে 'অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ কুটিরশিল্পের উন্নয়ন ও শক্তিশালী করার নীতি' ঘোষণা করেন। এর ফলে ভারতে এসব ক্ষেত্রের শিল্পোদ্যোগের প্রভূত উন্নয়ন হয়। এছাড়াও 2006 সালে 'অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোগী সংস্থার উন্নয়ন আইন' (MSMED) চালু হয়। এর ফলে এসব উদ্যোগের স্থাপন ও উন্নয়ন অনেকাংশে বৃদ্ধিপায়। সাথে সাথে এধরনের (MSMED) সংস্থাগুলির জন্য একটি পৃথক মন্ত্রক সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ সরকারি সহায়তায় নতুন নতুন উদ্যোক্তা ও নতুন নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ সরকারি সহায়তার ফলে উদ্যোগের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পায়। এছাড়াও ঝুঁকিবহুল ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ গড়ে ওঠার ফলে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় ও উদ্যোগের কাজকর্মে উদ্যোক্তরা বেশি বেশি করে যত্নশীল হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায় যে উদ্যোগ স্থাপনে বা উদ্যোগ উন্নয়নে কোনো একটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায় না। যেসব বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে এসেছে সেই সব বিষয়গুলিই উদ্যোগ গড়ে ওঠার পিছনে প্রভাব বিস্তার করে। কারণ এই সমস্ত বিষয়গুলিই স্বাধীন কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং পরিপূরক ও নির্ভরশীল এবং উদ্যোগ গঠনে প্রতিটি বিষয়েরই বিশেষ ভূমিকা থাকে।

2.6 উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব

উদ্যোগ গ্রহণ হল ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কারবার স্থাপন ও পরিচালনা করা। উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব অসীম। নীচে সেইসব বিষয় আলোচিত হল :

(ক) নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি : উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য নানা প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যবহার করা হয়। নিত্যনতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ফলে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে থাকে।

(খ) ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি : উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায় এই কারণে যে, এতে সৃজনশীলতা ও গঠনমূলক চেষ্টা থাকে। এই প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপকরণগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে সমাজে মোট সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায়।

(গ) **অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ :** মালিকানা, ব্যবস্থাপনা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন, উৎপাদন ইত্যাদির সমন্বয় ঘটে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে। এই বিষয়গুলি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদনে সহায়তা করে এবং নতুন অর্থনৈতিক কাজকর্মের দিশা দেখায়।

(ঘ) **উদ্ভাবন :** উদ্ভাবন হল নতুন কিছু আবিষ্কার করা। উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্ভাবনকে বাণিজ্যিক সাফল্যে ব্যবহার করা হয়। তাই উদ্যোগগ্রহণ উদ্ভাবন করার স্পৃহাকে জাগ্রত করে যা দেশের মানবিক সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায়।

(ঙ) **সমাজমুখী প্রচেষ্টা :** উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন ধরনের উপকার হয় যেমন, নতুন কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হয়, ভোক্তার চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী পণ্য বা সেবা উৎপাদন হয় ইত্যাদি। সুতরাং, বলা যেতেই পারে, উদ্যোগ গ্রহণ যে কোনো ধরনের সমাজমুখী প্রচেষ্টাকে চালু রাখে।

(চ) **সম্পদ ও মূল্য সৃষ্টি :** উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ ও মূল্য সৃষ্টি সম্ভব হয়। উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন কাঁচামাল ও দ্রব্য সামগ্রী উদ্ভাবন সম্ভব হয় যা নতুন সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সুতরাং, বলা যেতে পারে উদ্যোগ গ্রহণ বিশেষ মূল্য সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

2.7 উদ্যোগের ক্রমবিকাশ

উদ্যোগ সংক্রান্ত ধারণাটি বহুকাল আগে উদ্ভূত হলেও বহুদিন পর্যন্ত এটি তেমন পরিচিতি লাভ করেনি। অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপাদান হিসাব জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোগকে গণ্য করা হত। অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান হিসাবে বহুকাল আগেই উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। 1755 সালে **রিচার্ড ক্যাটিলন** (Richard Cantillon) প্রথম উদ্যোগকে অর্থনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মতে উদ্যোক্তারা সম্পদ বণ্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সচেতনভাবে গ্রহণ করেন।

1776 সালে **অ্যাডাম স্মিথ** (Adam Smith) তাঁর বিখ্যাত "Wealth of Nation" গ্রন্থে enter-priser কথাটি উল্লেখ করেন। এর মাধ্যমে তিনি এমন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছেন যিনি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর মতে উদ্যোক্তারাই অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সাড়া দেন এবং তাঁরা অর্থনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে চাহিদাকে যোগানে রূপান্তরিত করেন। **স্মিথের** ভাবনার রেশ পরবর্তীকালেও দেখতে পাওয়া যায় অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের লেখাতেও। **কার্ল মেনজার** (Karl Menger) 1871 সালে বলেন যে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উদ্ভব পরিস্থিতি থেকে হয় না, পরিস্থিতি সম্পর্কে মানুষের সচেতনা ও অনুধাবন ক্ষমতা থেকে ওই পরিবর্তন ঘটে। তিনি আরও বলেন যে তাঁর মতে একজন উদ্যোক্তা হলেন পরিবর্তন সাধনকারী যিনি সম্পদকে ব্যবহারের উপযোগী পণ্য বা সেবায় পরিবর্তন করেন। এভাবেই উদ্যোক্তা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন যাতে শিল্পের উন্নয়ন ঘটে।

উনিশ শতকে উদ্যোক্তাদের শিল্পের কান্ডারী, ঝুঁকি বহনকারী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বলা হত। যেসব ব্যক্তি ঝুঁকি নিয়ে সম্পদ অর্জনে আগ্রহী এবং যাঁরা নতুন শিল্প, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যাবতীয় কাজ করেন

তাঁরাই হলেন উদ্যোক্তা। **শুমপিটার** (Schumpeter) উদ্যোগ ধারণাটির পরিমার্জন করেন বিশ শতকে। তিনিই প্রথম উদ্যোগকে **গঠনমূলক ধ্বংসের শক্তি** (Creative destruction force) নামে অভিহিত করেন। তাঁর মতে উদ্যোগ হল একটি প্রক্রিয়া এবং প্রকৃতপক্ষে এটি হল একটি গঠনমূলক কাজ। উদ্যোক্তারা সম্পদের নতুন সমন্বয় ঘটিয়ে ও নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনের মাধ্যমে শিল্প-বাণিজ্যে নতুন কিছু প্রবর্তন করেন বলেই তাঁদের উদ্ভাবক বলা হয়। তিনি আরও বলেন যে সমাজে এই ধরনের উদ্ভাবনকারী খুব বেশি থাকে না এবং তাঁদের উন্নয়নের কান্ডারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ **ম্যাক্স ওয়েবার**-এর মতে সৃষ্টিমূলক ও উদ্যোগ সংক্রান্ত কার্যকলাপ বাহ্যিকভাবে গড়ে ওঠা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এর ফলে নতুন দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন সম্ভব হয়। তাঁর মতে উদ্যোক্তারা এক বিশেষ সামাজিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হন। আর এই পরিবেশ হল যে সামাজিক পরিবেশে তাঁরা বসবাস করেন এবং যে পরিবেশ প্রকৃতই তাঁদের উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলে।

ভারতে উদ্যোগের ক্রমবিকাশ (Evolution of Entrepreneurship of India)

ভারতে উদ্যোগ বিকাশের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। ভারতবর্ষ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ—প্রায় দু-শতক পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। কাজেই শিক্ষার প্রসার যেমন হয়নি, সাথে সাথে শিল্পের বিকাশও সেভাবে গতি পায়নি। কেবলমাত্র কৃষিজ কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে এই দেশে বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্পের মতো কিছু শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল প্রধানত ইংরেজ বণিকদের হাত ধরে। তাই প্রকৃতপক্ষে ভারতে শিল্পোদ্যোগের সূচনা হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্তনের পর। 1673 ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে জাহাজ তৈরির কারখানা গড়ে তোলে। উদ্যোক্তা হিসাবে ভারতের পার্শি সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথম উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসে এবং ওই সম্প্রদায়েরই **মনজিধনজি** নাম এক ব্যক্তি বারুদ তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। পরবর্তী দুশো বছরে ভারতবর্ষে উদ্যোগের সেভাবে অগ্রগতি হয়নি। এর পিছনে প্রধান কারণ হল ব্রিটিশ শাসকরা এদেশে শিল্প-উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। বরঞ্চ ভারতীয় উদ্যোগপতিদের প্রচেষ্টাকে অসহযোগিতা করেছে। অবশ্য অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। এই শতকের শেষ দশকে কিছু ভারতীয় উদ্যোক্তা চর্মশিল্প, ইস্পাত, জাহাজ নির্মণ, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলে। এই সময়কালে ব্রিটিশ শাসকরাও নিজেদের স্বার্থে চা, কফি ও নীল শিল্প গড়ে তোলে। ভারতে ইস্পাত শিল্পের পথিকৃৎ হিসাবে **জে. আর. ডি. টাটা** অধুনা ঝাড়খন্ডের জামসেদপুরে একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলেন যা **টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি** (TISCO) নামে সমধিক পরিচিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু মাড়ওয়ারি ও গুজরাটি উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসেন এবং এসময় অনেকগুলি চিনি ও সিমেন্ট কারখানা গড়ে ওঠে। একই সময়ে অন্যান্য কিছু ভারতীয় উদ্যোগীদের প্রচেষ্টায় কয়েকটি কাগজ ও তামাক জাতীয় পণ্যের শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠতে দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয়দের মধ্যে শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার স্পৃহাকে উৎসাহ দিয়েছিল। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে শিল্পভিত্তিক উদ্যোগ গড়ে তোলার জোয়ার দেখা যায়। ব্রিটিশ সরকারও যুদ্ধকালীন প্রয়োজন

মেটানো স্বার্থে ভারতে শিল্প উদ্যোগ গড়ে তুলতে সহায়তা করতে শুরু করে। ভারতের প্রধান প্রধান শহর ও শহরতলিতে প্রচুর পরিমাণে ছোটো-বড়ো কারখানা গড়ে উঠতে দেখা যায়।

স্বাধীনোত্তর ভারতে রাশিয়ার অনুকরণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নয়ন যাতে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প বিকাশের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই পরিকল্পনাকালে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ছোটো শিল্পের বিকাশের উপরও জোর দেওয়া হয়েছিল। ভিলাই, রাউরকেল্লা ও দুর্গাপুরে লৌহ-ইস্পাতের তিনটি বৃহদায়তন কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল। এর সাথে সাথে সুষম শিল্পবিকাশের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পবিকাশ কেন্দ্র ও শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হয়। তবে কেবলমাত্র শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলাই নয়, উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানে ও প্রশিক্ষণের জন্য আমেদাবাদে 1983 সালে **এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অব্ ইন্ডিয়া** স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মিলিতভাবে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ওই বছরেই ভারত সরকারও ক্ষুদ্রায়তন কারবারি উদ্যোগ সমেত বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের জন্য দিল্লিতে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হল **'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড স্মল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট'**। দেশের আর্থিক বিকাশের জন্য যে উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়ন অত্যাবশ্যক তা বিগত শতকের আশির দশকেই স্বীকৃত হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য 'START UP' প্রকল্প চালু করেছেন, যদিও এই প্রকল্পের অধীনে যেসব প্রকল্প গড়ে উঠেছে তার মূল্যায়ন এখনও হয়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে ভারতবর্ষে যে মিশ্র অর্থনীতি অনুসৃত হত তার ফলস্বরূপ বেসরকারি উদ্যোগের উপস্থিতিই সর্বাধিক। সরকারি উদ্যোগ কেবলমাত্র কতকগুলি কোর সেক্টরেই সীমিত ছিল। বেসরকারি উদ্যোগক্ষেত্রে যেসব উদ্যোক্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে রয়েছে জে. আর. ডি. টাটা, ধীরুভাই আম্বানি, ঘমশ্যামদাস বিড়লা, ডালমিয়া, বাজাজ, মিত্তাল ইত্যাদি। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতা করছে যাতে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হয়। বর্তমানে ভারতের জনগণের প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই ভারতীয় উদ্যোগ সরবরাহ করে।

2.8 উদ্যোগ কর্মজীবন হিসেবে

সাধারণভাবে উদ্যোগ বা উদ্যোগ গ্রহণ হল এক মানবিক প্রচেষ্টা যা লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সবধরনের মানবিক প্রচেষ্টাই কারবারি জগতে উদ্যোগ হিসাবে গণ্য হয় না। অর্থনীতিবিদ্‌রা উৎপাদনের উপাদান হিসাবে **মূলধন, কাঁচামাল** ও **শ্রমের** সাথে সাথে **উদ্যোগকেও** একটি উপাদান হিসাবে গণ্য করেন। কাজেই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপাদান। বস্তুত উদ্যোগ হল এমন এক প্রচেষ্টা যা **ঝুঁকিবহুল, গতানুগতিক** কারবারি প্রচেষ্টা নয় এবং যার মধ্যে **সৃজনশীলতা** ও **উদ্ভাবন** থাকে।

অর্থাৎ উদ্যোগের মধ্যে নতুনত্ব যেমন থাকে তেমনি উদ্যোক্তার মধ্যেও উদ্ভাবনী ক্ষমতা থাকতে হবে। সেকারণে 'উদ্যোগ' মানুষের চারিত্রিক গুণাবলি হিসাবেও গণ্য হয়। প্রচলিত প্রবচন হিসাবে প্রায়শই শোনা যায় যে, 'উদ্যোগী মানুষেরাই সাফল্য লাভ করে।' অর্থাৎ যাদের মধ্যে সাহস, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তা থাকে তারাই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। অতীতের চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙ্গা নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যবসা করতে যাওয়ার কাহিনি বা সিন্দবাদের কাহিনি বা কলম্বাসের নৌ-অভিযান এগুলিও উদ্যোগ হিসাবে চিহ্নিত হয়। কারণ ওইসব কর্মপ্রচেষ্টা ছিল ঝুঁকিবহুল, ব্যতিক্রমী ও এতে উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়। যদিও উদ্যোগ শব্দটি সামাজিক ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারবারি ক্ষেত্রে উদ্যোগ বলতে বোঝায় এক নতুন ধরনের কারবার বা কারবারি প্রক্রিয়া যা আগে পরীক্ষিত হয়নি এবং যা নতুন এক ব্যবসায়িক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণস্বরূপ কোনো একটি বাজারে কাপড়ের অনেকগুলি দোকান থাকলেও কারবারি পরিভাষায় তাদেরকে উদ্যোগ বলা হয় না। আবার কেউ যদি একটি অনুরূপ কাপড়ের নতুন দোকান খোলেন তাহলেও তাকে উদ্যোগ বলা যায় না, কিন্তু যদি একটি বুটিকের দোকান ওখানে খোলা হয় তাহলে এই দোকানটিকে **উদ্যোগ** বলে গণ্য করা হয়। কারণ এটি হল সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের দোকান যা ওই বাজারে দেখা যায় না, আনুপাতিকভাবে **ঝুঁকিবহুল, সৃজনশীলতা** ও **উদ্ভাবনের** উপর নির্ভরশীল।

উদ্যোগের মাধ্যমে কারবারের বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটে। এছাড়াও কোনো অঞ্চল বা সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোনো আকর্ষণীয় সুযোগকে সদ্ব্যবহার করে যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেন তখনই উদ্যোগের সূচনা হয়। উদ্যোগজনিত সুযোগ বলতে সেই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বোঝায় যাতে নতুন পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হয় বা প্রক্রিয়া বা সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় বা নতুন কোনো বাজারে উৎপাদন মূল্যের থেকে বেশি মূল্যে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং কোনো নতুন পণ্য বা সেবা বা নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বা নতুন বাজার উদ্ভাবনও উদ্যোগ হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং উদ্যোগের মূল বিষয়টি হল প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে নতুন কোনো উদ্ভাবন যা নতুন পণ্য বা সেবা হতে পারে, নতুন কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে পারে বা নতুন বাজারে পণ্য বা সেবার উপস্থাপন হতে পারে। অর্থাৎ উদ্যোগের মধ্যে **নতুনত্ব** (newness) থাকতেই হবে। এই নতুনত্ব আবার সৃজনশীলতা ও সুযোগের উপর অনেকটাই নির্ভর করে। পরিবেশ-পরিস্থিতি সদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতা যেমন অনেক পুরানো ধ্যান-ধারণা, পদ্ধতি-প্রকরণ, পণ্য বা সেবার ধ্বংস করে তেমনি সাথে সাথে নতুন নতুন সুযোগের সৃষ্টি করে। সেকারণেই অনেকে উদ্যোগকে **'ধ্বংসাত্মক সৃজনশীলতা'** বলে অভিহিত করেন। তবে পরিবর্তনশীল জগতে এই নতুন নতুন সুযোগ সকলের চোখে পড়ে না। যারা এর সন্ধান পায় তাদেরই উদ্যোক্তা বলা হয়। উদ্যোক্তারাই সুযোগ-সন্ধানী ও তারা নতুন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উদ্যোগ গড়ে তোলে ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে উন্নত করে। এর ফলেই সুযোগের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়, শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ ও সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

পরিশেষে উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনায় সংক্ষেপে বলা যায় যে উদ্যোগ হল কোনো নতুন সুযোগের সম্ভাবনার বাস্তবায়ন যা এক বা একাধিক ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এবং যার ফলে

নতুন কোনো পণ্য বা সেবার উদ্ভাবন ঘটে বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন কোনো পদ্ধতির প্রবর্তন হয় যার ফলে উৎপাদন মূল্য হ্রাস পায় বা নতুন কোনো ব্যবসায় সংগঠনের মাধ্যমে বা প্রচলিত ব্যবসায় সংগঠনের মাধ্যমে নতুন কোনো বাজারে পণ্য বা সেবার উপস্থাপনা করা হয়। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় যেমন ঝুঁকি থাকে তেমনি সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতাও থাকে।

2.9 সারাংশ

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যে সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে তার মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ অন্যতম। যে ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাঁকে উদ্যোক্তা বলে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান তৈরি করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া থেকে শুরু করে, তার পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনশীল করে তোলার ক্ষেত্রে চালকের ভূমিকা পালন করেন। তাই উদ্যোগ গ্রহণকে কোনো কিছু সৃষ্টি ও গড়ে তোলার ক্ষমতা বলে।

উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, উদ্যোগ গ্রহণ হল একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে থাকে সৃজনশীলতা ও জ্ঞানের কিছু উদ্ভাবনের বীজ। উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কাজ সম্পাদন সম্ভব হয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। তবে এর মধ্যে ঝুঁকিও আছে।

উদ্যোক্তা ছাড়া উদ্যোগ গ্রহণের কোনো অর্থ হয় না। উদ্যোক্তা হবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি যেমন ফল লাভের উদ্দেশ্যে সম্পদ সংগ্রহ ও তার ব্যবহার করবেন, তেমনি সামাজিক দায়িত্বও পালন করবেন। তিনি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন যেমন, অর্থনৈতিক উন্নয়নকারীর ভূমিকা, নিয়োগকর্তা হিসাবে ভূমিকা, বাজার সৃষ্টিকারীর ভূমিকা ইত্যাদি। তাঁর পক্ষে এইসব ভূমিকা তখনই পালন করা সম্ভব যদি তাঁর মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলির সমাবেশ ঘটে যেমন, আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা, ঝুঁকিবহন করার ক্ষমতা, নেতৃত্বের গুণাবলি ইত্যাদি।

2.10 প্রশ্নাবলি

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. একটি উদ্যোগের মধ্যে নীচের কোন্ উপাদানটি উপস্থিত থাকে?
   (ক) সৃজনশীলতা (খ) উদ্ভাবন
   (গ) (ক) ও (খ) উভয়ই (ঘ) কোনোটিই নয়
2. কারবারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে নীচের কোন্ মন্তব্যটি অধিক উপযুক্ত?
   (ক) উদ্যোগ হল মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা (খ) এটি হল গতানুগতিক কারবারি প্রচেষ্টা
   (গ) উদ্যোগ হল ঝুঁকিবহুল কারবারি প্রচেষ্টা যার মধ্যে বন্ধুত্ব থাকে (ঘ) কোনোটিই নয়

3. 'ক্রমবর্ধমান সম্পদ সৃষ্টির সচল প্রক্রিয়াই হল উদ্যোগ'—মন্তব্যটি কে করেছিলেন?
   (ক) রবার্ট রনস্টাড (খ) জে. সি. বার্না
   (গ) পি. এফ. ড্রাকার (ঘ) জোসেফ শুম্‌পিটার
4. 1983 সালে 'এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অব্ ইন্ডিয়া' কোথায় স্থাপিত হয়?
   (ক) নয়ডাতে (খ) আমেদাবাদ
   (গ) মুম্বাইতে (ঘ) হায়দ্রাবাদ
5. উদ্যোগের উপাদান হিসাবে নীচের কোন্‌টি গণ্য হয় না?
   (ক) মুনাফা (খ) সম্পদ
   (গ) পরিকল্পনা ও সংগঠন (ঘ) কৌশল ও দূরদৃষ্টি

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. উদ্যোগ গ্রহণের সংজ্ঞা দিন।
2. উদ্যোগ গ্রহণের যে কোনো দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
3. উদ্যোক্তা কাকে বলে?
4. উদ্যোগ গ্রহণের যে কোনো দুটি প্রকৃতি উল্লেখ করুন।

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. উদ্যোগ গ্রহণের সংজ্ঞা দিন। উদ্যোগ গ্রহণের প্রকৃতি আলোচনা করুন।
2. উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
3. উদ্যোক্তার ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা উল্লেখ করুন।
4. উদ্যোগের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করুন।
5. 'উদ্যোগ কর্মজীবন হিসেবে' টীকা লিখুন।

একক-3 ❑ উদ্যোক্তার গুণাবলী (Traits of Entrepreneur)

গঠন

3.0 উদ্দেশ্য

3.1 প্রস্তাবনা

3.2 উদ্যোক্তার গুণাবলী

3.3 উদ্যোগজনিত আচরণ ও সৃজনশীলতা

3.4 উদ্যোগে সৃজনশীল ও উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা

3.5 উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

3.5.1 প্রশিক্ষণের সুবিধা

3.5.2 প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

3.6 সারাংশ

3.7 প্রশ্নাবলী

3.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন—

- উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী
- উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- উদ্যোগজনিত আচরণ ও সৃজনশীলতা

3.1 প্রস্তাবনা

উদ্যোক্তা হলেন এমন এক ব্যক্তি যাকে তাঁর সংগঠনের স্বার্থে বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করতে হয় এবং যিনি সংগঠনের লাভ-লোকসানের জন্য দায়ী থাকেন। উদ্যোক্তা হলেন একজন উদ্ভাবনকারী প্রবর্তক। সৃজনমূলক চিন্তাশক্তি ও গঠনমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনজীবনের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা, প্রতিকূল পরিবেশে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং সকল নেতৃত্বদানের মাধ্যমে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হিসাবে স্বীকৃত। কাজেই

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP Book/ NEC-MG-03 (Entrepreneurship Development)
Unit- 1-8 \ 1st Proof \ (Dt. 12.03.2025)

উদ্যোক্তার কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী থাকা আবশ্যক। এই একক থেকে উদ্যোক্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

3.2 উদ্যোক্তার গুণাবলী

John A. Hornaday-র মতে একজন উদ্যোক্তার যে সকল গুণাবলী থাকা উচিত, সেগুলি হল— (i) আত্মবিশ্বাসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী, (ii) পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণে সক্ষমতা, (iii) চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সক্ষমতা, (iv) পরিবর্তনশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতা, (v) বাজার সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, (vi) অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা, (vii) স্বাধীনচেতা উন্মুক্ত মনের অধিকারী, (viii) বিভিন্ন বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান, (ix) উৎসাহী এবং কঠোর পরিশ্রমী, (x) গতিশীল নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, (xi) উদ্যমী ব্যক্তিত্ব, (xii) সৃজনশীলতা, (xiii) সুপরামর্শদাতা, (xiv) দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, (xv) সম্পদশীল ও সংরক্ষণশীল, (xvi) প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা ও সমালোচনার সদুত্তর দেবার সাহস ও ক্ষমতা।

Mark Cason একজন উদ্যোক্তার নিম্নলিখিত গুণাবলী চিহ্নিত করেছেন—

(i) বিচারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, (ii) দক্ষতার সঠিক প্রয়োগ ক্ষমতা, (iii) ব্যবস্থাপনার সকল স্তরের ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা।

Holt উদ্যোক্তার জ্ঞান বা ধারণাকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে কোনো উদ্যোগ কার্যকরভাবে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করতে গেলে উদ্যোক্তার সদিচ্ছা, ব্যক্তিগত ধারণা বা যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথপ্রদর্শক হিসাবে একজন উদ্যোক্তার যে সকল গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন তাহল—

(ক) আত্মবিশ্বাস : আত্মবিশ্বাস উদ্যোক্তার অন্যতম গুণ। যিনি ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উদ্যোগ নেন, তার আত্মবিশ্বাস থাকা আবশ্যকীয় উপাদান। তিনি মানসিক দিক থেকে সজাগ থাকবেন। আবেগে ধৈর্য্য রাখবেন, যথেষ্ট আত্মসচেতন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি হবেন।

(খ) সৃজনশীলতা : সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা উদ্যোক্তার অন্যতম গুণ। বিশ্বায়নের যুগে নিত্য নতুন দ্রব্য উৎপাদন বা পুরানো দ্রব্যের উত্তোরণ না ঘটাতে পারলে টিকে থাকা মুশকিল। সুতরাং, সৃজনশীলতা উদ্যোক্তার অন্যতম গুণ হিসাবে স্বীকৃত। চিন্তা-ভাবনা ও কার্যকলাপে তাঁকে সর্বদাই সৃষ্টিশীল হতে হবে।

(গ) অধ্যবসায় : অধ্যবসায় উদ্যোক্তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ। অধ্যবসায় না থাকলে উদ্যোক্তার পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা মুশকিল।

(ঘ) নেতৃত্বের গুণাবলি : উদ্যোক্তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি থাকা প্রয়োজন কারণ তিনিই প্রধান কান্ডারি, যাকে দেখে সমস্ত কর্মী উজ্জীবিত হবেন। তাই উদ্যোক্তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি থাকা অবশ্যই উচিত।

(ঙ) **ঝুঁকিবহন করার ক্ষমতা :** উদ্যোক্তাকে ঝুঁকিবহন করতে হয়। কারবারে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি থাকে যেমন, আর্থিক ঝুঁকি, ব্যবসায়িক ঝুঁকি ইত্যাদি। উদ্যোক্তা যদি ঝুঁকি গ্রহণে অসমর্থ হন তাঁর পক্ষে কারবার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই উদ্যোক্তাকে ঝুঁকিবহন করার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়।

(চ) **সমালোচনার স্বীকৃতি দান :** উদ্যোক্তাকে সব সময় **গঠনমূলক সমালোচনার** সম্মুখীন হতে হয় এবং উদ্যোক্তার এই সমালোচনা স্বীকার করার মতো মানসিকতা থাকা আবশ্যিক।

(ছ) **অনুসন্ধানের ক্ষমতা :** উদ্যোক্তাকে সব সময় অনুসন্ধিৎসু হতে হয়। নিত্য নতুন পণ্য বা সেবা সরবরাহের উপর উদ্যোক্তার অস্তিত্ব নির্ভর করে। উদ্যোক্তার যদি অনুসন্ধান করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে এই বাজারে কারবার পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব।

(জ) **সামগ্রিক জ্ঞান :** উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তাঁর উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি-সংক্রান্ত যথেষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আইন, অর্থনীতি, বিপণন, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া হিসাবরক্ষণ, আয়কর, পণ্য ক্রয়, উৎপাদন, বিপণন, কর্মী সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়—

(ঝ) **প্রবল ব্যক্তিত্ব :** ব্যক্তিত্ব হল অত্যাবশ্যক এক মানবিক গুণ। বিভিন্ন গুণের সমন্বয়ে ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। উদোক্তাকে জীবনে সফল হতে হলে প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হতে হবে। মানুষকে কৌশলে পরিচালনা করার ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি, আবেগের স্থিরতা, ধৈর্য্য, দৃঢ় মনোভাব, সততা, ঐকন্তিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন গুণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিস্ফূট হয়। সাফল্য অর্জনের মনোভাব নিয়ে তাঁকে কাজ করতে হবে। মানসিক দৃঢ়তা এবং প্রয়োজনের সময় নমনীয় মনোভাব থাকা দরকার। এতে সকলের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করা যাবে।

(ঞ) **ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতা :** একজন উদ্যোক্তার যথেষ্ট পরিমানে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতা থাকা আবশ্যক। এখানে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত দক্ষতার মধ্যে বিভিন্ন গুণ বা যোগ্যতা পরিস্ফূট হয়। যেমন বুদ্ধিমত্তা, ইচ্ছা ও সমর্থ, সংগঠনিক ক্ষমতা, নির্ভরযোগ্যতা, সপ্রতিভতা সততা, সামাজিকতা ইত্যাদি। ব্যবস্থাপক হিসেবে একজন উদ্যোক্তার এই সব গুণের সমাবেশ থাকা উচিত। এই সব গুণের ফলেই উদ্যোক্তাকে অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। R. L. Katz ব্যবস্থাপকদের তিন ধরনের গুণের অধিকারী হওয়া উচিত বলে মনে করেন। তা হল—কারিগরি দক্ষতা, মানসিক দক্ষতা এবং ধারণাগত দক্ষতা। Koontz এবং O'Donnell ঐ তিনটি দক্ষতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা যুক্ত করেছেন।

উপরিউক্ত গুণাবলি ছাড়াও উদ্যোক্তার আরও যেসব গুণাবলি দরকার সেগুলি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনচেতা, মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ও সুন্দর ব্যবহার, নমনীয়তা, মূল্যায়নের ক্ষমতা, শান্ত মেজাজ, অনুপ্রাণিতকরণের ক্ষমতা ইত্যাদি।

3.3 উদ্যোগজনিত আচরণ ও সৃজনশীলতা

ডেভিড মেক্লিল্যান্ড (Devid C. Maclelland) তাঁর আচরণমূলক তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মানুষের চাহিদা পূরণের আকাঙ্ক্ষা উদ্যোগ গড়ে তুলতে প্রেরণা দেয়। তবে কেবলমাত্র এই আকাঙ্ক্ষা পূরণই উদ্যোক্তার প্রেরণা বা উদ্যোগীয় আচরণকে প্রভাবিত করে না। অন্যান্য মানবিক ইচ্ছা বা প্রেরণা যেমন সৃজনশীলতা (creativity), কার্যক্ষমতা (efficacy), ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা (risk taking), নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র (locus of control), নেতৃত্বদান (leadership) এবং জ্ঞাতকরণ (communication) ইত্যাদিও ব্যক্তির উদ্যোগজনিত আচরণকে প্রভাবিত করে। তবে এদের মধ্যে সৃজনশীলতা তথা সৃষ্টিশীল আচরণ উদ্যোগ গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রেরণামূলক গুণাবলির মধ্যে সৃজনশীলতা সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল।

সৃজনশীলতা (Creativity)

সৃজনশীলতা বলতে বোঝায় নতুন কিছু সৃষ্টি করার কাজ। এটি হল এমন এক ক্ষমতা যা নতুন ধারণার জন্ম দেয় এবং সুযোগ ও সমস্যাকে নতুনভাবে দেখার পথ আবিষ্কার করে। **জোসেফ শুম্‌পিটার** (Joseph A. Schumpeter) একে 'উদ্ভাবন' (Innovation) নামে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়ন উদ্ভাবনের উপর নির্ভরশীল এবং উদ্ভাবন হল কোনো নতুন পণ্য বা সেবা বা কাঁচামালের নতুন উৎস বা উৎপাদন পদ্ধতি বা বাজার সংক্রান্ত হতে পারে। সৃজনশীলতা পণ্য বা সেবা বা উৎপাদন পদ্ধতির গুণমান বাড়িয়ে দেয় এবং এর লক্ষ্য হল মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন। সৃজনশীলতার উদ্ভব ঘটে কল্পনা বা কাল্পনিক ধারণা থেকে। এই কল্পনাই সৃজনশীলতায় রূপান্তরিত হয় যখন কল্পনাপ্রসূত নতুন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। তাই উদ্যোক্তারা মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কল্পনা করে যাতে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায়। তবে তারা কল্পনাবিলাসী নয়, কারণ তাদের কল্পনার সীমা বাস্তবের চৌহদ্দির মধ্যে সীমিত রাখতে হয়। সৃজনশীলতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হল জেফ বেজোস (Jeff Bezos's)-এর কল্পনাপ্রসূত world wide web (www) যা ব্যবহার করে অ্যামাজন (Amazon.com) তার বিশ্বব্যাপী খুচরা ব্যবসায় চালায়।

তবে অনেক সময় সৃজনশীলতা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সমার্থক শব্দ হিসাবে গণ্য হয় যদিও তারা সম্পূর্ণভাবে আলাদা অর্থ বহন করে। সৃজনশীলতা হল কোনো ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারার মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা। অন্যদিকে আবিষ্কার হল কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টার ফল বা নতুন কিছু সৃষ্টি করে যার অস্তিত্ব আগে ছিল না। আর উদ্ভাবন হল নতুন কিছু করার প্রক্রিয়া। একারণেই **থিওডর লেভিট** (Theodore Levitt) বলেছেন যে সৃজনশীলতা হল 'নতুন কিছু করার জন্য চিন্তা' ও উদ্ভাবন হল 'নতুন কিছু করা'। উদ্যোগের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন উভয়ই অপরিহার্য। তবে সৃজনশীলতা ছাড়া নতুন কিছু উদ্ভাবন করা যায় না। অর্থাৎ উদ্যোগে উদ্ভাবন সৃজনশীলতাকে অনুসরণ করে। একারণে সৃজনশীলতাকে উদ্যোগের বীজ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং উদ্ভাবনকে উদ্যোগ প্রক্রিয়া বলা হয়।

সৃজনশীল প্রক্রিয়া (The Creative process)

প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত জ্ঞানের নিরিখে মনে করা হত যে একজন ব্যক্তি সৃজনশীল অথবা সৃষ্টিশীল নয়। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, যেকোনো ব্যক্তি পদ্ধতি ও ব্যবহারের মাধ্যমে সৃজনশীলতা শিখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নিউটন (Newton) গাছ থেকে আপেল পড়া দেখে 'অভিকর্ষ সূত্র' সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন প্রবক্তা সৃজনশীল প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের উল্লেখ করলেও অধিকাংশই মনে করেন যে সৃজনশীল প্রক্রিয়া 5টি স্তরের মাধ্যমে সম্পূর্ণতা পায়। এগুলি নীচের রেখাচিত্রে দেখানো হল—

স্তর-1	স্তর-2	স্তর-3	স্তর-4	চূড়ান্ত স্তর
ধারণার অঙ্কুরোদ্গম →	প্রস্তুতির স্তর →	উন্মেষ স্তর →	উদ্ভাবন স্তর →	যাচাইকরণ

নীচে সৃজনশীল প্রক্রিয়ার পাঁচটি স্তর সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল।

1. **ধারণার অঙ্কুরোদ্গম (Idea generation) :** এই স্তরটি হল উদ্যোগ-এর প্রারম্ভিক স্তর এবং এই স্তরে উদ্যোগের বীজ বপন করা হয়। তবে এটি গাছের বীজ পোঁতার মতো সরল বিষয় নয়। এই স্তরে উদ্যোক্তা তার কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারার মাধ্যমে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে তবেই সেটি উদ্যোগের বীজ হিসাবে গণ্য হয়। বস্তুত সৃজনশীল ধারণা কীভাবে বা কোথা থেকে পাওয়া যায়, তার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। মানুষের জিগীষা, কৌতূহল, অন্তর্দৃষ্টি, কোনো সমস্যার নিগূঢ় পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি থেকে সৃজনশীল ধারণার জন্ম হয়।

2. **প্রস্তুতি পর্ব (Preparation stage) :** এটি হল সৃজনশীল প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তর। কৌতূহলের বীজ বপন করা হলে একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তি সেটি নিয়ে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করেন যাতে ধারণার উন্নয়ন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বিপণনকারী বাজারে তার নতুন পণ্যটি উপস্থাপন করতে চাইলে তাকে বাজার সমীক্ষা ও বাজার গবেষণা চালাতে হয় যাতে ওই বাজারে অনুরূপ পণ্যের চাহিদার মাত্রা ও গভীরতা জানা সম্ভব হয়।

3. **উন্মেষ পর্ব (Incubation stage) :** অঙ্কুরিত ধারণা এই পর্বে চূড়ান্ত রূপ পায়। যদিও উদোক্তারা একটি মাত্র ধারণার উপর মনোনিবেশ করে থাকেন তবুও বিকল্প ধারণার বিষয়গুলিও তাদের গোচরে রাখতে হয়। তবে এই পর্বে তারা ধারণাকে নিজে থেকেই বাড়তে দেয় এবং এর পিছনে যে বিশ্বাস কাজ করে তা হল কিছু সৃষ্টিশীল ধারণা ও উদ্ভাবন মনের মধ্যে উপস্থিত হয়, যখন প্রকৃতপক্ষে ওই বিষয়ে কোনো চিন্তা করা না হয়। অন্যভাবে বলা যায় অবচেতন মনের চিন্তা থেকে এরূপ ধারণা ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত ভালো ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও উন্মেষ পর্বের সময়কাল ব্যক্তি ভেদে বিভিন্ন হয়।

4. **উদ্ভাবন স্তর (Illumination stage) :** এই স্তরটি হল সৃজনশীলতার চূড়ান্ত স্তরের আগের স্তর। প্রস্তুতি ও উন্মেষ স্তর সঠিকভাবে পালিত হলে ধারণা এই স্তরে প্রবেশ করে। এই স্তরেই

ব্যক্তি তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়। অর্থাৎ নতুন কিছু সৃষ্টি করার সন্ধান পায়। আর্কিমিডিস যেমন চৌবাচ্চার জল অপসারণ দেখে 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলেছিলেন এবং দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন, তেমনি এই স্তরে সাধারণত ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত চিন্তা নির্দিষ্ট গন্তব্য খুঁজে পায়। এই স্তরেই দিবাস্বপ্ন দেখা ব্যক্তি ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য পরিস্কার হয়ে যায়।

5. যাচাইকরণ (Verification) : এটিই সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ার সর্বশেষ বা চূড়ান্ত স্তর। এই স্তরেই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটে। একটি উদ্ভাসিত ধারণার কোনো অর্থ হয় না যদি তা ব্যবহারযোগ্য না হয়। অর্থাৎ উদ্ভাসিত ধারণা ব্যবহারযোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করাই হল যাচাইকরণ। অন্যভাবে বলা যায় নতুন ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নির্ধারণ করাই হল যাচাইকরণ। আবার অনেকে এই স্তরকে সংকটজনক স্তর আখ্যা দেন এবং তাঁরা বলেন যে ধারণার উপযোগিতা পরিমাপ করে তার বাণিজ্যিক সাফল্যের সম্ভাবনা নির্ধারণই হল এই স্তরের প্রধান কাজ।

3.4 উদ্যোগে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা

সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র একটি উদ্যোগের সাফল্যের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, সাথে সাথে উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সৃজনশীলতা হল চিন্তা বা ভাবনার ফসল যার পরিসমাপ্তি ঘটে নতুন কোনো পণ্য, সেবা, প্রক্রিয়া বা অন্য কিছু উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে। সৃজনশীলতা হল এমন এক গুণ যা সবার মধ্যে থাকে না। সৃজনশীলতা হল এক ধরনের প্রতিভা যা সব সময় নতুন কোনো ধারণা সৃষ্টি করে। উদ্যোগে সৃজনশীলতা হল এক ধরনের প্রতিভা যা সব সময় নতুন কোনো ধারণা সৃষ্টি করে। উদ্যোগে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের প্রয়োজন অপরিসীম এবং এদের বাদ দিয়ে উদ্যোগে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। নীচে উদ্যোগ ক্ষেত্রে যেসব কারণে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয় সেগুলি তুলে ধরা হল।

1. **সুযোগ সনাক্তকরণ** (Indentifying opportunities) : সৃজনশীলতা হল আলাদা চিন্তা করার ক্ষমতা, নতুন ধারণা সৃষ্টির ক্ষমতা। উদ্যোক্তাও একজন সৃজনশীল মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি যে নতুন সুযোগ সনাক্ত করতে পারে, বাজারের সুযোগ উদ্‌ঘাটন করতে পারে এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার দ্বারা ক্রেতাদের সমস্যা সমাধানের ববস্থা করে। এই ক্ষমতা উদ্যোক্তাকে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পেতে সাহায্য করে।

2. **কারবারি সুনাম বৃদ্ধি করে** (Boosts business reputation) : বর্তমানে বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার পরিবেশ দেখা যায়। কারবারি যদি একই ধরনের পণ্য বা সেবা বছরের পর বছর বিক্রয় করতে থাকে তাহলে একঘেয়েমির সৃষ্টি হয় এবং পণ্য বা সেবার বিক্রয় আশানুরূপ হয় না। এজন্য প্রয়োজন হয় পণ্য বা সেবার মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করা যাতে ক্রেতারা আকর্ষিত হয়। আর সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন ছাড়া পণ্য বা সেবার মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করা সম্ভব হয়

না। পণ্য বা সেবার উন্নতির ফলে উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব ও সুনাম উভয়ই বৃদ্ধি পায় এবং এর পেছনে মূল অবদান হল সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের।

3. **সমস্যা সমাধানকারী** (Problem solving) : একটি উদ্যোগ সমস্যার মধ্যে সুযোগকে চিহ্নিত করে ও সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করে। উদ্ভাবন সমস্যা সমাধানের পরির্বত উপায় বের করে বাধাগুলি দূর করার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ উদ্যোক্তা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয় তা সৃজনশীল চিন্তার মাধ্যমে দূর করে।

4. **উদ্ভাবন ও পার্থক্যকরণ** (Innovation and differentiation) : উদ্ভাবন হল সৃজনশীলতার বাস্তব প্রয়োগ যার দ্বারা নতুন পণ্য, সেবা, প্রক্রিয়া বা নতুন ধরনের কারবার গড়ে ওঠে। উদ্যোক্তার মধ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা থাকলে সে প্রতিযোগীদের থেকে পৃথক জায়গা করে নিতে পারে এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করতে পারে। সে কারণে সদা পরিবর্তনশীল বাজারে এ ধরনের উদ্যোক্তা এগিয়ে থাকে।

5. **পরিবর্তনকে স্বীকার করে** (Adapting to change) : বর্তমান গতিশীল কারবারি পরিবেশে প্রতিনিয়ত যেসব পরিবর্তন ঘটে তার সাথে উদ্যোক্তাকে মানিয়ে নিতে হয়। উদ্যোক্তার সাফল্য পরিবর্তনের সাথে উদ্যোক্তা কতটা খাপ খাওয়াতে পারে তার উপর নির্ভর করে। একজন সৃষ্টিশীল উদ্যোক্তা এসব পরিবর্তনকে সবসময়ই স্বীকার করে নেয় কারণ তাদের চিন্তাধারা নমনীয় এবং নতুন ধারণার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ইচ্ছুক। উদ্ভাবনি তাকে পরিবর্তনকে মোকাবিলা করার শক্তি জোগায় যাতে পরিবর্তনের ফলে যে সুযোগের সৃষ্টি হয় তা কাজে লাগাতে পারে।

6. **প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা** (Competitive advantage) : সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন উদ্যোক্তাকে বাজারে দীর্ঘকালীন প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনের সাহায্য করে। ধারবাহিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন নতুন পণ্য বা সেবা বাজারে প্রবর্তন করে উদ্যোক্তা অন্যদের থেকে আলাদা হিসাবে গণ্য হয়। এর ফলে ক্রেতাদের আকর্ষণ করা ও ব্রান্ড আনুগত্য গড়ে তোলা অনেক সহজ হয়। আর এই প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার ফলে উদ্যোক্তার পক্ষে প্রতিযোগীদের মোকাবিলা করা সহজ হয়।

7. **উন্নয়ন ও বিস্তার** (Growth and expansion) : কারবারের উন্নয়ন ও বিস্তারের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি থাকে তারা কারবারের মধ্যে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এর ফলে উদ্যোগ আরো বৃহত্তর পরিধিতে, নতুন বাজারে কাজ করতে সমর্থ হয়। এর ফলে কারবারের উন্নয়ন ও বিস্তার ঘটে।

8. **ক্রেতা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি** (Customer-centric approach) : সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন উদ্যোক্তাকে আরো ভালোভাবে ক্রেতাদের প্রয়োজন ও পছন্দ বুঝতে সাহায্য করে। এর ফলে ক্রেতাদের যেসব প্রয়োজন পূরণ হয় না সেগুলি জানা যায় এবং ক্রেতাদের প্রয়োজন উপযোগী

পণ্য বা সেবার উৎপাদন ও সরবরাহ করা সম্ভব হয়। আধুনিক বিপণনের দর্শন অর্থাৎ ক্রেতা কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উদ্যোক্তা গ্রহণ করায় উদ্যোগের সাফল্য অর্জন সহজ হয়।

9. **উদ্যোগের অস্তিত্বের ক্ষার উৎস** (Securees of Burinen survival) : বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে উদ্যোক্তাকে সৃজনশীল ও উদ্ভাবকের ভূমিকা পালন করতে হয়। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উদ্যোগকে বাহ্যিক পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে হয় এবং পণ্য বা সেবার মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে আধুনিক ও যুগোপযোগী হতে হয়। সুতরাং উদ্যোগের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়।

পরিশেষে উপরের আলোচনা থেকে যে সারবস্তু পাওয়া যায় তা হল যে—সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন হল উদ্যোগে নতুন ধারণা উদ্ভবের জ্বালানী হিসাবে, সমস্যা সমাধানকারী, পৃথকীকরণ, মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা, উন্নয়ন ও ক্রেতা সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে সেই উদ্যোগি সফল হয় যার মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের যুগলবন্দী দেখতে পাওয়া যায়।

3.5 উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা নির্ভর করে উদ্যোক্তার প্রশিক্ষণের ওপর। তাই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ দক্ষতা সৃজনের মধ্যে প্রশিক্ষণের কাজ অন্তর্ভুক্ত। আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের প্রকৃতি ও নির্দেশের মধ্যে উন্নয়নের অর্থ নিহিত আছে। প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন—এই যুগ্ম শব্দটি ব্যাপক ব্যবহৃত, যদিও তারা প্রায় সমার্থক।

প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল উদ্যোক্তার এবং ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা অভিজ্ঞতা থেকে নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল ব্যবস্থাপক এবং উদ্যোক্তার দক্ষতা বৃদ্ধির সাহায্যে অধস্তন কর্মীদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে তাদের সহায়তা করতে পারে। McGregor প্রশিক্ষণের বিশেষ তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। যেমন—(১) বুদ্ধি-সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা, (২) দৈহিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করা, এবং (৩) সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করা। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে তিন ধরনের প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত কার্যকলাপ দেখা যায়। যথা—(১) পদধিষ্টানের জন্য প্রশিক্ষণ, (২) আরও ভালো কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ, এবং (৩) উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ।

3.5.1 প্রশিক্ষণের সুবিধা

প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে হলে প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি সুবিধা ভোগ করতে পারে। যেমন—(১) যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার সম্পর্কে উন্নত শিক্ষালাভ ঘটে, (২) উৎপাদিত পণ্যের পরিমান ও গুণগত মান উন্নত হয়, (৩) কর্মীদের কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, (৪) উৎপাদনের পরিমান বেড়ে যাওয়ায় কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধি পায়, (৫) সমস্ত ধরনের অপচয় বন্ধ হয়, (৬) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, (৭) কর্মীদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধি পায়, (৮) কর্মীদের কাজে সন্তুষ্টি দেখা যায়, (৯) প্রতিষ্ঠানের প্রতি

আনুগত্য বৃদ্ধি পায়, (১০) অনুপস্থিতি ও কর্ম ত্যাগের হার কমে যায়, (১১) কর্মীদের পদোন্নতির পথ প্রস্তুত হয়, এবং (১২) ব্যবস্থাপকদের পক্ষে তদারকি ও নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা কমে।

3.5.2 প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

কাজের প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাদানের পদ্ধতি আলাদা হয়, তবে সাধারণত যে পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয় তাহল নিম্নরূপ—

(ক) **পরিচয়সূচক প্রশিক্ষণ :** এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিবেশের সঙ্গে উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের পরিচয় ঘটিয়ে তাদের কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি করা হয়। পরিচয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য, উৎপাদন প্রণালী, বিভিন্ন নীতি ও নিয়মকানুন সম্পর্কে সকলকে শিক্ষিত করে তোলা হয়।

(খ) **শিক্ষানবীশ হিসাবে প্রশিক্ষণ :** এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হবার পর কর্মীদের কিছু সময়ের জন্য শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করতে হয়। তত্ত্বগত শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে এই প্রশিক্ষণ গড়ে তোলা হয়। এই ধরনের প্রশিক্ষণ সাধারণত কারিগর ও কুশলী কর্মীদের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) **নির্দিষ্ট কাজে প্রশিক্ষণ :** যে কোনো ধরনের কর্মীর জন্য সে যে কাজে নিযুক্ত হয়েছে সেই নির্দিষ্ট কাজে প্রশিক্ষণ বিশেষ প্রয়োজন। কর্মরত অবস্থায় তারা এই প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন, কাজের কলাকৌশল এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষক শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

(ঘ) **উপপ্রকোষ্টে প্রশিক্ষণ :** এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি সহযোগে পৃথক একটি বাস্তবধর্মী শিক্ষাকেন্দ্র থাকে। একজন কর্ম প্রশিক্ষকের উপর এই শিক্ষা কেন্দ্রের ভার থাকে। পৃথক একটি প্রকোষ্টে প্রশিক্ষণ কার্য চলে বলে এতে অন্যের কোনো কাজে ব্যাঘাত ঘটে না। সময়ের অপচয়ও রোধ করা যায়।

(ঙ) **কর্মগত প্রশিক্ষণ :** এই পদ্ধতিতে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের কর্ম-সংক্রান্ত বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব শিক্ষার মধ্যে যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম ও কাঁচামালের ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া ও দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(চ) **বাহ্যিক প্রশিক্ষণ :** দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক কারিগরি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। প্রযুক্তিগত এবং পেশাগত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়েছে। বাহ্যিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি থেকে কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণদানের পর তাদের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়।

(ছ) **পদোন্নতির প্রশিক্ষণ :** কর্মীদের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য এবং তাদের মনোবল অটুট রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের মধ্য থেকে পদোন্নতির নীতি গৃহীত হয়। বেতন, পদমর্যাদা কাজের দায়িত্ব বৃদ্ধিকে সাধারণত পদোন্নতি বলে। পদোন্নতির পরে আরও উচ্চপদের দায়িত্ব

সম্পর্কে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন দেখা দেয়। এতে তাদের দায়িত্ব ও অধিকার বৃদ্ধি পায়।

3.6 সারাংশ

এই এককটি পড়ে যে সমস্ত বিষয় জানতে পারলেন সেগুলি হল—

- উদ্যোক্তার গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য
- উদ্যোগজনিত আচরণ এবং সৃজনশীলতা
- উদ্যোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

3.7 প্রশ্নাবলি

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. Mark Cason এর মতে উদ্যোক্তার গুণাবলি হল

   (ক) বিচারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা

   (খ) দক্ষতার সঠিক প্রয়োগ ক্ষমতা

   (গ) ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা

   (গ) উপরের সবকটি

2. জেফ বেজোস (Jeff Bezos's)-এর কল্পনাপ্রসূত আবিষ্কার হল—

   (ক) World Wide Web (www) (খ) Global Wide Web (gww)

   (গ) International Wide Web (iww) (ঘ) উপরের কোনটি নয়

3. McGregor-এর মতে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল—

   (ক) বুদ্ধি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা (খ) দৈহিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করা

   (গ) সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করা (ঘ) উপরের সবকটি

4. সৃজনশীলতা হল 'নতুন কিছু করার চিন্তা' ও উদ্ভাবন হল 'নতুন কিছু করা'—কে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন সম্পর্কে এই উক্তিটি করেছিলেন?

   (ক) থিয়োডর লেভিট (খ) জোসেফ শ্যুমপিটার

   (গ) পি. এফ. ড্রাকার (ঘ) ম্যাক্লিল্যান্ড

5. সৃজনশীল প্রক্রিয়া কয়টি স্তরের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ যায়?

(ক) ৪টি স্তর (খ) ৫টি স্তর

(গ) ৬টি স্তর (ঘ) ৭টি স্তর

উত্তর: 1. (ঘ) 2. (ক) 3. (ঘ) 4. (ক) 5. (খ)

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. John A. Hornaday উদ্যোক্তার যে গুণাবলি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে যে কোনো দুটির নাম লিখুন।
2. Mark Cason-এর মতে উদ্যোক্তার গুণাবলি কি কি?
3. Holt-এর মতে উদ্যোক্তার বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
4. প্রশিক্ষণের যে কোনো দুটি সুবিধা উল্লেখ করুন।
5. যে কোনো একটি প্রশিক্ষণের পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. উদ্যোক্তার গুণাবলি আলোচনা করুন।
2. উদ্যোক্তার আচরণ ও সৃজনশীলতা ব্যাখ্যা করুন।
3. প্রশিক্ষণের সুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।
4. প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন।
5. সৃজনশীল প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা করুন।
6. উদ্যোগ সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করো।

একক-4 ❑ উদ্যোগের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning for Entrepreneurship)

গঠন

4.0 উদ্দেশ্য

4.1 প্রস্তাবনা

4.2 পরিকল্পনা প্রণয়ন—মূল ধারণা

4.2.1 পরিকল্পনা বনাম পরিকল্পনা প্রণয়ন

4.2.2 পরিকল্পনার উপাদান

4.2.3 পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

4.3 কার্যসম্পাদন পরিকল্পনা

4.3.1 কার্য সম্পাদন পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ

4.3.2 পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ

4.4 মানব সম্পদ এবং বিপণন পরিকল্পনা

4.5 সারাংশ

4.6 প্রশ্নাবলী

4.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল ধারণা
- কার্যসম্পাদন পরিকল্পনা
- মানব সম্পদ এবং বিপণন পরিকল্পনা

4.1 প্রস্তাবনা

ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলির মধ্যে প্রাথমিক কাজ হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। ভবিষ্যতে কোনো কাজ সংক্রান্ত আগাম কার্যসূচি রচনা করাই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা হল আকাঙ্খিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় কর্মপন্থার নির্বাচন একাধিক কর্মপদ্ধতির মধ্যে উপযুক্ত ও যথাযথ কর্মপন্থা বেছে নেওয়াই হল

পরিকল্পনার মূল কথা। পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কারবারই সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে না। এই একক থেকে উদ্যোগের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন কতটা প্রয়োজন সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

4.2 পরিকল্পনা প্রণয়ন—মূল ধারণা

ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলি মধ্যে **প্রাথমিক কাজ** হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা প্রণয়ন বলতে বোঝায় ভবিষ্যতে যে কাজ করা হবে বলে মনস্থ করা হয় তার একটি পরিকল্পনা রচনা করা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো কাজ সংক্রান্ত আগাম কার্যসূচি রচনা করাই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা থেকে কোনো কাজ সংক্রান্ত যে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সেগুলি হল : (i) কি (What) করা হবে? (ii) কখন (When) করা হবে? (iii) কীভাবে (How) করা হবে? (iv) কোথায় (When) করা হবে? এবং (v) কে (Who) কাজটি করবে?

সুতরাং পরিকল্পনা প্রণয়ন হল আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিকভাবে কোনো কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে কোনো কাজের পূর্বনির্ধারিত রূপরেখা ঠিক করাই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। আর পরিকল্পনা হল ভবিষ্যতে কোনো কাজ কীভাবে করা হবে তার রূপরেখা। কোনো কাজ সঠিক সময়ে, সঠিকভাবে সম্পন্ন করার আগাম চিন্তাভাবনার প্রকাশ হল পরিকল্পনা প্রণয়ন।

বস্তুত পরিকল্পনা প্রণয়ন হল একটি **মানসিক** বা **চিন্তামূলক** কাজ যার অন্তর্নিহিত উপাদানগুলি হল **কল্পনা** (imagination), দূরদৃষ্টি (foresight), পূর্বানুমান (forecast) ও **সঠিক বিচারক্ষমতা** (sound judgement)। এটি হল কাজ করার আগের চিন্তা-ভাবনা আর পরিকল্পনা হল এই চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন। পরিকল্পনা প্রণয়নে ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করা হয় এবং কীভাবে কাজ করা হবে তা ঠিক করা হয়। তাই পরিকল্পনা প্রণয়ন হল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজ আর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজ একে অনুসরণ করে।

4.2.1 পরিকল্পনা বনাম পরিকল্পনা প্রণয়ন

1. পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা না হলেও এ দুটি শব্দ এক নয়। **পরিকল্পনা প্রণয়ন** (Plan) হল একটি ব্যবস্থাপনামূলক কাজ ও ব্যবস্থাপনার অগ্রগণ্য কাজ। এটি হল একটি প্রক্রিয়া যার থেকে **পরিকল্পনার** (Plan) উদ্ভব হয়। অর্থাৎ পরিকল্পনা হল ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের রূপরেখা আর এই রূপরেখা তৈরি করার প্রক্রিয়াই হল পরিকল্পনা প্রণয়ন।
2. ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিকরা বলেন পরিকল্পনা (Plan) হল উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে **সময়** এবং **ধারাবাহিকতা** অনুসারে কীভাবে কাজ করা হবে তার একটি বিবরণী মাত্র। অন্যদিকে পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি প্রক্রিয়া যার অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলি হল—

   (i) লক্ষ্য স্থিরীকরণ,

(ii) লক্ষ্য পূরণের জন্য সঠিক কৌশল ও কর্মসূচি স্থির করা,

(iii) প্রয়োজনীয় সম্পদ ও বণ্টন করা এবং

(iv) পরিকল্পনা রূপায়ণের সাথে জড়িত সকলকে অবহিত করা।

3. প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনা (Plan) হল ভবিষ্যতের কর্মসূচি। অন্যদিকে পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনার বাস্তব প্রয়োগ প্রক্রিয়া অর্থাৎ পরিকল্পনার মধ্যে 'তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি' (Theoretical approach) ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্যে 'বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির' (Practical approach) অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

4. পরিকল্পনার বিপরীত অবস্থা হল গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা। অনুরূপভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নের বিপরীত অবস্থা হল অবিন্যস্ত আচরণ।

4.2.2 পরিকল্পনার উপাদান

সার্থক পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কতকগুলি উপাদান থাকে।

পরিকল্পনার উপাদান :

1. উদ্দেশ্য
2. নীতি
3. কর্মপদ্ধতি
4. কার্যক্রম
5. নিয়ম
6. বাজেট
7. কৌশল
8. পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়
9. সময়সূচি নির্ধারণ
10. উদ্ভাবন
11. বিকল্প পন্থা নির্বাচন

নীচে এগুলি আলোচিত হল—

1. **উদ্দেশ্য (Objective) :** উদ্দেশ্য বলতে লক্ষ্য বোঝায় যা বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যবস্থাপনার কাজগুলিকে নির্দিষ্ট দিকে চালনা করা হয়। বর্তমানে ব্যবস্থাপনাকে 'উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা' (Management by objectives) হিসাবে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে বাস্তবরূপ দেবার প্রয়োগ কৌশল হিসাবে গ্রহণ করা হয়। উদ্দেশ্যের বাস্তবরূপ দেওয়া তখনই সম্ভব যখন সঠিক পরিকল্পনা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, পরিকল্পনার তখনই সার্থক হয় যখন তা উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে। তবে অনেক সময় উদ্দেশ্যের বাস্তবরূপ দেবার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে—যেমন লাভ অর্জন বেশি গুরুত্বপূর্ণ না

সামাজিক দায়িত্ব পালন সর্বাগ্রগণ্য। দ্বন্দ থাকা সত্ত্বেও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যে পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান হল উদ্দেশ্য স্থির করা।

2. **নীতি (Policy) :** নীতি বলতে লিখিত বিবরণী বা মৌখিক বোঝাপড়া (written statement or verbal understanding) বোঝায় যার মাধ্যমে চিন্তা ও কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে নীতি নির্ধারণ করা হয় এবং সেই সব স্তরের ব্যবস্থাপক গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতি প্রয়োগ করেন। প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য কী পদ্ধতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করা উচিত তা নীতি নির্ধারণ ও নীতির বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব হয়। তাই নীতি সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যাপক, নমনীয়, গতিশীল পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করে। **টেরীর** (Terry) মতে, 'Policies are broad, comprehensie, elastic, dynamic guides"।

3. **কর্মপদ্ধতি (Procedures) :** প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য সময়মতো ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যে বিবরণী গ্রহণ করা হয় তাকে কর্মপদ্ধতি বলে। কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট হতে হবে (Procedures must be definite) এবং নীতির মতো নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। **টেরীর** (Terry) মতে, "A procedure is a series of related tasks that make up the chronological sequence and the established way of performing the work to be accomplished"। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য সফল করতে হবে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজগুলিকে পরপর সাজিয়ে সার্থকভাবে কার্য সম্পাদনের বিবরণী হল কর্মপদ্ধতি। পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান হল সঠিক কর্মপদ্ধতি রচনা করা।

4. **কার্যক্রম (Programme) :** নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্দিষ্ট করার পর সেগুলিকে যুক্তি সহকারে একত্রীকরণ করাকে কার্যক্রম বলে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি রূপায়ণ হল কার্যক্রম। কার্যক্রম ঠিক করা অর্থ হল কোন্ ব্যক্তি কী কাজ করবেন এবং সেই কাজ সম্পাদনের জন্য কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হবে সেগুলি নির্ধারণ করা। অনেকে আবার কার্যক্রম ও পরিকল্পনাকে এক করে থাকেন এবং পরিকল্পনার বিভিন্ন নামকরণ করেন। যেমন—যে কাজ পুনঃপুন সংগঠিত হয় তার জন্য যে কার্যক্রম নেওয়া হয় তাকে রুটিন পরিকল্পনা (Routine Planning) বলে এবং যা পুনঃপুন সংগঠিত হয় না অথচ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন, তাকে সৃজনী পরিকল্পনা (Creative Planning) বলে। যাইহোক, সফল কার্যক্রম উদ্দেশ্য, নীতি, কর্মপদ্ধতি এবং প্রণালী নিয়ে গড়ে উঠে। সেজন্য **টেরী** (Terry) বলেছেন যে, "The make up of programmes consist of objectives, policies, procedures and methods"।

5. **নিয়ম (Rules) :** নিয়ম বলতে কোনো কাজ করার সুনির্দিষ্ট নির্দেশবলিকে বোঝায়। সংগঠনের বিভিন্ন কাজ করার জন্য যে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়ম চালু করা সম্ভব হয়, যা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করে।

6. **বাজেট (Budget) :** কোনো কার্যক্রমের আর্থিক বা পরিমাণগত বিবরণী হল বাজেট। অর্থাৎ

বাজেট আর্থিক বিবরণীও হতে পারে এবং পরিমাণগত বিবরণীও হতে পারে। **কুনজ এবংও'ডোনেল** (Koontz and O'Donnell)-এর মতে, "It may be entirely expressed in financial terms"; অর্থাৎ বাজেট পুরোটাই আর্থিক রাশি দ্বারা প্রকাশ করা যায়। প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের জন্য বাজেট করতে হয়—যেমন উৎপাদন বিভাগের জন্য উৎপাদন বাজেট, অর্থ বিভাগের জন্য আর্থিক বাজেট ইত্যাদি। এই বাজেট দ্বারা কত পরিমাণ অর্থ লাগবে বা কত পরিমাণ উৎপাদন হবে তা স্থির করা হয়, যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠান তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমর্থ হয়।

7. **কৌশল (Strategy) :** কৌশল বলতে বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা বোঝায়। বর্তমান বিশ্বে কারবারি জগতে তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা দরকার, যার সাহায্যে একটি প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে এগিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেই সমস্যা কৌশল অবলম্বন করে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। তাই কৌশল হল অনিশ্চিত ঘটনা মোকাবিলার এক বিশেষ পরিকল্পনা।

8. **পরিকল্পনার অনুমিত বিষয় (Planning Premises) :** পরিকল্পনা রচনা করার সময় চতুষ্পার্শ্বস্থ বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যিনি পরিকল্পনা করেন তাঁর পক্ষে ভবিষ্যৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, স্পর্শনীয় ও অস্পর্শনীয়, নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত ইত্যাদি বিষয় থাকে যা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। **ম্যাসির** (Massie) মতে, "The process of planning may being with a vague hunch or an element of instutition"। অর্থাৎ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া শুরু হয় অস্পষ্ট অনুমান বা অনুভূতির মাধ্যমে। যেহেতু পরিকল্পনা মূলত অনুমান নির্ভর, তাই যে সব বিষয় অনুমান করে পরিকল্পনা করা হয়, সেগুলিকে পরিকল্পনার অনুমিত বিষয় বলে।

9. **সময়সূচি নির্ধারণ (Scheduling) :** পরিকল্পনার উপাদানের মধ্যে সময়সূচি নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে প্রতিটি কাজের শুরু ও শেষ নির্দেশ করা থাকে। এই সময় নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়। তাই সময়সূচি নির্ধারণ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

10. **উদ্ভাবন (Innovation) :** পরিকল্পনার মধ্যেই থাকে উদ্ভাবনের বীজমন্ত্র। পরিবর্তনশীল কারবারি জগতে নিত্য নতুন বিষয় উপস্থিত হয় যা কারবারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেজন্য পরিকল্পনা উদ্ভাবন বা নতুনত্ব থাকা আবশ্যিক যার সাহায্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

11. **বিকল্প পন্থা নির্বাচন (Selection of alternatives) :** যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিকল্প পর্যালোচনা করতে হয়। পরিকল্পনার অর্থই হল বিভিন্ন বিকল্প থেকে সর্বাধিক উপযোগী বিকল্পটি নির্বাচন করা। তাই বিকল্প পন্থা নির্বাচন পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

4.2.3 পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি ধারাবাহিক ও সার্বিক প্রক্রিয়া। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি বুঝতে হলে এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়গুলি জানা দরকার। কারণ এই ধাপগুলি অতিক্রম করেই পরিকল্পনা প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায়। যদিও পরিকল্পনার প্রকৃতি অনুসারে এই ধাপগুলি কম-বেশি হয়, তবুও একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে সাধারণত যে সব ধাপ অতিক্রম করতে হয় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল :

প্রথম ধাপ : পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন উপলব্ধি করা।

দ্বিতীয় ধাপ : পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্থির করা।

তৃতীয় ধাপ : পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি স্থির করা।

চতুর্থ ধাপ : বিকল্প পথের সন্ধান।

পঞ্চম ধাপ : বিকল্প পথগুলির মূল্যায়ন ও সর্বোত্তম পথটি বেছে নেওয়া।

ষষ্ঠ ধাপ : সহায়ক পরিকল্পনা তৈরি করা।

সপ্তম ধাপ : সময়সূচি ও কার্যসূচি তৈরি করা।

অষ্টম ধাপ : রূপায়ণ ও অনুবর্তন।

প্রথম ধাপ : পরিকল্পনার প্রয়োজন উপলব্ধি (Awareness of need for planning) : পরিকল্পনার প্রয়োজন উপলব্ধি হওয়ার সাথে সাথে পরিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। বস্তুত উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সামনে কী সুযোগ, সম্ভাবনা, আশঙ্কা রয়েছে তা উপলব্ধি করেই পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ধাপে প্রতিষ্ঠান ‘SWOT বিশ্লেষণের’ মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বাস্তব অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলে। SWOT Analysis-এর প্রতিটি অক্ষ এক একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এগুলি হল 'S' (Strength) অর্থাৎ শক্তি, 'W' (Weakness) অর্থাৎ দুর্বলতা, 'O' (Opportunity) অর্থাৎ সুযোগ বা সম্ভাবনা এবং 'T' (Threat) অর্থাৎ আশঙ্কা। এই পর্যায়কে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি পর্ব বলা হয়।

দ্বিতীয় ধাপ : পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্থির করা (Determination of Objective) : পরিকল্পনা সব সময় উদ্দেশ্যমুখী। অর্থাৎ এক বা একাধিক উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার প্রথম ধাপ শুরু হয় উদ্দেশ্য স্থিরীকরণের মধ্য দিয়ে। যাই হোক, এই ধাপে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য স্থির করার কাজ সম্পন্ন হয়। যেমন, কোনো সমস্যার সমাধান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হতে পারে বা কোনো সুযোগের সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যেও পরিকল্পনা তৈরি হতে পারে। সুতরাং পরিকল্পনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী তা প্রথমেই স্থির করতে হয়। কারণ এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন সহায়ক পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। যেমন কোনো কোম্পানির কোনো বছরে 20 শতাংশ মুনাফা বৃদ্ধি যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনাও সেভাবে তৈরি করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ : পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি স্থির করা (Determining the Planning premises) : পরিকল্পনার উদ্দেশ্য একবার স্থির হয়ে গেলে পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি স্থির করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কারণ এই বিষয়গুলিই পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। **পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি হল ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ধারণাসমূহ**। এগুলি পরিকল্পনার পরিবেশ বা চতুঃসীমা ঠিক করে দেয় যার মধ্যে পরিকল্পনার প্রয়োগ ঘটে। পূর্বানুমানের সাহায্যে পরিকল্পনার অনুমিত বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা হয়। বর্তমান ঝোঁক বা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি স্থির করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক উদারীকরণের পর অনেক বহুজাতিক সংস্থা ভারতে তাদের ব্যবসা শুরু করেছে। এর ফলে ভারতীয় কোম্পানিগুলিও আন্তর্জাতিক মানের শংসাপত্র (ISO-9000) পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ বর্তমান কোম্পানিগুলি মনে করে যে এর ফলে বহুজাতিক সংস্থাগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে সাহায্য করবে।

চতুর্থ ধাপ : বিকল্প পথের সন্ধান (Searching for alternatives) : পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও অনুমিত বিষয়গুলি চূড়ান্ত হয়ে গেলে পরিকল্পনাকারীরা উদ্দেশ্যসাধনের বিভিন্ন পথগুলির অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়। সমস্ত সম্ভাব্য বিকল্প পথগুলি চিহ্নিত করার জন্য এ সংক্রান্ত তথ্যগুলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হয়। এভাবে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তগুলি থেকে বিভিন্ন বিকল্প পথের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

পঞ্চম ধাপ : বিকল্প পথগুলির মূল্যায়ন ও সর্বোত্তম পথটির নির্বাচন (Evaluation of alternatives and selection of the best one) : উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের সামনে একাধিক পথ থাকে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র সেই পথটিই গ্রহণ করে যেটি উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক বলে গণ্য হয়। এজন্য প্রতিটি বিকল্প পথ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তগুলি বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক বিকল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার করা হয়। তবে বিভিন্ন বিকল্পের মূল্যায়নে পরিকল্পনাকারীরা দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিকল্পগুলির মধ্যে তুলনা করেন ও সর্বোত্তম বিকল্পটি বেছে নেন। এই দুটি বিষয় হল **প্রত্যাশিত ব্যয়** (Expected cost) ও **প্রত্যাশিত সুবিধা** (Expected benefits)। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয় যেমন ঝুঁকি (Risk), প্রত্যাশিত আয় (Expected return), অনুমিত বিষয়সমূহ (Planning premises) ইত্যাদির ভিত্তিতেও বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে তুলনা করা হয়। যাইহোক, এই পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিভিন্ন বিকল্পের মূল্যায়ন করা হয় এবং সর্বোত্তম বিকল্পটি নির্বাচন করা হয় এবং মূল পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়।

ষষ্ঠ ধাপ : সহায়ক পরিকল্পনা তৈরি করা (Formulation of derivative plans) : মূল পরিকল্পনা তৈরি হলে পরিকল্পনাকারীরা পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেন। অর্থাৎ মূল পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলির পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এগুলিকে মূল পরিকল্পনার সহযোগী বা সহায়ক পরিকল্পনা বলে। এরূপ পরিকল্পনা নীতি বা কৌশল বা পদ্ধতি বা কার্যসূচি বা সময়সূচি বা বাজেট সংক্রান্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো কোম্পানি একটি নতুন পণ্য বাজারে চালু করতে চায় তখন তাকে পণ্যের নক্শা, আকার বা আকৃতি, ওজন, রঙ ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। এছাড়াও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা, কাঁচামাল ক্রয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা, কর্মীদের

প্রশিক্ষণ, পণ্যের জন্য বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। আর এই পরিকল্পনাগুলি হল মূল পরিকল্পনার সহযোগী পরিকল্পনা।

সপ্তম ধাপ : পরিকল্পনার সময়সূচি ও কার্যসূচি চূড়ান্ত করা (Finalisation of schedule and programme of plan) : পরিকল্পনা প্রণয়নের এই ধাপে প্রতিটি পরিকল্পনাকে সময়সূচি ও কার্যসূচি দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। এর ফলে পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যপূরণ করতে সমর্থ হয়। আর কার্যসূচি বিভিন্ন কাজের ক্রমপর্যায় স্থির করে দেয়। এর ফলে পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে অর্থ ও শ্রমের সাশ্রয় ঘটে। এই পর্যায়ে পরিকল্পনার সমস্ত দিক চূড়ান্ত করা হলে কর্মীদের জানানোর ব্যবস্থা করা হয় যাতে পরিকল্পনা রূপায়ণে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

শেষ ধাপ : পরিকল্পনা রূপায়ণ ও অনুবর্তন (Implementation and follow up) : পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার অন্তিম ধাপ বা পর্যায়টি হল পরিকল্পনার রূপায়ণ ও অনুবর্তন। অর্থাৎ পরিকল্পনার রূপায়ণ না ঘটলে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি বিফল হয়ে পড়ে। অনুবর্তনের ফলে পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি সহজেই চিহ্নিত করা যায় ও ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অনুবর্তনের ফলেই কাজের রূপায়ণের ক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতি ঘটলে তা ঠিক করা যায় অর্থাৎ কাজগুলি যাতে পরিকল্পিত পথেই সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়াও বাহ্যিক পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনার মধ্যে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে তাও করা সম্ভব হয়। এজন্য এই পর্যায়ে পরিকল্পনার রূপায়ণের সাথে সাথে অনুবর্তনও চালানো হয়। এর ফলে পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়নের উপরের ধাপগুলি একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরলে নীচের রেখাচিত্রটি পাওয়া যায় :

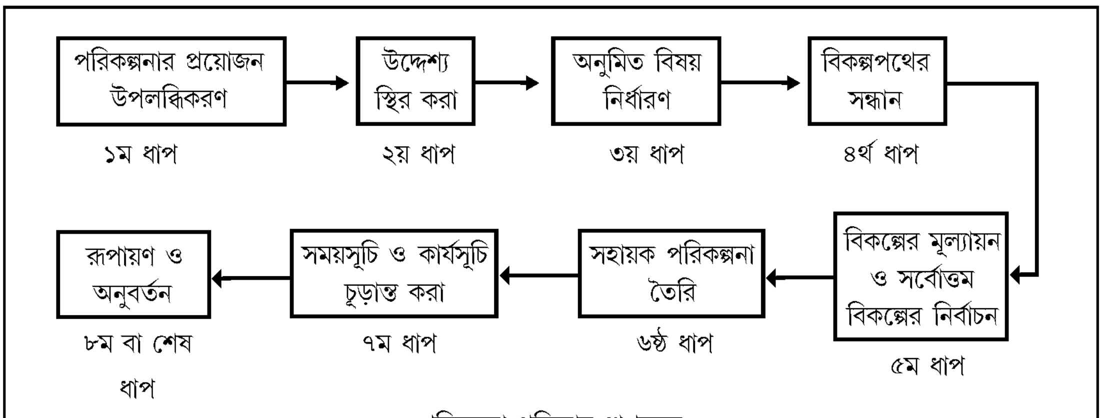

পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

4.3 কার্য সম্পাদন পরিকল্পনা

কোনো নতুন কারবার বা উদ্যোগের কার্যসম্পাদন পরিকল্পনা বলতে বোঝায় যে পরিকল্পনা কোম্পানির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মপ্রণালী, সময়সূচি ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করে এবং কর্মসম্পাদনে কর্মীরা যাতে যত্নবান হয় ও সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন করে সেই সংক্রান্ত গাইডলাইন। কারবারের যেসব বিষয় পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) কারবারের উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে উল্লেখ করতে হয়।

(ii) কী কী কাজ সম্পন্ন করা হবে তার বিশদ বিবরণ।

(iii) কাজের গুণগত মান সম্বন্ধে নির্দেশিকা।

(iv) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা।

(v) কাজ সম্পাদনের জন্য কর্মী ও অন্যান্য যেসব সম্পদের প্রয়োজন হয় এবং বাজেট।

(vi) কাজ রূপায়ণ বা সম্পাদনের সময়সূচি।

(vii) কাজের অগ্রগতি জানার ব্যবস্থা।

কাজেই একটি কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা হল উদ্যোগ বা কারবারের কৌশলগত পরিকল্পনার অংশবিশেষ। এটি হল একটি বিশদ পরিকল্পনা যা থেকে বোঝা যায় যে একটি কর্মীদল বা বিভাগীয় কর্মী কীভাবে কারবারের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কাজ করবে। এই পরিকল্পনায় কারবারের দৈনন্দিন কাজে উল্লেখ থাকে এবং কীভাবে কে বা কারা সেই কাজটি কখন সম্পন্ন করবে সে ব্যাপারে আগাম ধারণা দেয়। বস্তুত একটি কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা হল কারবারের কৌশলগত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কৌশলের রূপায়ণ সংক্রান্ত পরিকল্পনা।

4.3.1 কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ

কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রধান সুবিধা হল যে কারবার বা উদ্যোগ বুঝতে পারে যে মুনাফার উপর কার্য সম্পাদনের প্রভাব কতখানি। এ ধরনের পরিকল্পনা কারবারের আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে, দুর্বলতাগুলি সনাক্ত করে এবং মুনাফা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় তার উপায় খুঁজে বের করে। এর অন্যান্য সুবিধাগুলি নীচে তুলে ধরা হল—

(i) এই পরিকল্পনা উদ্যোগ বা কারবারের পণ্য ও সেবার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় এবং বাজার অংশ সর্বাধিক করার পরিকল্পনা করে।

(ii) পরিকল্পনা একটি সম্ভাব্য আর্থিক চিত্র প্রকাশ করে।

(iii) কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা উৎপাদন, মেশিনপত্র, কর্মী, কাঁচামাল এবং কারবারি প্রক্রিয়ার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় এবং সবগুলির সঠিক ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করে।

(iv) কারবারের মুনাফাযোগ্যতা নির্ধারণেও এই পরিকল্পনা সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, কোন্

উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলি মুনাফা বৃদ্ধি করবে তা চিহ্নিত করার জন্য পরিকল্পনায় প্রতিদান অনুপাত (contribution ratio) ব্যবহার করা হয়।

(v) কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পাদন প্রক্রিয়ার কোথায় কোথায় ত্রুটি আছে সেগুলি চিহ্নিত করা যায় এবং পরবর্তীকালে ত্রুটিগুলি সংশোধন করার ববস্থা করা হয়।

(vi) এ ধরনের পরিকল্পনার প্রধান সুবিধাটি হল যে এর মাধ্যমে কারবারের মুনাফার উপর বিভিন্ন কাজের প্রভাব বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

4.3.2 পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ। কারণ কারবারে দৈনন্দিন যেসব কাজ করতে হয় সেগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব থাকে, কারণ প্রতিটি কাজই কম-বেশি মুনাফাকে প্রভাবিত করে। এজন্যই প্রতিটি কাজের জন্য যেমন পরিকল্পনা করা দরকার, তেমনি সাথে সাথে তাদের নিয়ন্ত্রণ করারও আবশ্যক হয়। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ পরস্পরের পরিপূরক যদিও প্রথমটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত বিভ্রান্ত পূরণের সাথে যুক্ত এবং নিয়ন্ত্রণ অতীতের কাজের নিরিখে কাজের প্রমাণ মান নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া। কাজেই কারবারের কাজগুলি যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ, উভয়েরই প্রয়োজন হয়। কারণ সঠিক পরিকল্পনা ও সঠিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ কারবারের কাজ যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং ক্রেতাদের চাহিদা ভালোভাবে পূরণ হয় তার ব্যবস্থা করে। পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ দুটি পৃথক শব্দ, পৃথক ধারণা ও পৃথক কাজ করে। তবে একজায়গায় এদের মধ্যে মিল হল যে এই দুটি বিষয়ই কারবার ব্যবস্থাপনার দুই স্তম্ভ হিসাবে গণ্য হয় এবং অপর দুটি স্তম্ভ হল সংগঠন গড়ে তোলা (Organising) ও সমন্বয়সাধন (Co-ordinating)।

4.4 মানব সম্পদ এবং বিপণন পরিকল্পনা

মানব সম্পদ পরিকল্পনা : উৎপাদনের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কতজন কর্মী এবং কি ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন—এরই ভিত্তিতে মানবিক সম্পদের প্রয়োজন সম্পর্কে হিসাব করতে হয়। আবার কোন প্রকল্পের কাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে হলে এক সুনির্দিষ্ট মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এই মানব সম্পদ পরিকল্পনার অন্তর্গত অন্যতম বিষয়গুলি হল প্রয়োজনীয় মানব শক্তির পরিমান, প্রত্যেক কর্মীর কর্তৃত্ব, দায়িত্ব ও কর্তব্য সাংগঠনিক কাঠামোর কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন কর্মীর ওপর দায়িত্ব ও কর্তব্য কিভাবে অর্পণ করা হবে তার রূপরেখা ও আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তিতে কাজগুলি কিভাবে সম্পাদিত হবে, তার ব্যাখ্যা এমনকি কর্মী সংগ্রহের উৎসসমূহ, কর্মী সংগ্রহের ব্যয়, প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কিনা এবং তার জন্য আনুমানিক ব্যয় পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখ করতে হয়।

বিপণন পরিকল্পনা : বাজার গবেষণার এবং উদ্যোক্তর সাফল্যের শর্তের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বাজার এবং বিপণন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে উদ্যোক্তা একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল নির্ধারণ করেন। এই

পরিকল্পনা আলোকপাত করে বিশেষ ধরনের বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলীর ওপর। যেমন—

(i) **দাম (Price) :** পণ্য বা সেবার সুনির্দিষ্ট দাম নির্ধারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। উদ্যোগের দাম নির্ধারণের নীতি স্বচ্ছভাবে চিহ্নিত করতে হবে। পাইকারি দাম, খুচরা দাম, বিশাল পরিমানের দ্রব্যের দাম, বিক্রয়ের শর্ত, মূল্য তালিকা তৈরি করতে ব্যবহৃত পদ্ধতি-সংক্রান্ত নীতি বিশেষভাবে বর্ণনা করতে হবে।

(ii) **প্রসার (Promotion) :** সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, জনসম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রসার সংক্রান্ত কৌশল নির্বাচন করতে হবে।

(iii) **সেবা ও নিশ্চয়তার শর্ত (Service and Warranty Condition) :** বিক্রয়োত্তর সেবা, খরিদ্দার সমর্থন ও বিরোধীপক্ষের আলোচনারূপে বিপণন প্রচেষ্টার সমর্থনকারী কোন অস্বাভাবিক নিশ্চয়তার শর্ত চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

(iv) **বণ্টন প্রণালী (Distribution Channel) :** বাজার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বণ্টন প্রণালীগুলি গ্রহণ করতে হবে। যেমন—পাইকারি, খুচরা, ডাকযোগে কারবার, মধ্যস্থ কারবারী মাধ্যমে কারবার ইত্যাদি।

(v) **বিপণন নেতৃত্ব (Marketing Leadership) :** বাজার পরিকল্পনার মাধ্যমে ঠিক করা হয় সংগঠনের সদস্যগণ উদ্যোগের বিপণন সংক্রান্ত প্রচেষ্টায় কিভাবে নিজেদের যুক্ত করবেন। বিনিয়োগকারীরা প্রকৃত বিপণন সংক্রান্ত কাজের জন্য দায়ী ব্যক্তির সম্পর্কে অধিক উৎসাহ থাকে।

4.5 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আপনারা যে সমস্ত বিষয় জানতে পারলেন তা হল—

- পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে ধারণা
- কার্যসম্পাদন পরিকল্পনা
- মানবসম্পদ এবং বিপণন পরিকল্পনা

4.6 প্রশ্নাবলি

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. নীচে উল্লিখিত উপাদানগুলি মধ্যে কোনটি কার্যসম্পাদনের (operations) উপাদান হিসাবে গণ্য হয়?

(ক) অবস্থান (খ) যন্ত্রপাতি

(গ) প্রক্রিয়া (ঘ) সবগুলিই

2. নিচের কোনটি পরিকল্পনার উপাদান হিসাবে গণ্য হয় না?
   (ক) দূরদৃষ্টি (খ) মূল্যায়ন
   (গ) পূর্বামান (ঘ) কল্পনা
3. নীচের কোনটি পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে গণ্য হয়?
   (ক) তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (খ) নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি
   (গ) বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি (ঘ) কোনোটিই নয়
4. নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নীচের কোন বক্তব্যটি তুমি সঠিক বলে মনে করো?
   (ক) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজকে নির্দেশ দেয়
   (খ) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার কাজগুলিকে নেতৃত্ব দেয়
   (গ) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজকে অনুসরণ করে
   (ঘ) কোনোটিই নয়
5. পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে নীচের কোন বক্তব্যটি সঠিক বলে তুমি মনে করো?
   (ক) পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ পরস্পরের পরিপূরক
   (খ) নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে
   (গ) উভয়ই ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি দেয়
   (ঘ) সবগুলিই

উত্তর: 1. (ঘ) 2. (খ) 3. (ক) 4. (গ) 5. (ঘ)

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. পরিকল্পনা প্রণয়ন কাকে বলে?
2. পরিকল্পনার যেকোন দুটি উপাদান উল্লেখ করুন—
3. কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার যেকোন দুটি সুবিধা উল্লেখ করুন।
4. কার্যসম্পাদন পরিকল্পনায় কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে?
5. পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটি উল্লেখ করুন?

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. পরিকল্পনার উপাদানগুলি আলোচনা করুন।
2. কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন।

3. পরিকল্পনা বনাম পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যাখ্যা করুন।
4. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা করুন।
5. পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপগুলি আলোচনা করুন।
6. মানব সম্পদ এবং বিপণন পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করুন।

পর্যায়-২

?

[?]

একক–5 : উদ্যোগ গ্রহণের সহযোগী বিষয়সমূহ [Complementary Factors of Entrepreneurship]

5.0 উদ্দেশ্য

5.1 প্রস্তাবনা

5.2 ভূমিকা

5.3 উদ্যোগ গঠনে ব্যক্তিগত উদ্দীপনা

5.4 উদ্যোগ গঠনে সরকারী উদ্দীপনা

5.5 উদ্যোগের সহায়তা ও দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব

5.5.1 উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব

5.6 উদ্যোগে বিপণন সহায়তা

5.7 উদ্যোগে প্রযুক্তিমূলক সহায়তা

5.8 সারাংশ

5.9 প্রশ্নাবলি

5.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- উদ্যোগ গঠনে ব্যক্তিগত উদ্দীপনা
- উদ্যোগ গঠনে সরকারি উদ্দীপনা
- উদ্যোগের সহায়তা ও দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব
- উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব
- উদ্যোগে বিপণন সহায়তা
- উদ্যোগে প্রযুক্তিমূলক সহায়তা

5.1 প্রস্তাবনা

উদ্যোগ গঠন হল স্বপ্নের বাস্তবায়ন। উদ্যোক্তা যে স্বপ্ন দেখেন তা সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ পায়, উদ্যোগের মধ্যে। উদ্যোগ গড়ার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যায়।

উদ্দীপনা হল যা কোনো ব্যক্তিকে কাজে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করে। কিন্তু কেবল মাত্র ইচ্ছা, তাগিদ ও সৃজনশীলতা দিয়েই উদ্যোগ গড়ে তোলা যায় না। এরজন্য আরও নানা ধরনের উপকরণ তথা সম্পদের প্রয়োজন হয়। এই একক থেকে উদ্যোগ গ্রহনের জন্য সে সকল সহযোগী বিষয়সমূহ প্রয়োজন সে সম্পর্কে আপনারা অবগত হবেন।

5.2 ভূমিকা

উদ্যোগ গড়ে তোলা কোনো সহজ কাজ নয়। উদ্যোগ গঠন হল স্বপ্নের বাস্তবায়ন। উদ্যোক্তা যে স্বপ্ন দেখেন তা সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ পায় উদ্যোগের মধ্যে। উদ্যোগ গড়ার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যায়। এই উদ্দীপনা দু-ধরনের—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। উদ্যোক্তার অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা তাকে উদ্যোগ গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়। উদ্দীপনা মানুষের অন্তর্নিহিত আবেগ তাই একে দেখা যায় না। কিন্তু আচরণের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে। তাই ব্যক্তির মধ্যে উদ্দীপনা অর্থাৎ নতুন কিছু করার ইচ্ছা বা তাগিদ না থাকলে সে উদ্যোক্তা হতে পারে না। ব্যক্তিগত উদ্দীপনা সবসময় উদ্যোক্তাকে উদ্যোগ গঠনের জন্য মানসিক তাড়া দিয়ে থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র ইচ্ছা, তাগিদ ও সৃজনশীলতা দিয়েই উদ্যোগ গড়ে তোলা যায় না। এরজন্য আরও নানা ধরনের উপকরণ তথা সম্পদের প্রয়োজন হয়। বাহ্যিক পরিবেশ যখন উদ্যোগ গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয় তখন উদ্যোগ গঠন গতিশীল হয়। একেই বলা হয় বাহ্যিক উদ্দীপনা যা কারবারি পরিবেশ থেকে উদ্ভুত হয়। এগুলি ছাড়াও যেসব বিষয় উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য সেগুল হল সংগঠন, মানবসম্পদ, মূলধন, বিপণন ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে এসব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে।

5.3 উদ্যোগ গঠনে ব্যক্তিগত উদ্দীপনা

উদ্দীপনা হল যা কোনো ব্যক্তিকে কাজে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করে। একটি পছন্দসই বা কৌতুক কার্যকলাপও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে এটি উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। তবে উদ্দীপকের প্রধান কাজ হল যে ব্যক্তিবিশেষকে কাজে উৎসাহিত করা ও তার মানসিক বাধা দূর করা। উদ্যোগ গঠনে অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা বলতে বোঝায় ব্যক্তির মানসিক গঠন অনুসারে তার আচরণকে যেসব উদ্দীপক প্রভাবিত করে। কারণ বিভিন্ন মানুষের মানসিক গঠন অনুসারে তার আচরণকে যেসব উদ্দীপক প্রভাবিত করে। কারণ বিভিন্ন মানুষের মানসিক গঠন বিভিন্ন হওয়ার ফলে কোনো একটি উদ্দীপক সকল মানুষকে সমানভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারে না। তাই অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা বলতে ব্যক্তিগত উদ্দীপনাকে বোঝায় যা কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজে বিশেষত উদ্যোগ গঠনে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। প্রধানত অর্থনৈতিক বিষয়গুলিই একজন উদ্যোক্তার মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং লক্ষ্য-সাধনের জন্য তাকে উৎসাহিত করে। একজন উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে **ব্যক্তিগত উদ্দীপক** হিসাবে যেসব বিষয় কাজ করে সেগুলি রেখাচিত্রের মাধ্যমে নীচে তুলে ধরা হল।

ব্যক্তিগত উদ্দীপক— (i) আত্মনির্ভর হওয়ার ইচ্ছা

(ii) নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করার প্রচেষ্টা

(iii) ব্যক্তির সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ

(iv) অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ

(v) সামাজিক অবদান

বিষয়গুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(i) **আত্মনির্ভর হওয়ার ইচ্ছা** (Will to be self-reliance) : যে-কোনো ব্যক্তি তার লেখাপড়া শেষ হলে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায় যাতে তার আর্থিক সচ্ছলতা গড়ে ওঠে। ওই ব্যক্তির কাছে দুটি পথ খোলা থাকে—চাকুরি বা স্ব-নিযুক্তি। চাকুরিতে একজন ব্যক্তি কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় বেতন বা মজুরির বিনিময়ে চাকুরিতে যোগদান করে। কিন্তু স্ব-নিযুক্তি বা স্ব-রোজগারের ক্ষেত্রে সে নিজের প্রচেষ্টায় কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে যেখানে ঝুঁকি বেশি কিন্তু অনেক বেশি আয় করার সুযোগ থাকে। অর্থাৎ অধিক মুনাফার আশা ও উচ্চ মর্যাদা এখানে উদ্যোগ বা কারবার গড়ে তুলতে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

(ii) **নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করার প্রচেষ্টা** (Opportunity to make own destiny) : স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম উক্তিটি হল 'তুমি নিজেই তোমার ভাগ্যের স্রষ্টা।' উদ্যোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে ও সে যা অর্জন করতে চায় তার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে ও প্রয়োজনীয় কাজ করে। সে উচ্চ আশা পোষণ করে এবং আশা পূরণের লক্ষ্যে উদ্যোগকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ নিজ ভাগ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যও ব্যক্তিগত উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

(iii) **ব্যক্তির সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ** (Opportunity to flourish full potential) : প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অল্প-বিস্তর সম্ভাবনা থাকে যা পরবর্তী জীবনে বিকশিত হয়ে তাকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে। কারবারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তা তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পুরোপুরি বিকাশের সুযোগ পায়। এর মাধ্যমেই সে নিজেকে কারবারি জগতে তুলে ধরতে পারে এবং সাফল্য অর্জনের জন্য অগ্রসর হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশের প্রচেষ্টাও উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা হিসাবে কাজ করে।

(iv) **অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ** (Opportunity to earn huge profit) : চাকুরির ক্ষেত্রে ঝুঁকি কম কিন্তু আয়ও সীমিত এবং কম-বেশি স্থির থাকে। কিন্তু উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি যেমন বেশি তেমনি আয়ের সুযোগও বেশি। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একজন উদ্যোক্তা যদি অন্য সংস্থায় কাজ করতেন তাহলে তার যে আয় হত তার তুলনায় উদ্যোগ থেকে তার আয় অনেক বেশি হয়। এমনকি অনেক উদ্যোক্তা অতি ধনবান হয়ে ওঠে। ডেল কম্পিউটার কর্পোরেশনের মালিক-উদ্যোক্তা মাইকেল ডেল, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক-উদ্যোক্তা **ধীরুভাই অম্বানি**, ইনফোসিস-এর প্রতিষ্ঠাতা **এন. আর.**

নারায়ণ মূর্তি প্রমুখ বিত্তশালী উদ্যোক্তার উদাহরণ। কাজেই অনেক বেশি লাভ করার ইচ্ছা উদ্যোগ গঠনের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

(v) **সামাজিক অবদান** (Social contribution) : উদ্যোক্তার সামাজিক কল্যান করার সুপ্ত ইচ্ছাও উদ্যোগ গঠনের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে এবং উদ্যোগ গঠনের মাধ্যমে তারা এই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ পায়। কারবারি উদ্যোগ যেমন সমাজে পণ্য বা সেবার যোগান দেয় তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করে, অলস সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে মূলধনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। এভাবেই উদ্যোক্তা সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে করে।

5.4 উদ্যোগ গঠনে সরকারী উদ্দীপনা

উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্দীপনা প্রথম পর্যায়ের গুরুত্ব পেলেও বাহ্যিক পরিবেশ থেকে সমর্তন না পেলে উদ্যোগ গঠন সম্ভব হয় না। কারণ বাহ্যিক পরিবেশও উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে রাজনৈতিক তথা সরকারি পরিবেশ যদি উদ্যোগ গঠনে সহায়তা করে তাহলে উদ্যোগ গড়ে তোলা অনেক সহজ হয় এবং এদেরকে এককথায় সরকারি উদ্দীপক হিসাবে গণ্য করা হয়। সরকারি উদ্দীপকের বিষয়গুলি রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

সরকার উদ্দীপকের বিষয়সমূহ : (i) সুদের হার কমানো
(ii) কর হ্রাস
(iii) সরকারি ব্যয়
(iv) দামের স্থিরতা
(v) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবন
(vi) একচেটিয়া সুবিধার বিলোপ ও প্রতিযোগিতাকে উৎসাহদান
(vii) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

নীচে বিষয়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা হল।

(i) **সুদের হার কমানো** (Lowering the rate of interest) : ব্যাঙ্কের সুদের হার বাড়ানো বা কমানো যদিও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর পড়ে তবুও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তা করা হয়। সুদের হার কম হলে ঋণ সস্তা হয় এবং উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে যে বীজ-মূলধন লাগে তার ব্যয় কমে, ঝুঁকি কমে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ে। সুদের হারের সাথে মুদ্রাস্ফীতিরও নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি সুস্থিত ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে

থাকলে সুদের হার কমানো সম্ভব হয়। আর সুদের হার কম হলে উদ্যোগ গঠন ত্বরান্বিত হয়। কারণ উদ্যোগ গঠনের ব্যয় কম হয়।

(ii) **কর হ্রাস** (Tax reduction) : আয়কর, পণ্য ও পরিষেবা কর ও কোম্পানি করের হার কম হলে তার প্রভাব সঞ্চয়ের উপর পড়ে ও সামগ্রিক সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি। এর ফলে উদ্যোগ গঠন উৎসাহিত হয়। তাই ভারতের মতো দেশে বেশি কর হার উদ্যোগ গঠনে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর হ্রাস উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

(iii) **সরকারি ব্যয়** (Public Expenditure) : সরকারি ব্যয়ও অনেক সময় উদ্যোগ গঠনের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। তবে সবধরনের সরকারি ব্যয়ই উদ্দীপক হিসাবে গণ্য হয় না। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বা বেসরকারি লগ্নি যদি অপ্রতুল হয় এবং লগ্নির এই ফাঁক পূরণের জন্য সরকারি লগ্নি করা হয় তাহলে তা উদ্যোগের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ সরকারি নীতি যদি উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করে তাহলে তা উদ্যোগ গঠনের সহায়ক হয়। বিশেষত অর্থনৈতিক মন্দার সময় বেসরকারি মূলধনের যোগান কম থাকার ফলে উদ্যোগ গঠনে সরকারি সহায়তার প্রয়োজন হয় যতদিন না দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক হয়।

(iv) **দামের স্থিরতা** (Price stability) : বেসরকারি ক্ষেত্রে লগ্নির অস্থিরতার কারণ হল উৎপাদিত পণ্য বা সেবার দামের অস্তিরতা। এর ফলে প্রত্যাশিত মুনাফার হার তথা মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতারও পরিবর্তন ঘটে। সেকারণে অর্থনীতিতে মূলধনের উদ্দীপক হিসাবে দামের স্থিরতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে দামের স্থিরতা বলতে বোঝায় আপেক্ষিক দামের স্থিরতা। সেজন্য সরকারের দামনীতি স্থির করা প্রয়োজন। সরকার দামের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলে ও বিভিন্ন পণ্য বা সেবার দাম স্থির করে দিলে দামের অস্থিরতা দূর হয়। এরফলে উদ্যোগে লগ্নি সংক্রান্ত সমস্যা হ্রাস পায় ও উন্নয়ন ফলপ্রসূ হয়।

(v) **প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবন** (Technological Change and Innovation) : প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং সাথে সাথে মূলধনের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। এর ফলশ্রুতিতে মূলধনী ক্ষেত্রে লগ্নিও বৃদ্ধি পায়। আবার প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে নতুন পণ্য বা সেবা, নতুন পদ্ধতি বা নতুন বাজারের প্রবর্তন ঘটে যার জন্য অর্থনীতিতে আরও লগ্নির প্রয়োজন পড়ে। উদ্যোগ যেহেতু উদ্ভাবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তাই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবনও উদ্যোগ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্দীপক হিসাবে গণ্য হয়।

(vi) **একচেটিয়া সুবিধার বিলোপ ও প্রতিযোগিতাকে উৎসাহদান** (Abolition of monopoly and encouragement of competition) : একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে এধরনের কারবারি ক্ষেত্র উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। অবশ্য বর্তমানে ভারতবর্ষে একচেটিয়া কারবার চালানো আইনসিদ্ধ নয়। তবে কিছু কারবারি উদ্যোগ পেটেন্ট আইন অনুসারে কোনো নতুন উদ্ভাবনের একচেটিয়া অধিকার

17 বছর পর্যন্ত ভোগ করতে পারে। একচেটিয়া কারবারের বিলোপ ঘটলে নতুন নতুন উদ্যোগ ওই কারবারি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে। এর ফলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাওয়া যায়। সেকারণে এগুলিও উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

(vii) **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা** (Economic Planning) : দেশে একটি উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থাকে তাহলে শিল্পের একটি উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা ও সামাজিক মূলধন গঠন অনেকটা সহজ হয়। এর ফলে অর্থনীতিতে লগ্নির পরিমাণও বাড়ে এবং উদ্যোগ গঠন ত্বরান্বিত হয়। কাজেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রচেষ্টাও উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে উদ্যোগ গঠনে ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্দীপক উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে এবং তারা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উদ্যোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

5.5 উদ্যোগের সহায়তা ও দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব

উদ্যোগ হল সম্পূর্ণ নতুন কোনো ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত কারবারি প্রচেষ্টা যা আগে পরীক্ষিত হয়নি। তাই এটি ঝুঁকিবহুল। যেহেতু এক অজানা পথে কারবারি উদ্যোগকে গড়ে তুলতে হয় তাই এর প্রতি পদেই সমর্থন-এর প্রয়োজন হয়। যেসব ক্ষেত্রে এই সমর্থনের দরকার হয় তা হল সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে, বিপণনের ক্ষেত্রে ইত্যাদি। বিশেষ করে উদ্যোগ শুরু করার সময় পরামর্শ, উপদেশ, সাহায্য, সমর্থন ইত্যাদির খুব বেশি প্রয়োজন হয়। কারণ এসব থেকে বাস্তব তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় যা উদ্যোগ গড়ে তুলতে ও সঠিক পথে উদ্যোগকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দু-ধরনের সমর্থন খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এগুলি হল— (i) নৈতিক সমর্থন ও (ii) পেশাগত সমর্থন। নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

(i) **নৈতিক সমর্থন** (Moral support) : প্রত্যেক উদ্যোক্তার ক্ষেত্রেই একটি নৈতিক সমর্থন দেওয়ার দল বা গোষ্ঠী থাকা দরকার। নৈতিক সমর্থনকারী দল বলতে যারা ধাবাহিকভাবে উদ্যোক্তাকে উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে। এই কাজ সাধারণত করে পরিবারের সদস্যরা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব। এরা উদ্যোক্তার দুঃসময়ে ও একাকীত্বের সময় সাহস জোগায় ও মনোবল অটুট রাখার জন্য উৎসাহিত করে। সাধারণত উদ্যোগ গঠনের দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ায় এরা অন্তরাল থেকে উদ্যোক্তাকে সহায়তা দেয় বা সাহায্য করে। অধিকাংশ উদ্যোক্তারই অভিমত হল যে স্বামী/স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিই উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সমর্থন দেয়। কারণ তারা পরিবারকে সময় না দিয়ে উদ্যোক্তাকে উদ্যোগে বেশি সময় দেওয়ার অনুমতি দেয়।

পরিবারের সদস্যদের বাইরে বন্ধু-বান্ধবও উদ্যোক্তাকে নৈতিক সমর্থন জোগায়। তারা কেবলমাত্র পরামর্শই দেয় না, তারা উৎসাহ দেয়, বোঝায়, এমনকি সাহায্যও করে। উদ্যোক্তারা নির্দ্বিধায় বন্ধুদের উপর নির্ভর করতে পারে কারণ তাদের দিক থেকে সমালোচনার ভয় থাকে না। এছাড়া আত্মীয়স্বজনও

নৈতিক সমর্থনের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে কাজ করে বিশেষত যদি তাদের মধ্যে কেউ উদ্যোক্তা হয়ে থাকে। সেজন্য অনেক সফল উদ্যোক্তাকেই বলতে শোনা যায় যে পরিবারের সদস্যদের সমর্থনই তার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এই সমর্থকরাই বিভিন্ন সময়ে তাকে উৎসাহিত করে বিভিন্ন সঙ্কট ও সমস্যাকে মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।

(ii) **পেশাগত সমর্থন** (Professional support) : নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহদান উদ্যোগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তা কিন্তু যথেষ্ট নয়। নতুন উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের উপদেশ, পরামর্শ ইত্যাদির প্রয়োজন অনুভব করে। উদ্যোগ গঠনের খুঁটিনাটি বিষয়ে পরামর্শ পাওয়ার উৎসগুলি হল নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা বা মেন্টর, সহযোগী ব্যবসায়ী, বাণিজ্যিক সমিতি বা সংগঠন ইত্যাদি। এদের নিয়েই উদ্যোক্তার পেশাগত সমর্থক গড়ে ওঠে।

অধিকাংশ উদ্যোক্তাদেরই একজন **উপদেষ্টা** বা **মেন্টর** (mentor) থাকে। এদের সাথে উদ্যোক্তা উদ্যোগ-সংক্রান্ত সমস্যা ও সাফল্য নিয়ে আলোচনা করে ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম স্থির করে। একজন মেন্টর সাধারণত উদ্যোগ সংক্রান্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হন। তাদের উদ্যোগের মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধে অর্থাৎ আর্থিক, হিসাবরক্ষণ, বিপণন, আইন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকে এবং উদ্যোক্তার কী করা উচিত সেব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে।

পেশাগত সমর্থনের অন্য একটি উৎস হল উদ্যোগের সহযোগী বিভিন্ন ব্যক্তি বা উদ্যোক্তা। সাধারণত স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তি যাদের উদ্যোগ গঠনের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা, উদ্যোগের পণ্য ও সেবা ক্রয় করে এমন ক্রেতারা, পরামর্শদাতা, আইনজ্ঞ, হিসাবরক্ষক ও উদ্যোগের সরবরাহকারী, উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় পেশাগত সমর্থন দিয়ে থাকে। এদের মাধ্যমেই উদ্যোগের সুনাম গড়ে ওঠে কারণ তারা উদ্যোগের কথা বিজ্ঞাপনের (oral advertisement) কাজ করে।

উদ্যোগের কাঁচামাল **সরবরাহকারীরা** ও (Suppliers) উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত সমর্থক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। এদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে উদ্যোগের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্য সময়মতো পাওয়া সম্ভব হয়। এর ফলে উদ্যোগের উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় না। এছাড়াও এরা অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের তথ্যও সরবরাহ করে, যেমন—বাজারের গতিপ্রকৃতি, প্রতিযোগিতার মাত্রা ইত্যাদি।

উদ্যোগের পরামর্শদাতা ও সহযোগী ছাড়াও পেশাগত সমর্থনের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল বাণিজ্যিক সমিতি বা সংঘ (Trade association)। বাণিজ্যিক সংঘ উদ্যোগকে প্রতিষ্ঠিত হতে ও প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। বাণিজ্যিক সংঘ উদ্যোগ সংক্রান্ত এবং অনুরূপ শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে নৈতিক সমর্থন ও পেশাগত সমর্থন উদ্যোক্তাকে উদ্যোগ গঠনে উৎসাহিতই করে না সাথে সাথে উদ্যোগের উন্নয়নেও সাহায্য করে। এগুলি ছাড়াও উদ্যোগ গঠনে অন্যান্য যেসব

বিষয়ের প্রয়োজন হয় তাদের মধ্যে আর্থিক সমর্থন, বিপণন সংক্রান্ত সমর্থন, ঋণ সংক্রান্ত সমর্থন, প্রযুক্তিগত সমর্থন, সামাজিক ও পরিবেশগত সমর্থনও গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি ও বেসরকারি সমর্থন প্রক্রিয়ায় যেসব সংস্থা উদ্যোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করে তাদের নীচের চিত্রে প্রকাশ করা হল :

সংস্থা (Actors)	বিশ্ববিদ্যালয়	ইনক্যুবেটর	কারবার উন্নয়নে যুক্ত প্রতিষ্ঠান	সেবা প্রদানকারী	আর্থিক সংস্থা	অন্যান্যরা
দৃষ্টিভঙ্গি (Approach)	ব্যবসায়িক ভিত্তি	কারবারি পরিচালনা প্রতিযোগিতা	যৌথ উদ্যোগ	দীর্ঘকালীন স্থায়িত্বের নক্শা	সরকারি আর্থিক সংস্থা	

5.5.1 উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব

অর্থ (Meaning) ঃ উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব বলতে বোঝায় দীর্ঘকাল জুড়ে টিকে থাকা এবং দীর্ঘকালীন পণ্য ও সেবাদানের নিশ্চয়তা দেয় এ ধরনের উদ্যোগ। দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব বলতে বোঝায় বর্তমানের সম্পদকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা এবং দীর্ঘকালীন মেয়াদে কোনো উৎকৃষ্ট সমাধানের উন্নয়ন। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকালীন স্থায়ী উন্নয়নের (Sustainable development) সংজ্ঞা 1987 সালের ব্র্যান্ডল্যান্ড (Brandland) রিপোর্টের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়েছে 'যে উন্নয়ন বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণে বাধার সৃষ্টি করে না, তাই হল দীর্ঘকালীন স্থায়ী উন্নয়ন'। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দীর্ঘকালীন উদ্যোগ বলতে বোঝায়—আবিষ্কার, সৃষ্টি ও সুযোগের সদ্ব্যবহার যা সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক ও পরিবেশমূলক লাভ অর্জন করতে সমর্থ হয়। দীর্ঘকালীন স্থায়ী উদ্যোগ হল যে উদ্যোগ পরিচ্ছন্ন বা বিশুদ্ধ পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে সামাজিক মূল্য বৃদ্ধি করে এবং পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রেখে অর্থাৎ দূষণ না ঘটিয়ে কার্যকলাপ চালায়।

দীর্ঘকালীন উদ্যোগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Characteristic features of Sustainable Enterpreneurship) : এ ধরনের উদ্যোগের ক্ষেত্রে যেসব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দেখা যায় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

(i) সফল দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগ নতুন পণ্য ও সেবা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দেওয়ার সাথে সাথে সেগুলি যাতে পরিবেশের দূষণ না ঘটায় এবং সামাজিক সমস্যা তৈরি না করে সেদিকেও দৃষ্টি দেয়। পরিবেশ দূষণ ও সামাজিক সমস্যাও কারবারি সুযোগ হিসাবে গণ্য হতে পারে যদি সমস্যা সমাধানের জন্য যদি উন্নত কোনো ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যায় এবং এর দ্বারা অর্থনীতি সমাজ উপকৃত হয়।

(ii) একটি দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগ একটি নতুন কারবার গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে অথবা একটি চালু কারবারে নতুন কোনো পণ্য বা সেবা উপস্থাপনের মধ্য দিয়েও গড়ে উঠতে পারে।

(iii) দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগ সব ধরনের উদ্যোগের উপরই প্রভাব বিস্তার করতে পারে অর্থাৎ ক্ষুদ্র কারবার থেকে বহুজাতিক সংস্থাও এ ধরনের উদ্যোগ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

(iv) দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব প্রচেষ্টার প্রধান চালক হল উদ্যোক্তা এবং তার এই প্রচেষ্টা নতুন ও চালু সংস্থা সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। দীর্ঘস্থায়ী কারবারের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবনের।

(v) দীর্ঘকালীন উদ্যোগ সামাজিক মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজ করে। এজন্য তারা পরিচ্ছন্ন পণ্য বা সেবার উৎপাদন করে ও সরবরাহ করে। এগুলি স্বাস্থ্য সম্মত ও পরিবেশবান্ধব হয়। অর্থাৎ পরিবেশের অনবনমন যাতে না হয় সেজন্য এরা শক্তি সাশ্রয়কারী, দূষণ রোধকারী উৎপাদক প্রক্রিয়ার সহায়তা গ্রহণ করে।

(vi) দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগ সবসময়ই উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে উত্তরণের জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালায়। অর্থাৎ আরও উন্নতমানের পণ্য ও সেবা, উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি, উন্নত বন্টন ব্যবস্থা ইত্যাদির সন্ধান করে ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্থায়িত্ব বজায় রাখে।

(vii) এরূপ উদ্যোগ যেকোনো সামাজিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়, পরিবর্তনের থেকে উদ্ভুত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, নতুন কিছুর উদ্ভাবন করে, সম্পদের ব্যবহার আরও ভালোভাবে করে, ক্রেতাদের আর উন্নত পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করে এবং প্রতিনিয়ত উন্নত থেকে উন্নতর জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করে।

(viii) উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব তিনটি স্তম্ভের (Pillar) উপর নির্ভরশীল। এগুলি হল অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশ। তিনটি বিষয় তিনটি বৃত্তের মাধ্যমে প্রকাশ করলে দেখা যায় যে উদ্যোগী সংস্থা এর কেন্দ্রে রয়েছে। নীচে চিত্রাকারে বিষয়টি দেখানো হল :

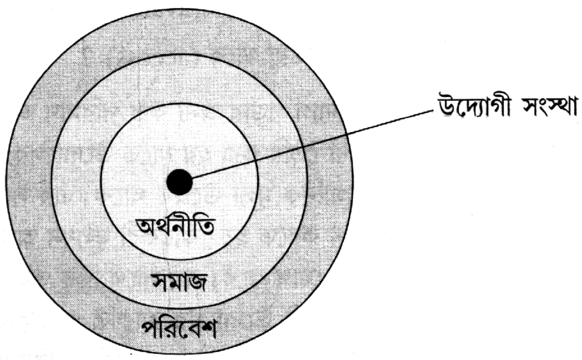

5.6 উদ্যোগে বিপণন সহায়তা

উদ্যোগ হল একধরনের প্রচেষ্টা যা নতুন কোনো পণ্য উৎপাদন ও সেবা সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। কিন্তু পণ্য বা সেবা উৎপাদন করাই উদ্যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। উদ্যোগের একটি বাণিজ্যিক দিকও রয়েছে তা হল উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য বা সেবা বিক্রয় করা খুব সহজ কাজ নয়। বিপণন এই কাজটি করে বলেই প্রতিটি উদ্যোগেই বিপণন সহায়তার প্রয়োজন হয়। উদ্যোগের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে সঠিক বিপণন ব্যবস্থার উপর। বিপণন তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে উদ্যোগকে প্রথমত অস্তিত্ব রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে উদ্যোগের উন্নয়নে ও সম্প্রসারণে সাহায্য করে। কাজেই উদ্যোক্তার পণ্য বা সেবা বিপণন সংক্রান্ত ধারণা থাকা আবশ্যক।

সাধারণভাবে ও সংক্ষেপে বিপণন বলতে বোঝায় উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বাজারজাতকরণ বা বাজারে ক্রেতাদের কাছে উপস্থাপন। তবে পণ্য বা সেবা বাজারে উপস্থাপন করলেই সেগুলি বিক্রয় হয় না যদি না বিক্রয় প্রচেষ্টা থাকে। এই বিক্রয় প্রচেষ্টাই হল বিপণনের অংশবিশেষ। বিপণনের অনেক সংজ্ঞা রয়েছে, যার মধ্যে একটি সহজবোধ্য সংজ্ঞা হল—'বিপণন হল সেই সকল ব্যবসায়িক কার্যকলাপ যা পণ্য বা সেবাকে উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে নিয়ে যায়।' অন্য একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'বিপণন হল পণ্য, সেবা বা ধারণার পরিকল্পনা ও রূপায়ণ, দাম নির্ধারণ, বিক্রয় সম্প্রসারণ ও বণ্টন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া যার ফলে বিনিময়ের উদ্ভব হয় এবং ক্রেতার সন্তুষ্টি ও সংস্থার লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়।' অন্য একটি সংজ্ঞায় বিপণন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, 'বিপণন হল জনগণের চাহিদা নির্ধারণ করা, সৃষ্টি করা এবং পূরণ করা, আর এসবের মধ্য দিয়ে মুনাফা অর্জন করা'। উদ্যোগে বিপণন সহায়তার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে ঐতিহাসিক **টয়েনবী**-র একটি উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, "মানুষের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী স্মরণীয় হয়ে থাকবে পারমাণবিক বোমা ফাটানোর জন্য নয়, সভ্যতার সুফল মানবজাতির দরজায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। উৎপাদিত পণ্য ও সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে বিপণন। তাই দার্জিলিংয়ে-এর চা পান করছে রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকার লোকেরা। চীন ও জাপানে তৈরি যন্ত্রপাতি আজ বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ ব্যবহার করছে, মিশরের তুলায় তৈরি বস্ত্র ব্যবহার করছে বিভিন্ন দেশের মানুষ। এসবই বিপণনের দান।" একটি উদ্যোগের সাফল্য ও ব্যর্থতার পিছনে বিপণনের ভূমিকাই সর্বাধিক। বিপণন সহায়তা ছাড়া উদ্যোগ কখনোই সফল হতে পারে না কারণ উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিক্রয় হল সাফল্যের পূর্বশর্ত। বিপণন উৎপাদিত পণ্য বা সেবার চাহিদা সৃষ্টি করে এবং বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রেতাদের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। তাই বলা হয় বিপণন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা সম্ভাব্য ক্রেতাদের প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা অনুযায়ী পণ্য পরিকল্পনা করে, উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে ও বিক্রয়োত্তর পরিষেবা দানের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টিবিধান করে। সুতরাং বিপণন কেবলমাত্র বিক্রয় করা নয়, এর উদ্দেশ্য হল ক্রেতাসন্তুষ্টি।

বিপণন সহায়তা (Marketing assistance)

কারবারি উদ্যোগের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়ন নির্ভর করে বিপণন সাফল্যের উপর। কারণ বর্তমান কারবারি জগতে প্রতিটি উদ্যোগকেই তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিক্রয় করা অত্যন্ত জটিল। এদের সহায়তা করার জন্য, বিশেষত অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে সরকারি উদ্যোগ **জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প নিগম** (NSIC—National Small Industries Corporation Ltd.) গড়ে তোলা হয়েছে। 1955 সালে এটি গঠিত হয় এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে এটি কাজ করে। বিগত 60 বছরের অধিক সময়কালে ক্ষুদ্র শিল্পের আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, গুণগত মান বজায় রাখার জন্য সচেতনতা, রপ্তানি সহায়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই কোম্পানি সহায়তা দিয়ে আসছে। সারা ভারত জুড়ে এর 6টি আঞ্চলিক অফিস, 26টি শাখা অফিস, 15টি আধা-অফিস, 5টি প্রযুক্তিগত সেবাদান কেন্দ্র, 3টি বর্ধিত কেন্দ্র ও 2টি সফটওয়্যার টেকনলজি পার্কের মাধ্যমে কোম্পানি ক্ষুদ্র উদ্যোগে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে। এই সহায়তার মধ্যে রয়েছে বিপণন সহায়তা, ঋণ সহায়তা, প্রযুক্তিমূলক সহায়তা ও অন্যান্য সহায়তা। NSIC ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উদ্যোগে বিপণন সহায়তা দেওয়ার জন্য যেসব প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

(i) **সংঘ গঠন ও দরপত্র বিপণন** (Consortium and tender marketing) : ক্ষুদ্রায়তন কারবারি উদ্যোগগুলি বেশি পরিমাণ পণ্যের ফরমাশ সংগ্রহ করতে ও ফরমাশ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করতে পারে না, কারণ তাদের সামর্থ্য নেই। এর ফলে তাদের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই NSIC এই অসুবিধা দূর করার জন্য একই ধরনের পণ্য উৎপাদন করে এধরনের সংস্থাগুলিকে নিয়ে একটি সংঘ (consortium) গড়ে তোলে। NSIC নতুন বাজার আবিষ্কার করে এবং বেশি পরিমাণে ফরমাশ সংগ্রহ করে। পরবর্তী পর্যায়ে এই ফরমাশ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সামর্থ্য অনুযায়ী ভাগ করে দেয়। এর ফলে তাদের পক্ষে উৎপাদন ও বিপণন সহজ হয়ে ওঠে।

(ii) **সরকারি ক্রয়ের জন্য নিবন্ধনের একটিমাত্র জানালা** (Single window registration for government purchase) : সরকারকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিশাল পরিমাণে ক্রয় করতে হয়। NSIC-তে যেসব উদ্যোগ নিবন্ধিত থাকে তাদের সরকারি ফরমাশ পেতে অসুবিধা হয় না, কারণ তারা ফরমাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় এবং বাধ্যতামূলক জমার (earnest money) ক্ষেত্রেও ছাড় পায়। নিবন্ধিত উদ্যোগী সংস্থাগুলি NSIC-তে নিবন্ধনের কারণে যেসব সুবিধা পায় সেগুলি হল নিম্নরূপ-

(ক) বিনামূল্যে দরপত্র পায়;

(খ) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে আগাম জ্ঞাতকরণ;

(গ) বাধ্যতামূলক জমার ক্ষেত্রে ছাড়;

(ঘ) ফরমাশের পরিমাণ উদ্যোগের সামর্থ্যের বাইরে হলে যোগ্যতার শংসাপত্র।

(iii) **প্রদর্শনী ও বাণিজ্য মেলা** (Exhibition and trade fair) : ভারতীয় উদ্যোক্তাদের যোগ্যতা তুলে ধরতে এবং বাজারের সুযোগ কাজে লাগাতে NSIC প্রতি বছর কতকগুলি নির্বাচিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রদর্শনী ও বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে। এই মেলা ও প্রদর্শনীতে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে স্টল খোলে এবং এই স্টলের ভাড়ার ক্ষেত্রেও তারা অনেক সুবিধা পায়। এইসব মেলা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে উদ্যোগী সংস্থা তাদের পণ্য ও দক্ষতা বিদেশের ও স্বদেশের কারবারিদের কাছে তুলে ধরতে পারে। এর ফলে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বাজার যেমন প্রসারিত হয় তেমনি সংস্থার সুনামও বৃদ্ধি পায়।

(iv) **ক্রেতা-বিক্রেতা সাক্ষাৎ** (Buyer-seller meet): বেশি পরিমাণ দ্রব্য একসাথে ক্রয় করে এমন ক্রেতা এবং বিভাগীয় ক্রেতা যেমন— ভারতীয় রেল, প্রতিরক্ষা বিভাগ, যোগাযোগ বিভাগ এবং বড়ো বড়ো কোম্পানিদের ক্রেতা-বিক্রেতা সাক্ষাৎ-এর জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। এই সাক্ষাৎ-এর মাধ্যমে তারা ছোটো ছোটো উদ্যোগের পণ্যের উৎকর্ষ, কৃৎ-কৌশল, গুণগত মান ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিহিত হয় এবং পণ্যের নতুন বাজার গড়ে ওঠে।

(v) **পণ্য রপ্তানি** (Export of products): NSIC একটি অনুমোদিত রপ্তানি সংস্থা। এরা ভারতের ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদিত পণ্য অন্য দেশে রপ্তানি করে। যেসব পণ্যের রপ্তানি NSIC করে থাকে সেগুলি হল—

(ক) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, চামড়ার তৈরি জিনিসপত্র, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য তৈরির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পাইপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম, নির্মাণকাজের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার ইত্যাদি; এবং

(খ) পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার উৎপাদিত পণ্য।

5.7 উদ্যোগে প্রযুক্তিমূলক সহায়তা

প্রযুক্তিই হল বর্তমান সভ্যতার ধারক ও বাহক। আদিম মানুষের উত্তরণ শুরু হয়েছিল প্রযুক্তির হাত ধরেই এবং এর বীজ নিহিত রয়েছে বিভিন্ন আবিষ্কারের মধ্যে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের সাথে সাথে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এভাবেই নানা আবিষ্কার ঘটেছে যা মানুষের বিবিধ সমস্যা সমাধান করে তাদের জীবনমান উন্নত করেছে। বিজ্ঞান নতুন কিছু আবিষ্কার করে এবং এই আবিষ্কার যখন বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় তখনই জন্ম নেয় প্রযুক্তি অর্থাৎ প্রযুক্তির জনক হল বিজ্ঞান। তাই হয়েছে, মানুষের জীবন। আর মান উন্নত হয়েছে। এই প্রযুক্তির দৌলতেই বিশ্বব্যাপী শিল্পবিপ্লব, ভারতের মতো দেশে সবুজ বিপ্লব ঘটেছে। তাই প্রযুক্তিকেই উন্নয়নের দিশারি বলা হয়। এই প্রযুক্তির হাত ধরেই আজ মানবজাতি 'ডিজিট্যাল যুগে' প্রবেশ করেছে। প্রযুক্তি ছাড়া বর্তমানে এক পা-ও অগ্রসর হওয়া মুশকিল। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনযাত্রা আজ প্রযুক্তি নির্ভর।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে উদ্যোগের সাফল্যের মূলেও রয়েছে প্রযুক্তি। এর সাহায্যেই উদ্যোগ তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারেও প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করতে পারে। উদ্যোগের কেবলমাত্র অর্থ,

বিপণন ও দৈনন্দিন কাজকর্ম সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কৌশল চূড়ান্ত করলেই হয় না, সাথে সাথে কারবারি পরিবেশ, ক্রেতা এবং সরবরাহকারীদের সাথে সংহতি স্থাপন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। NSIC (National Small Industries Corporation Ltd.) উদ্যোগকে প্রযুক্তিগত সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি চালায় এবং এজন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে **প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র ও বর্ধিত কেন্দ্র** গড়ে তুলেছে। উদ্যোগে সাধারণত যেসব প্রযুক্তিমূলক সহায়তা দেওয়া হয় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল :

(i) নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময় পরামর্শ ও উপদেশ;

(ii) উপযুক্ত পরীক্ষাগারে কাঁচামাল পরীক্ষা করার সুবিধা ;

(iii) পণ্যের নক্শা তৈরি করে দেওয়া;

(iv) মেসিনপত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্য;

(v) কতকগুলি নির্বাচিত কেন্দ্রে শক্তি ও পরিবেশের সুবিধা;

(vi) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এগুলি ছাড়াও NSIC নিম্নলিখিত প্রযুক্তিমূলক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোগকে সাহায্য করে।

(ক) **তথ্যসংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান** (Informediary services) : উদ্যোগের সাফল্যের ক্ষেত্রে তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান যুগে তথ্যই হল আসল শক্তি যার উপর ভিত্তি করে কারবারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত। তাই তথ্যের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে NSIC বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ করে। যেসব তথ্য এই সংস্থা তার পোর্টালের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সরবরাহ করে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) সরবরাহকারীদের তথ্যাবলি;

(ii) বাজার সংক্রান্ত তথ্যাবলি;

(iii) প্রযুক্তি সরবরাহকারীদের তথ্যাবলি;

(iv) তথ্য সরবরাহকারীদের তথ্যাবলি;

(v) সমজাতীয় উদ্যোগ সংক্রান্ত তথ্যাবলি ইত্যাদি।

(খ) **সফওয়্যার টেকনোলজি পার্ক** (Software Technology Pary) : 100 শতাংশ সফ্টওয়্যার রপ্তানি-নির্ভর উদ্যোগ স্থাপনের জন্য এধরনের পার্কে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। NSIC সফ্টওয়্যার রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করে এবং তাদের মাধ্যমেই বিদেশে সফ্টওয়্যার রপ্তানি করা হয়। এই প্রকল্পটি ভারত সরকারের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন উদ্যোগ এর মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত সফ্টওয়্যার বিদেশে রপ্তানি করে ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা আনতে সাহায্য করে।

(গ) **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পার্ক** (Science and Technology Park) : উদ্ভূত প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ ধারণাকে উপযুক্ত পরিবেশে পালন করলে তবেই তা বাণিজ্যিক লগ্নির উপযোগী হয়। কাজেই

এজন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত পরিবেশ সম্পন্ন পালন কেন্দ্র (incubation centre)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পার্কে প্রযুক্তি ও জ্ঞান নির্ভর উদ্যোগ ধারণাকে পরিণত করা হয় এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসাবে গড়ে তোলা হয়। 2004–05 সালে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের তত্ত্বাবধানে NSIC রাজকোটে একটি এধরনের পার্ক তৈরি করেছে।

(ঘ) **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা** (International Co-operation) : NSIC ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্যবসায়িক লেনদেনকে গুরুত্ব না দিয়ে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য NSIC বেশি আগ্রহী। সেকারণে বিভিন্ন উদ্যোগ যাতে উপকৃত হয় সেজন্য বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ভালো অভিজ্ঞতা ও কাজগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে NSIC উদ্যোগগুলিকে যে সহায়তা প্রদান করে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) অন্যান্য দেশের সাথে কারবারি ও প্রযুক্তি বিষয়ের বিনিময়;

(ii) নতুন বাজার আবিষ্কার ও সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রের অনুসন্ধান;

(iii) নতুন বৈদেশিক বাজার সনাক্তকরণ ও ওইসব দেশে পণ্যের প্রদর্শনী;

(iv) ভারতীয় উদ্যোগ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অন্যান্য দেশের সাথে ভাগ করে নেওয়া ইত্যাদি।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণ হয় যে ভারতে বিভিন্ন উদ্যোগকে সাহায্য ও সহায়তা করার ক্ষেত্রে NSIC একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

5.8 সারাংশ

এই এককটি থেকে যে সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল সে হল উদ্দীপনা মানুষের অন্তর্নিহিত আবেগ যা তাকে আত্মনির্ভর হতে শেখায়, নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি করে ও তাঁর সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। উদ্যোগ গঠনে শুধু ব্যক্তিগত উদ্দীপনা কাজ করে না, সরকারী উদ্দীপনাও সাহায্য করে যা উদ্যোগের সহায়তা ও দীর্ঘকালীন স্থায়িত্বকে বজায় রাখতে সাহায্য করে।

5.9 প্রশ্নাবলি

(ক) এম সি কিউ প্রশ্নাবলি :

1. উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্দীপক হিসাবে নিম্নলিখিত কোন্‌টি বিবেচিত হয় না?

(ক) আত্মনির্ভর হওয়ার ইচ্ছা (খ) সামাজিক অবদান

(গ) সুদের হার কমানো (ঘ) অধিক মুনাফা অর্জন

2. নিম্নলিখিত কোনটি সরকারি উদ্দীপকের বিষয়সমূহ—
   (ক) সুদের হার কমানো (খ) কর হ্রাস
   (গ) সরকারি ব্যয় (ঘ) সবকটি
3. উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়ত্বি যে তিনটি স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল সেগুলি হল—
   (ক) অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশ (খ) অর্থনীতি, ব্যক্তিগত মুনাফা, কর্মী নিয়োগ
   (গ) সমাজ, পরিবেশ ও কর্মী নিয়ন্ত্রণ (ঘ) পরিবেশ, কর্মী নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফা অর্জন
4. ব্যক্তির মানসিক বাধা দূর করে তাকে ক্রিয়াশীল ও কাজে উৎসাহিত করার উদ্যোগের ক্ষেত্রকে কী বলে?
   (ক) মনোবল (খ) উৎসাহদান
   (গ) উদ্দীপনা (ঘ) সবগুলি
5. উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কোন্‌টি উদ্দীপনার ধরণ বলে গণ্য হয়?
   (ক) অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত (খ) পরিবেশগত
   (গ) বাজ্যিক (ঘ) (ক) ও (খ) দুটিই

উত্তর: 1. (গ) 2. (ঘ) 3. (ক) 4. (গ) 5. (ঘ)

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. উদ্যোগ গঠনে চারটি ব্যক্তিগত উদ্দীপকের উল্লেখ কর।
2. উদ্যোগ গঠনে চারটি সরকারি উদ্দীপকের উল্লেখ কর।
3. উদ্যোগ গড়ে তুলতে গেলে কি ধরনের সমর্থন প্রয়োজন হয়?
4. উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন কী?
5. উদ্যোগের ক্ষেত্রে পেশাগত সমর্থন বলতে কী বোঝায়?
6. উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব বলতে কী বোঝেন?
7. দীর্ঘকালীন উদ্যোগের দুটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(গ) দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. উদ্যোগজনিত সৃজনশীল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
2. উদ্যোগে সৃজনশীলতাও উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা কী?
3. উদ্যোগ গঠনে ব্যক্তিগত উদ্দীপনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
4. উদ্যোগ গঠনে সরকারি উদ্দীপনা সম্পর্কে ধারণা দিন।
5. উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
6. উদ্যোগে বিপণন সহায়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
7. উদ্যোগে প্রযুক্তিগত সহায়তাগুলি কী কী সে সম্পর্কে ধারণা দিল।

একক–6 : কারবারি ধারণার উৎসসমূহ এবং সম্ভাব্যতা [Sources of Business Ideas and Tests of Feasibility]

6.0 উদ্দেশ্য

6.1 প্রস্তাবনা

6.2 কারবারি ধারণার উৎসসমূহ

6.3 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব

6.3.1 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাবের তাৎপর্য

6.3.2 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

6.4 কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়ন

6.4.1 কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া প্রণয়নের নীতিসমূহ

6.5 উদ্যোগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা

6.5.1 ধারণা

6.5.2 সম্ভাব্যতা পরীক্ষার উপাদানসমূহ

6.5.3 সম্ভাব্যতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ

6.6 নিয়ন্ত্রণ

6.6.1 নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

6.6.2 নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

6.6.3 কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ

6.7 প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়ন

6.8 সারাংশন

6.9 প্রশ্নাবলি

6.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন—

- কারবারি ধারণার উৎসসমূহ
- কারবারি পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব
- কারবারের কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়ন

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP Book/ NEC-MG-03 (Entrepreneurship Development)
Unit- 1-8 \ 1st Proof \ (Dt. 12.03.2025)

- উদ্যোগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা
- নিয়ন্ত্রণ
- পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়ন

6.1 প্রস্তাবনা

কারবারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে একটি ধারণার উপর যার মধ্যে সৃজনশীলতা, নতুনত্ব এবং উদ্ভাবন থাকে। ধারণা বলতে বোঝায় নতুন কোনো সুযোগ যা কাজে লাগিয়ে একটি উদ্যোগ গড়ে ওঠে। তাই যে কোনো উদ্যোগের পূর্বশর্তই হল ধারণার সনাক্তকরণ ও যে ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে তাকে চিহ্নিতকরণ। ধারণার উপর ভিত্তি করেই একটি কারবারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে। কারবারি ধারণা বিভিন্ন উৎস থেকে উপলব্ধ হতে পারে। এই একক থেকে কারবারি ধারণার বিভিন্ন উৎসসমূহ এবং সম্ভাব্যতা পরীক্ষা সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন।

6.2 কারবারি ধারণার উৎসসমূহ

কারবারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে একটি ধারণার উপর যার মধ্যে সৃজনশীলতা, নতুনত্ব এবং উদ্ভাবন থাকে। ধারণা বলতে বোঝায় নতুন কোনো সুযোগ যা কাজে লাগিয়ে একটি উদ্যোগ গড়ে ওঠে। তাই যে কোনো উদ্যোগের পূর্বশর্তই হল ধারণার সনাক্তকরণ ও যে ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে। ধারণার উপর ভিত্তি করেই একটি কারবারি উদ্যোগ বা সংস্থা গড়ে ওঠে। কারবারি ধারণা বিভিন্ন উৎস থেকে উপলব্ধ হতে পারে এবং এই উৎস দু-ধরনের—**অভ্যন্তরীণ উৎস** ও **বাহ্যিক উৎস**।

নীচে ধারণার বিভিন্ন উৎসগুলি তুলে ধরা হল :

(i) ক্রেতাদের সম্ভাব্য চাহিদা বা প্রয়োজন সংক্রান্ত জ্ঞান;

(ii) বাজারে কতকগুলি পণ্যের চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করা;

(iii) বিকল্প কোনো পণ্য উৎপাদনের সুযোগ;

(iv) কোনো পরিচিত উদ্যোক্তা বা বন্ধু বা আত্মীয়-এর কারবারি সাফল্যের বিবরণ;

(v) যেসব বাণিজ্যিক মেলা বা প্রদর্শনীতে নতুন পণ্য প্রদর্শন করা হয় সেখানে পরিদর্শন করা;

(vi) সরকারি প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা;

(vii) কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত কোনো ধারণা;

(viii) সরকারি নীতি, ছাড়, উৎসাহ দান ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং যে সব পণ্য কেবলমাত্র ক্ষুদ্রায়তন কারবারি ক্ষেত্রেই উৎপাদিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকে;

(ix) প্রতিযোগী উৎপাদক যখন কোনো নতুন পণ্য বাজারে নিয়ে আসে;

(x) উদ্যোক্তা নিজস্ব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোনো ধারণার সন্ধান পেলে।

সংক্ষেপে একজন ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তা তার কারবার গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে পারে। কারণ উদ্যোগ গঠনের প্রথম কাজটি শুরু হয় ধারণার উন্মেষ বা সনাক্তকরণের মধ্য দিয়ে। এই ধারণার উৎসগুলিকে অন্যভাবে বলতে গেলে, তারা হল **ক্রেতা বা ভোক্তা, বর্তমান পণ্য বা সেবা যেগুলি বাজারে পাওয়া যায়, পণ্য-বণ্টন প্রণালী, সরকারি আধিকারিক এবং গবেষণা ও উন্নয়ন**। এদের সম্বন্ধে নীচে সংক্ষেপে ধারণা দেওয়া হল।

(i) ক্রেতা বা ভোক্তা (Consumers) : ক্রেতা বা ভোক্তা ছাড়া কোনো কারবারের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। ক্রেতারাই তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য পণ্য বা সেবা ক্রয় করে। আর ক্রেতাদের মানসিকতা হল যে তাদের রুচি, পছন্দ, আকাঙ্ক্ষা সদা পরিবর্তনশীল। সে কারণেই একজন উদ্যোক্তা জানতে চায় যে ক্রেতারা প্রকৃতই কোন্ ধরনের পণ্য বা সেবা পেতে চায় যাতে উদ্যোক্তা ঠিক তাদের পছন্দমতো পণ্য বা সেবা তৈরি করতে ও যোগান দিতে পারে।

(ii) বর্তমান পণ্য ও সেবা (Existing Product and Service) : বাজারে প্রচলিত অর্থাৎ বর্তমান পণ্য ও সেবার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাদের অন্তর্নিহিত অসুবিধা বা ঘাটতি অনুধাবনের মাধ্যমেও নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ প্রচলিত পণ্য বা সেবার ঘাটতিগুলি দূর করে আরো ভালোভাবে ক্রেতাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য পণ্য বা সেবার উন্নয়ন করাও একটি কারবারি ধারণা এবং এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। এভাবেই প্রচলিত পণ্য বা সেবাও বাণিজ্যিক ধারণার উৎস হতে পারে।

(iii) পণ্য বা সেবার বণ্টন প্রণালী (Distribution Channel) : পণ্য বা সেবার বণ্টন প্রণালীকে মধ্যস্থ কারবারি হিসাবে গণ্য করা হয়। এসব মধ্য কারবারিরা উদ্যোক্তাদের কাছে নতুন ধারণার উৎস হিসাবে গণ্য হয়। এর কারণ হল যে তারা চূড়ান্ত ভোগকারীদের সাথে যুক্ত এবং এর ফলে তাদের চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দ, প্রয়োজন ইত্যাদি অনেক ভালোভাবে জানতে পারে। এ কারণেই পাইকার ও খুচরা কারবারিরা পণ্য বা সেবার কাম্য উন্নয়ন ও পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারে। এর উপর ভিত্তি করে কারবারি তার পণ্য বা সেবার উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটায়।

(iv) সরকার (Government) : সরকারও নতুন পণ্য বা সেবা সংক্রান্ত ধারণার উৎস হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন সময়ে সরকার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশ ঘোষণা করে যার ফলে অনেক পণ্য অপ্রচলিত বা বাতিল হয়ে পড়ে। এরূপক্ষেত্রে একজন উদ্যোক্তা বিকল্প পণ্য উৎপাদনের দিকে ঝোঁকে। উদাহরণস্বরূপ, সরকার পলিথিন ব্যাগ তৈরির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে পাটজাত ব্যাগের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও অনেক সময় সরকার পেটেন্ট বিক্রয় করে পেটেন্ট অনুসারে পণ্য উৎপাদন করার অনুমতি দেয়। এগুলিও নতুন ধারণার উৎস হিসাবে গণ্য হয়। এগুলি ছাড়াও কিছু সরকারি সংস্থা রয়েছে যারা উদ্যোগ স্থাপন ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে, যেগুলি বাণিজ্যিক ধারণা হিসাবেও গণ্য হয়।

(v) গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and development) : গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপও

কারবারি ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিছু আধুনিক শিল্প যেমন ঔষধ, পেট্রো-রসায়ন, সফটওয়্যার ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যকলাপ ধারাবাহিকভাবে চালানো হয়। এর ফলে যে নতুন আবিষ্কার বা উদ্ভাবন ঘটে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসাবে গণ্য হয়। গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যকলাপের মাধ্যমে ক্রেতাদের পছন্দসই ও প্রয়োজন উপযোগী পণ্য বা সেবার উৎপাদন ও যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে প্রচুর নতুন কারবারি সংস্থা গড়ে উঠেছে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যকলাপের প্রাপ্ত ফলাফলের উপর। বস্তুত পণ্য ও সেবার বিভিন্ন ধারণা গবেষণা ও উন্নয়নের সামগ্রিক ফল হিসাবেই গণ্য হয়।

ধারণার উপরোক্ত উৎসগুলি থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় তার যদি বাণিজ্যিক সম্ভাবনা না থাকে তাহলে ধারণা নিরর্থক হয়ে পড়ে। উৎস যাই হোক না কেন ধারণার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা থাকা একান্তভাবে আবশ্যক।

6.3 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব

অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition) : সাধারণ কথায় কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব হল কারবারের উদ্যোক্তা কী করতে চায় সে সংক্রান্ত একটি লিখিত প্রতিবেদন। একটি নতুন উদ্যোগ বা সংস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কারবার পরিকল্পনা ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে গণ্য হয়। কারবার পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রস্তাব সমার্থক অর্থাৎ একই। সে কারণে উদ্যোগ উন্নয়নের প্রমাণ্য গ্রন্থে কারবার পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রস্তাব উভয়ই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ একের বদলে অন্যটির ব্যবহার দেখা যায়।

কারবার পরিকল্পনা হল কারবারের পথ প্রদর্শক বা যা করা হবে তার তালিকা। এতে কারবারের উদ্যোক্তা কী করতে চায় এবং কীভাবে করতে চায় তার বিবরণ উল্লেখ থাকে। অন্যভাবে বলা যায় উদ্যোক্তা তার লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যে পথ ধরে চলতে চায় এটি তার সারণি। এই প্রতিবেদনে যেমন লক্ষ্য স্থির করা হয় তেমনি লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী কী কাজ করতে হবে, কখন করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে সে ব্যাপারে আগাম কার্যসূচি লিপিবদ্ধ থাকে।

ওয়েবস্টার অভিধান (Websters Dictionary) প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে 'একটি প্রকল্প হল একটি কর্মসূচি, নক্‌শা ও কোনো কিছু করতে চাওয়ার প্রস্তাব'।

মার্ক জে. ডোলিঙ্গার (Marc J. Dollinger) কারবার পরিকল্পনার সংজ্ঞায় বলেছেন যে কারবার পরিকল্পনা হল উদ্যোক্তার লক্ষ্যপূরণের বিধিসন্মত লিখিত বক্তব্য যাতে প্রস্তাবিত উদ্যোগের কৌশল ও কাজের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

জ্যাক. এম. কাপলান (Jack. M. Kaplan) কারবার পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে 'কারবার বা উদ্যোগ পরিকল্পনা বলতে বোঝায় একটি লিখিত দলিলের উন্নয়ন যা উদ্যোগের চলার পথের দিশা দেখায়, যা থেকে বোঝা যায় যে কারবার এখন কোথায় আছে, কোথায় যেতে চায় এবং কীভাবে

যেতে চায় এবং কীভাবে যেতে চায়'।

কাজেই ব্যবসার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, এটি হল প্রস্তাবিত উদ্যোগের কর্মসূচি যা অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করা হয় এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কাজেই কারবার পরিকল্পনা হল একটি কার্যনির্বাহী দলিল।

6.3.1 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাবের তাৎপর্য

গবেষণার মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে অনেক নতুন কারবারিই কোনো কারবার পরিকল্পনা ছাড়াই কারবার শুরু করে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে তারা তাদের কারবারি ধারণার রূপায়ণ কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই শুরু করে। কিন্তু কালক্রমে এই উদ্যোক্তারা বুঝতে পারে যে কারবারি পরিবেশ ও পথ অত্যন্ত বন্ধুর। তাই তারা অনুধাবন করে যে তাদের শুরু নতুন করে পুনর্গঠন করা দরকার এবং একটি পথ নির্দেশিকা বা রোড ম্যাপ থাকা দরকার। কাজেই প্রথমে না হলেও পরবর্তীকালে তারা একটি কারবার পরিকল্পনা তৈরি করে। আর এখানেই কারবার পরিকল্পনা তথা প্রকল্প প্রস্তাবের তাৎপর্য বোঝা যায়।

লিখিত আকারে কারবার পরিকল্পনা তৈরির পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এর বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হল যে এতে কারবারের ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। কারণ কারবার তৈরি করার জন্য বাইরের পরামর্শদাতা বা হিসাবরক্ষক বা উকিল ভাড়া করতে হয় এবং তাদের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরি না হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হল যে কারবার গড়ে ওঠার আগেই সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তবে লিখিত কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করার পিছনে প্রধান যুক্তি হল যে এটি উদ্যোক্তাদের উদ্বেগ ও মানসিক চাপ কমাতে ও কারবার গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়া এ ধরনের পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে গণ্য হয় এবং যে সব উদ্যোক্তা বাহ্যিক উৎস যেমন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে কারবার চালাতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা কারবার পরিকল্পনা থেকে কারবারের ভবিষ্যৎ সাফল্যের ধারণা পায় ও সন্তুষ্ট হলে উদ্যোগে ঋণ দিতে সম্মত হয়। অন্যথায় ঋণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। একথা ঠিক যে কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করার জন্য কিছু অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু এর থেকে যে সুবিধা পাওয়া যায় তার নিরিখে ব্যয় অকিঞ্চিৎকর।

কারবারের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এবং লক্ষ্য ছাড়া কারবার গঠন করতে যাওয়া দিবা স্বপ্নের নামান্তর। যদি কাগজে এই লক্ষ্য ও লক্ষ্যপথ লিপিবদ্ধ করা না হয় তাহলে তা অনেকাংশে মাটি ছাড়া বীজ বা কেবলমাত্র ইচ্ছার সাথে তুলনা করা যায়, যা রূপায়ণযোগ্য নয় এবং রূপায়ণ ছাড়া কোনো ফলেরও আশা করা যায় না। সে কারণেই কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব উদ্যোক্তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি কারবার পরিকল্পনা দু-ধরনের অপরিহার্য কাজ করে থাকে। **প্রথমত** এবং যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল এটি কারবারের পথপ্রদর্শকের কাজ করে। এর থেকে যে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় সেগুলি হল কোন দিকে বা দিশায় কারবারি সংস্থাটি অগ্রসর হচ্ছে, এর লক্ষ্য কী এবং কোথায় যেতে চায় এবং কীভাবে

গেলে লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হবে। এছাড়াও এর মাধ্যমেই উদ্যোক্ত জানতে পারে যে সে সঠিক দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মত হল যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া উদ্যোক্তা কারবারে অগ্রসর হলে দেখা যায় যে তাদের পথ অত্যন্ত কঠিন ও দুর্গম হয়ে পড়েছে।

কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রতিবেদনের **দ্বিতীয়** কাজটি হল যে বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতাদের আকর্ষণ করা। যদিও এটি তৈরি করা ছোটো কারবারের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয় তবুও এর ব্যবহারিক কার্যকারিতা ও অন্যান্য সুবিধার জন্য এটি তৈরি করা প্রয়োজনীয়। বিশেষত যে সব ক্ষুদ্র কারবারি সংস্থা ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটি তৈরি করা বাধ্যতামূলক। কারণ এই প্রতিবেদন বা পরিকল্পনার দলিল বিশ্লেষণ করেই এইসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ-দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অর্থাৎ এই দলিলের উপর ভিত্তি করেই কারবারি সংস্থার ঋণযোগ্যতা নির্ধারিত হয়। এছাড়াও যারা নতুন উদ্যোগে বীজ মূলধন সরবরাহ করে, কাজের জায়গা দেয় বা কাঁচামাল সরবরাহ করে তারাও জানতে চায় যে কারবারের ভবিষ্যৎ কীরূপ। কাজেই ঋণ সংগ্রহ করতে বা বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতে কারবার পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই।

পরিশেষে কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরা যায়। এই বক্তব্যে বলা হয়েছে যে "যদি একজন উদ্যোক্তা তার কারবার পরিকল্পনা লিখিত আকারে তৈরি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে তার কারবারের ব্যর্থতার পরিকল্পনা করে" (*"If an entrepreneur fails to write business plan, he plans to fail in his/her business"*)।

6.3.2 কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

নতুন উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রতিবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর কোনো বিকল্প হয় না। আবার একটি ভালোভাবে কারবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কোনো সরল ও সহজ রাস্তা নেই। একটি সুন্দর ও সম্পূর্ণ কারবার পরিকল্পনা বাইরের বিভিন্ন পক্ষের আস্থা অর্জনের সহায়ক হয় এবং কারবার চালাতে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা সহজেই পাওয়া যায়। সেকারণেই একটি কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রতিবেদন যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার সাথে এবং সবদিক বিবেচনা করে প্রস্তুত করতে হয়। সাধারণত একটি ভালো প্রকল্প প্রস্তাব বা কারবার পরিকল্পনার মধ্যে নীচের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(i) সাধারণ জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ (General Information) : সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি হল পণ্য তালিকা ও পণ্যের বিশদ বিবরণ। অর্থাৎ যেসব পণ্য উৎপাদন করা হবে তাদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ।

(ii) প্রবর্তক বা উদ্যোক্তা (Promoter) : কারবারি সংস্থা গঠনে কারা মুখ্য ভূমিকা পালন করে ও প্রধান মালিকানা থাকে তাদের নাম শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা, প্রকল্প সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি উল্লেখ করতে হয়।

(iii) স্থান (Location) : প্রকল্প বা উদ্যোগে সঠিক অবস্থান, ঠিকানা, লীজে নেওয়া কিনা, অবস্থানগত

সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলিও পরিকল্পনায় স্থান পায়।

(iv) **জমি ও বাড়ি (Land and Building) :** সংস্থাটি যে জমিতে অবস্থিত তার আয়তন, কত পরিমাণ জমিতে নির্মাণ কাজ হয়েছে বা হবে, নির্মাণ কাজের ধরন, নির্মাণ কাজের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে বা অনুমিত ব্যয়, কারখানার নক্শা এবং মোট প্রত্যাশিত ব্যয় ইত্যাদি কারবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

(v) **মেশিনপত্র (Plant and Machineries) :** যে সব মেশিনপত্রের প্রয়োজন হবে তাদের বিশদ বিবরণ, কর্মক্ষমতা, সরবরাহকারী সংস্থা সংক্রান্ত তথ্য, দাম, বিকল্প মেশিনপত্রের মূল্য এবং বিবিধ সম্পত্তির মূল্যও এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

(vi) **উৎপাদন প্রক্রিয়া (Production Process) :** উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিবরণ, প্রক্রিয়া তালিকা প্রযুক্তিগত কৃৎ-কৌশল, বিকল্প প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ও উৎপাদন কার্যসূচি উল্লেখ করতে হয়।

(vii) **সহায়ক বিষয়সমূহ (Utilities) :** কারবারের উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানোর জন্য বা অন্যান্য কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের যেমন, জল, শক্তি, বাষ্প, চাপের মাধ্যমে সঙ্কুচিত বাতাসের প্রয়োজনীয়তা, আনুমানিক ব্যয় ও সরবরাহের উৎস ইত্যাদি কারবার পরিকল্পনায় স্থান পায়।

(viii) **পরিবহন ও যোগাযোগ (Transport and Communication) :** কারবারের স্থানটি কী ধরনের পরিবহন মাধ্যম দ্বারা যুক্ত, পরিবহন যান পাওয়ার সম্ভাবনা ও ব্যয় ইত্যাদিও প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

(ix) **কাঁচামাল (Raw Materials) :** কারবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের একটি তালিকা যুক্ত করতে হয় ও সাথে সাথে তাদের গুণমান ও পরিমাণও উল্লেখ করতে হয়। এছাড়াও প্রস্তাবিত কাঁচামালের উৎসসমূহ অর্থাৎ যেখান থেকে সেগুলি সংগ্রহ করা হবে সে সংক্রান্ত তথ্যও দিতে হয়। যদি কাঁচামাল সরবরাহ করার জন্য কোনো সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি হয়ে থাকে তাহলে তার বিবরণ এবং আনুমানিক ব্যয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। এছাড়াও যদি নির্দিষ্ট কাঁচামালটি না পাওয়া যায় তাহলে বিকল্প ব্যবস্থার বিষয়টিও প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়।

(x) মনুষ্যশক্তি (Manpower) : কারবার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যা, গুণগতমান অর্থাৎ কতজন দক্ষ, কতজন আধা-দক্ষ ও কতজন অদক্ষ কর্মীর প্রয়োজন তা উল্লেখ করা, কর্মী সংগ্রহের উৎসসমূহ, কর্মী সংগ্রহের ব্যয়, প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কিনা এবং তার জন্য আনুমানিক ব্যয় পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখ করতে হয়।

(xi) **পণ্যসমূহ (Products) :** পণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য একটি কারবার পরিকল্পনায় সম্বলিত থাকে। এর অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি হল পণ্য মিশ্রণ, সম্ভাব্য বিক্রয় বণ্টন প্রণালী, প্রতিযোগিতার তীব্রতা, পণ্য-মান, ইন্‌পুট-আউটপুট অনুপাত, বিকল্প পণ্য ইত্যাদি।

(xii) **বাজার (Market) :** ভোক্তা সংক্রান্ত তথ্য, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের চাহিদা, ব্যবসায় প্রথাসমূহ, বিক্রয় সম্প্রসারণের কৌশলসমূহ এবং বাজার গবেষণা ইত্যাদি বিষয়সমূহও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(xiii) **কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা (Requirement of Working Capital) :** প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ, তাদের উৎসসমূহ, ঋণের মাধ্যমে কার্যকরী মূলধন সংগ্রহের প্রকৃতি ও পরিমাণ ইত্যাদিও প্রকল্প প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকে।

(xiv) **তহবিলের প্রয়োজনীয়তা (Requirement of Fund) :** এই শিরোনামে যে সব তথ্য পরিকল্পনায় স্থান পায় সেগুলি হল বিভিন্ন খাতে মোট প্রকল্প ব্যয় ও তাদের বিভাজন যেমন, জমির মূল্য বাড়ির জন্য ব্যয়, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মূল্য, বিবিধ সম্পত্তির জন্য ব্যয়, প্রাথমিক ব্যয়, কার্যকরী মূলধনের পরিমান এবং বিবিধ খুচরো ব্যয়।

(xv) **মুনাফাযোগ্যতা (Profitability) :** প্রকল্পের প্রথম 10 বছরের উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফাযোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্যও পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পায়।

(xvi) **সমভঙ্গ বিশ্লেষণ (Brak even Analysis) :** উৎপাদনী সংস্থার স্থির ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয় ও বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে সমভঙ্গ বিন্দু স্থির করা হয়। এই বিন্দুতে প্রকল্পের কোনো ক্ষতি বা লাভ হয় না। এর উপরে পণ্য বিক্রয় করতে পারলে লাভ হয়। সুতরাং কত পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করলে লাভ বা ক্ষতি হয় না এবং কাম্য মুনাফা অর্জন করতে হলে কী পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করতে হবে সে সংক্রান্ত তথ্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

(xvii) **রূপায়ণ (Implementation) :** প্রকল্প রূপায়ণ বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হতে পারে। তাই সঠিক সময়ে যাতে প্রকল্প রূপায়িত হতে পারে সেজন্য একটি সময়সারণি তৈরি করতে হয় এবং এই তথ্য দিয়েই প্রকল্প প্রতিবেদন বা কারবার পরিকল্পনা সম্পূর্ণতা অর্জন করে।

6.4 কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়ন

কারবার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার কাজ সম্পন্ন করে। যখন কোনো কাজ একাধিক ধাপে সম্পন্ন হয় তখন প্রতিটি ধাপ একটি নির্দিষ্ট ক্রমে করতে হয়। কারণ প্রতিটি ধাপই পূর্বোক্ত ও পরবর্তী ধাপের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং কোনো ধাপকে বাদ দিলে বা অতিক্রম করে গেলে কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। একেই প্রক্রিয়া বলে। অর্থাৎ প্রক্রিয়া হল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সব কাজ সম্পাদন করতে হয় এবং যে ক্রমান্বয়ে সম্পাদন করতে হয় তার সামগ্রিক রূপ। উদাহরণস্বরূপ চা তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি চা তৈরির পাত্র নিতে হয়, তাতে যত কাপ চা তৈরি হবে সেইমতো জল দিতে হয়, পরবর্তী ধাপে আগুনের সাহায্যে জলকে ফোটাতে হয়, জল ফুটলে তাতে চা পাতা দিয়ে ঢাকা দিতে হয় এবং আগুন থেকে নামিয়ে নিতে হয়। এরপর কাপে প্রয়োজনমতো চিনি দিয়ে চা-এর লিকার ছাঁকনির

সাহায্যে কাপে ঢালতে হয় এবং প্রয়োজন মতো গরম দুধ মেশাতে হয় ও সবশেষে চামচ দিয়ে নেড়ে পরিবেশন করতে হয়। সুতরাং সামগ্রিকভাবে চা তৈরি হল একটি প্রক্রিয়া এবং চা তৈরির প্রতিটি ধাপ পূর্ববর্তী ধাপের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই ধাপগুলির অদল-বদল করলে সঠিকভাবে চা তৈরি হবে না। অনুরূপভাবে কারবারি কার্যকলাপ সামগ্রিকভাবে একটি প্রক্রিয়া এবং কারবারি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণ করতে কোন্ কাজটি কোন্ কাজের পরে করা হবে তা আগাম স্থির করাই হল কারবারের কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়ন। বস্তুত এটি হল একটি কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা। ব্যবসায়ের কাজ যাতে ধারাবাহিক ও মসৃনভাবে চলতে পারে এবং কাজের ক্ষেত্রে কোনো বিঘ্ন না হয় এবং কাজের বিভিন্ন ধাপগুলি যে ক্রমে সম্পাদন করতে হবে তার নক্শা বা খসড়াই হল কারবার প্রক্রিয়ার রূররেখা প্রণয়ন।

প্রামাণ্য পাঠপুস্তকে কারবার প্রক্রিয়ার যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তা হল—এটি হল কারবারের লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ পৌনঃপুনিক পদক্ষেপ গ্রহণের একটি শ্রেণী (It's a series of repeatable steps that are critical for achieving some sort of a business goal)। এই সংজ্ঞায় পৌনঃপুনিক শব্দটি হল তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ কারবারে যে সব কাজ নিয়মিতভাবে ও বারে বারে করতে হয় তাই হল প্রক্রিয়া। কারবারের কাজ চালু রাখতে গেলে এগুলি বারে বারে করতে হয় এবং এগুলি অপৌনঃপুনিক প্রকৃতির নয় অর্থাৎ একবার সম্পাদন করলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। একটি কারবার প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপই হল সংগঠিত এবং যেগুলির পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ কারবারে বারে বারে ঘটতে থাকে। যেমন কারবারের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কতজন কর্মী নিয়োগ করা হবে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কীভাবে কর্মী নিয়োগ করা হবে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একই পদ্ধতি বারবার অনুসৃত হয় তা একজন বা বেশিজন কর্মী নিয়োগ যাই হোক না কেন। সুতরাং কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোনো একটি ধাপ অনুসৃত না হলে কর্মী নিয়োগ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। বস্তুত কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া কারবারের বিভিন্ন কাজকে মসৃণ করে তোলে এবং বাধাগুলিকে অপসারিত করে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কারবার প্রক্রিয়ার রূপরেখা (BPD) তৈরি করা হয় যখন কোনো কারবার শুরু করা হয়। এমতাবস্থায় কারবারের কোন্ কাজগুলি করা হবে এবং কীভাবে বা কোন্ পদ্ধতিতে করা হবে তা স্থির করা হয়। এভাবে কাজগুলিকে সংগঠিত করা হয়, কাজের রূপরেখা তৈরি করা হয় যার ফলস্বরূপ কাজের ক্ষেত্রে সর্বাধিক দক্ষতা অর্জন করা যায়। কারবার প্রক্রিয়ার রূপরেখা কর্মীদের পথ প্রদর্শকের কাজ করে এবং এই রূপরেখা থেকে তারা কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোন্ পদক্ষেপ কোন্ অনুক্রমে অনুসরণ করবে তা জানতে পারে। এর ফলে কাজের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাঘাত হয় না এবং সহজেই কাজটি সম্পন্ন হয়। কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্রেতা বা ভোক্তাদের গুণগত মানের পণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা দান তা কর্মী বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে যেভাবেই হোক না কেন। একটি ভালো কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা একটি কারবারের সাফল্য ও মুনাফাযোগ্যতাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এই রূপরেখা যত ভালো হবে কারবারের ফলাফলও তত ভালো হবে।

সুবিধাসমূহ (Benefits) : একটি ভালো কারবার প্রক্রিয়ার রূপরেখা কারবারের লক্ষ্যপূরণের সহায়ক। এর অন্যান্য সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) **কারবারের কর্মসম্পাদনে উন্নয়ন ঘটায় (Facilitates the business Operation) :** একটি ভালো কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা বিভিন্ন বিকল্প কর্মপন্থার মধ্য থেকে সরল ও সহজ পন্থাটি বেছে নেয়। এর ফলে যারা কর্মপ্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে তারা প্রক্রিয়াটি সহজেই বুঝতে পারে ও মনে রাখতে পারে। এর ফলে কর্মসম্পাদনে কর্মীরা দক্ষ হয়ে ওঠে এবং কারবারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(ii) **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (Increase Productivity) :** যেহেতু কর্মীরা সম্পূর্ণ কর্ম প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে তাই ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনাও হ্রাস পায়। কর্মীদের কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্যে গতিশীলতার সঞ্চার হয় ও ফলস্বরূপ কারবারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(iii) **উচ্চমানের পণ্য ও সেবা (High Quality Products and Services) :** একটি ভালো কর্ম প্রক্রিয়ার রূপরেখা কর্মীদের কাজ বুঝতে ও কাজ করতে সাহায্য করে। বারে বারে একই পদ্ধতিতে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ভুল-ভ্রান্তি হ্রাস পায়। এর সামগ্রিক ফল হল উচ্চমানের পণ্য বা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি।

(iv) **ব্যয় হ্রাস (Reduces Cost) :** একটি কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা কর্মীদের কম সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করে, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ও ভুল-ভ্রান্তি কমায়। এর ফলে যেমন সম্পদের অপচয় হয় না, সাথে সাথে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এর সামগ্রিক ফল হল কারবারের ব্যয় হ্রাস।

6.4.1 কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া প্রণয়নের নীতিসমূহ (Principles for designing business processes) :

একটি উদ্যোগ বা কারবার গড়ে ওঠে মুনাফার উদ্দেশ্যে। মুনাফা অর্জন করার জন্য কারবারকে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে হয়। এই কাজের ফলেই উদ্যোগ পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হয় এবং পণ্য ও সেবা বিক্রয়ের ফলে মুনাফার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ যদি পণ্য বা সেবা উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে বেশিদামে বিক্রয় হয়। বর্তমানে বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায় ফলে পণ্য বিক্রয় সহজ হয় না। কারণ প্রত্যেক প্রতিযোগীই তাদের পণ্য নিয়ে বাজারে উপস্থিত হয় এবং তাদের পণ্য বিক্রয় করতে চায়। এমতাবস্থায় সেই উৎপাদকের পণ্য বা সেবা বিক্রয় হয় যাদের দাম কম এবং গুণগত মান ভালো। একেই প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বলে। তাই কোনো কারবারকে এই সুবিধা পেতে হলে তাকে অবশ্যই কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা বা খসড়া তৈরি করে সেই অনুযায়ী উৎপাদন প্রক্রিয়া চালাতে হবে। অন্যথায় এই সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়। সে কারণে বর্তমানে যে কোনো সংগঠিত কারবারই কর্ম প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে অনেক বিচার-বিবেচনা করে যাতে উৎপাদন ব্যয় ন্যূনতম করা সম্ভব হয়। একটি ভালো কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা তৈরির জন্য কতকগুলি নীতি মেনে চলতে হয়। নীচে এদের একটি তালিকা তুলে ধরা হল—

কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা প্রণয়নের নীতিসমূহ

(i) উদ্দেশ্যের নীতি (Principle of purpose)

(ii) সারল্যের নীতি (Principle of Simplicity)

(iii) যৌথ বোঝাপড়ার নীতি (Principle of joint understanding)

(iv) ধারাবাহিকতার নীতি (Principle of continuity)

(v) সম্পাদনযোগ্যতার নীতি (Principle of enablement)

(vi) যোগদানের নীতি (Principle of involvement)

(vii) নমনীয়তা নীতি (Principle of flexibility)

নীচে এগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(i) উদ্দেশ্যের নীতি (Principle of Purpose) : একটি নতুন স্থাপিত উদ্যোগ বা কারবার স্থাপনের পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্রেতাদের ন্যায্য মূল্যে উৎকৃষ্ট পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা। আর এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করা। আর তাই নতুন উদ্যোগের কর্ম প্রক্রিয়া নক্‌শা বা রূপরেখা তৈরি করার প্রয়োজন হয়। কারণ পূর্ব পরিকল্পিত কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়া কেবলমাত্র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে না, সাথে সাথে অপচয় রোধ করে ও ব্যয় হ্রাস করে। সুতরাং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা যা কর্ম সম্পদন প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য তা অর্জন করা সম্ভব হয়। উদ্দেশ্যের নীতি অনুসারে কারবারের কর্ম প্রক্রিয়া এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে কারবারের উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়।

(ii) সারল্যের নীতি (Principle of Simplicity) : কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া যেন সহজবোধ্য, সরল ও দক্ষ হয়। কারণ জটিল কর্ম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় এবং কারবারের উদ্দেশ্যপূরণ সহজ হয় না। অন্যদিকে একটি সরল কর্ম প্রক্রিয়া সাধারণ মানের কর্মীরাও সহজে বুঝতে পারে, তাদের করণীয় কাজ সহজেই সম্পাদন করতে পারে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সারল্যের নীতি এও দাবি করে যে কারবারে কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া যেন কাজের স্বাভাবিক প্রবাহকে (work flow) কোনোভাবেই বিঘ্নিত না করে।

(iii) যৌথ বোঝাপড়ার নীতি (Principle of Joint understanding) : উদ্যোগ বা কারবারের কর্ম প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধাপে সম্পন্ন হয়। আবার বিভিন্ন ধাপে কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন কর্মীর উপর বর্তায়। কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়া যত দীর্ঘ হয় কর্মীর সংখ্যাও তত বেশি হয়। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় অর্থাৎ যৌথ বোঝাপড়া আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে। অন্যথায় এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে কর্মীদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে কাজ পন্ড হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কাজেই প্রতিটি কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায় যৌথ বোঝাপড়ার নীতি থাকা আবশ্যক। এই নীতি কর্ম প্রক্রিয়ায় কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

(iv) ধারাবাহিকতার নীতি (Principle of Continuity) : এই নীতি অনুযায়ী উদ্যোগ বা কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া যেন ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হয়। বস্তুত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাজটি

সম্পাদনের জন্য একাধিক ধাপ অতিক্রম করতে হয় ও বারে বারে এই পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার নীতি অনুযায়ী পণ্য বা সেবার উৎপাদন পদ্ধতি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ধারাবাহিকতার নীতি প্রক্রিয়ার মধ্যে না থাকলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং কারবার বা উদ্যোগের উদ্দেশ্য সফল হয় না। কাজেই প্রক্রিয়ার মধ্যে ধারাবাহিকতার নীতি অবশ্য থাকা দরকার।

(v) সম্পাদনযোগ্যতার নীতি (Principle of Enablement) : ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি নীতি সর্বজনীনভাবে অনুসৃত হয় এবং সেটি হল সঠিক কাজের জন্য সঠিক কর্মীকে সঠিক সময়ে দায়িত্ব দিতে হয়। সম্পাদনযোগ্যতার নীতি অনুসারে কারবার বা উদ্যোগের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া এমন হবে যাতে কর্মসম্পাদনে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। যে কর্মীর উপর প্রক্রিয়ার কোনো ধাপের কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয় সে যেন কাজটি বুঝতে পারে এবং তার কাজটি করার যোগ্যতা থাকে। এককথায় কর্মী যেন কাজের উপযুক্ত হয় এবং কাজ সম্পাদনের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি দরকার সেগুলি যেন সরবরাহ করা হয়। একজন চিকিৎসক সার্জন বা শল্য বিশারদ না হলে যেমন জটিল অপারেশন করতে পারেন না, তেমনি কর্মদক্ষতা না থাকলে কাজ সম্পাদন করাও সম্ভব হয় না।

(vi) যোগদানের নীতি (Principle of Involvement) : কর্মীরা মানবিকভাবে কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হতে না পারলে বা স্বেচ্ছায় কাজে ব্রতী না হলে সঠিকভাবে কাজ সম্পাদিত হয় না। যোগদানের নীতি কর্মীর সাথে কাজের অভিযোজনের কথা বলে। উদ্যোগের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কর্মীদের অংশগ্রহণের নীতিই হল যোগদানের নীতি।

(vii) নমনীয়তার নীতি (Principle of Flexibility) : কারবার বা উদ্যোগের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। এবং প্রক্রিয়ার এই ধাপগুলি পৌনঃপুনিক অর্থাৎ বারে বারে অনুসৃত হয়। উদ্যোগ বা কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া একবার চূড়ান্ত হয়ে গেলে তা সাধারণত স্থির থাকে। কেবলমাত্র বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তন হলে কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার মধ্যেও কাজে পরিবর্তন আনতে হয়। যেমন, প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে যদি উন্নত মানের মেশিনপত্রের উদ্ভাবন হয় তাহলে কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটাতে হয় যাতে উন্নত প্রযুক্তির মেশিনপত্র ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এর ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, অপচয় কম হয়, ব্যয় হ্রাস পায় ও মুনাফাযোগতা বৃদ্ধি পায়। একেই নমনীয়তার নীতি বলে। অর্থাৎ কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার আরও উন্নয়নের স্বার্থে প্রক্রিয়ার পরিবর্তন করাই বাস্তবোচিত।

উপরোক্ত নীতিগুলি মেনে চললে কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া উন্নত, দক্ষ ও উদ্দেশ্য সহায়ক হয়ে ওঠে। এর ফলে কারবারি বা উদ্যোক্তার প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং কৌশলগত ব্যবসায়িক প্রয়োজন পূরণও বাস্তব হয়।

6.5 উদ্যোগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা

6.5.1 ধারণা

উদ্যোগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা বলতে বোঝায় যে ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি উদ্যোগ গড়ে ওঠে তার ভবিষ্যত সংক্রান্ত পূর্বানুমান। বস্তুত সব ধারণাই যে একটি সফল উদ্যোগ গড়ে তুলতে সক্ষম তা কিন্তু নয়। বাস্তবে তার ফলাফল কী হতে পারে সেজন্য যে সমীক্ষা চালানো হয় তাকেই বলে সম্ভাব্যতা পরীক্ষা। বস্তুত উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ করা হয় তার থেকে প্রত্যাশিত আয় কীরূপ হবে সম্ভাব্যতা পরীক্ষার মাধ্যমে তা নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়। একটি উদ্যোগ গড়ে তোলার পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন। বাস্তবে মুনাফা অর্জন সম্ভব কিনা বা মুনাফ হলে তার আনুমানিক পরিমাণ কত হতে পারে তার একটি ধারণা পাওয়াই এর উদ্দেশ্য। সেজন্য সম্ভাব্যতা পরীক্ষায় একটি **আয়-ব্যয়** বিশ্লেষণ (Cost-benefit analysis) করা হয়। কারবারি ক্ষেত্রে যদি আয়, ব্যয়ের থেকে বেশি হয় তবেই বলা যায় যে উদ্যোগটি লাভজনক এবং উদ্যোগ স্থাপনের জন্য এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু যদি দেখা যায় আয়ের থেকে ব্যয় বেশি তাহলে আর উদ্যোগ স্থাপনে অগ্রসর না হয়ে উদ্যোগ গঠনের ধারণাটিকে বাতিল করা হয়। সেজন্য সম্ভাব্যতা পরীক্ষাকে প্রকল্পের মূল্যায়ণ সংক্রান্ত সমীক্ষাও বলা হয়।

সব ধারণারই সমান বাণিজ্যিক উপযোগিতা থাকে না। ধারণা ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যা কল্পনা বা পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত হয়। তবে কোনো ধারণা যদি আকাশ-কুসুম কল্পনা থেকে উদ্ভূত হয় এবং যা বাস্তবে কার্যকর করা সম্ভব নয় সেসব ধারণা বর্জন করতে হয়। আবার এমন কিছু ধারণা থাকে যেগুলির বাস্তব যোগ রয়েছে কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্য পাওয়া কঠিন সেগুলিও এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কারবারি ধারণার অবশ্যই বাণিজ্যিক গুরুত্ব ও মুনাফাযোগ্যতা থাকতে হবে। কাজেই এরূপ ধারণার উপরই একটি নতুন উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে যার মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা থাকে। সে-কারণেই উদ্যোক্তা যখন কোনো ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি নতুন সংস্থা গড়ে তুলতে চায় বা নতুন কোনো পণ্য বা সেবা বাজারে আনতে চায় তখন ধারণার উপর কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয় অর্থাৎ নতুন ধারণার সম্ভাবনা কতটা সে-সংক্রান্ত পরীক্ষাকেই ধারণার **সম্ভাব্যতা পরীক্ষা** বলা হয়। বস্তুত কোনো ধারণার সম্ভাব্যতা পরীক্ষার ফল ধনাত্মক হলে ধারণাটি গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তী কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল ঋণাত্মক হলে ধারণাকে বর্জন করা হয় ও নতুন ধারণার সন্ধান করা হয়।

6.5.2 সম্ভাব্যতা পরীক্ষার উপাদানসমূহ (Elements of Feasibility Test)

বস্তুত ধারণার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা বলতে বোঝায় ধারণার চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তার কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা কতখানি তা নির্ধারণ করা। একে সম্পাদনযোগ্যতা যাচাইকরণ প্রক্রিয়া হিসাবেও গণ্য করা হয়। যেহেতু একটি ধারণার উপর নির্ভর করে অনেক সময়, অর্থ ও প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করা হয় তাই তার সাফল্যের সম্ভাবনা আগাম জানা আবশ্যক। এরূপ পরীক্ষার মাধ্যমেই একটি ধারণার সাফল্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বাজার সমীক্ষা ও বাণিজ্যিক সাফল্যের বিষয়গুলি সম্পর্কেও

জানা যায়। সম্ভাব্যতা পরীক্ষা মূলত চার ধরনের। এগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

সম্ভাব্যতা পরীক্ষা— 1. বাজার সম্ভাব্যতা (Market feasibility)
2. বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা (Commercial feasibility)
3. প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা (Technological feasibility)
4. অন্যান্য সম্ভাব্যতা (Other Feasibiletees)

নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল—

1. বাজার সম্ভাব্যতা (Market feasibility) : উদ্যোক্তা যে বাজারে তার উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ভবিষ্যতে বিক্রয় করবে সে-সম্বন্ধে তার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার। সংক্ষেপে বাজার সমীক্ষার মাধ্যমে বাজারের চরিত্র, গভীরতা, চাহিদা ও যোগানের ধরন, ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা, ব্যাপকতা, প্রতিযোগিতার ধরন ও প্রতিযোগীদের সংখ্যা ইত্যাদি অনুধাবন করা হয়। কাজেই বাজার-সম্ভাব্যতা পরীক্ষার মাধ্যমে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়।

(i) বাজারে সম্ভাব্য পণ্য বা সেবার চাহিদার পরিমাণ কত?
(ii) কোন্ ধরনের ক্রেতারা উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ক্রয়ে আগ্রহী?
(iii) সম্ভাব্য ক্রেতাদের সংখ্যা, তাদের বিবরণ ও তাদের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য।
(iv) কীভাবে পণ্য বা সেবা বাজারে বিক্রয় করা হবে?
(v) বাজারে সম্ভাব্য প্রতিযোগী কারা এবং তাদের সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা।
(vi) সম্ভাব্য পণ্য ও সেবা কি ক্রেতাদের কোনো অপূরণীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম?
(vii) প্রতিযোগীদের পণ্য ও সেবার তুলনায় সম্ভাব্য সেবা ও পণ্যের দাম ও গুণগত মান কীরূপ?
(viii) বাজারে যেসব প্রতিযোগী রয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান প্রতিযোগীর শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাগুলি কী কী?
(ix) বাজারে পণ্য বা সেবা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা আছে কিনা?

2. বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা (Commercial feasibility) : ধারণাটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হলে এবং সম্ভাব্য পণ্যের বাজার থাকলেও ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা বিচার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। একটি ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে নীচের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(i) উদ্যোক্তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চালানোর জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন যা সে কারবার থেকে উপার্জন করতে চায়?
(ii) উদ্যোগের উৎপাদিত পণ্য বা সেবা কতদিন পর বিক্রয়যোগ্য হবে?
(iii) কারবার শুরু করার জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে?
(iv) ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন্ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে?
(v) কারবারের স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের আনুমানিক পরিমাণ।
(vi) উৎপাদিত পণ্য বা সেবার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতারা কী দাম দেবে বলে মনে করা হয়?

(vii) কারবারের বিক্রয় পূর্বানুমান কী পরিমাণের?

(viii) কারবারে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার সমভঙ্গ বিন্দু (BEP) কত?

(ix) সমভঙ্গ বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য কত পরিমাণ বিক্রয় করতে হবে?

(x) কারবারের উৎপাদন মসৃণভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কত পরিমাণ কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন হবে?

(xi) লগ্নির উপর প্রত্যাশিত আয়ের হার (Rate of return) কত?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর সদর্থক হলে বলা যায় যে ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে এবং সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

3. প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা (Technological feasibility) : যেসব উদ্যোগে প্রযুক্তির ব্যবহার বেশি হয় সেসব উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা বিচার করা দরকার। প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতার অন্তর্ভুক্ত হল যে কারখানায় পণ্য উৎপাদন করা হবে বলে স্থির হয়েছে তা যথেষ্ট কিনা, কৃত-কৌশল (know-how) উদ্যোক্তার সংগ্রহে রয়েছে কিনা অথবা বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হবে কিনা ইত্যাদি। যদি অন্য কারও সাথে যৌথভাবে উদ্যোগ গঠনের পরিকল্পনা থাকে তাহলে যৌথ উদ্যোগের শর্তসমূহ পরীক্ষা করা দরকার। যদি বিদেশের সাথে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা হয় তাহলে আইনগত বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হয়। কোনো উদ্যোগের যখন প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা হয় তখন অবশ্যই নীচের বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হয়। এগুলি হল—

(i) প্রয়োজনীয় জমি ও কারখানার স্থান রয়েছে কিনা,

(ii) উদ্যোগের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা যেমন জল, বিদ্যুৎ, পরিবহন, যোগাযোগ ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে কিনা,

(iii) কাছাকাছি যন্ত্রপাতি সারাই করা ও বিদ্যুৎ সারাইকেন্দ্র রয়েছে কিনা,

(iv) ওই এলাকায় দূষণ-রোধক আইন বলবৎ কিনা,

(v) প্রয়োজনমত দক্ষ কর্মী পাওয়ার সুযোগ কতখানি এবং কারখানায় ও কারখানার বাইরে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং

(vi) উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সঠিক পরিমাণে ও গুণগত মানে পাওয়া সম্ভব কিনা।

এইসবই প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা যাচাই করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

4. অন্যান্য সম্ভাব্যতা (Other Feasibiletees)

ধারণার সম্ভাব্যতা পরীক্ষায় বাজার-সম্ভাব্যতা বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা ও প্রযুক্তিগত পরীক্ষার পরও অন্যান্য কতকগুলি বিষয় পরীক্ষা করা হয়। নীচে এগুলি তুলে ধরা হল—

(i) কারবার শুরু করার জন্য কি কোনো আইনগত বিধিনিষেধ মেনে চলা আবশ্যক?

(ii) কারবার শুরু জন্য যদি লাইসেন্স বা অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয় তাহলে সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?

(iii) কারবার শুরু করতে দেরি হওয়ার পিছনে কোনো কারণ রয়েছে কিনা?

(iv) সম্ভাব্য পণ্য বা সেবার বাজারজাতকরণের জন্য উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয় দক্ষতা রয়েছে কিনা?

6.5.3 সম্ভাব্যতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ

সম্ভাব্যতা পরীক্ষা হল উদ্যোগের যোগ্যতা যাচাই করার একটি পদ্ধতি। কেবলমাত্র একটি বাণিজ্যিক ধারণা নির্বাচন করলেই উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে না। উদ্যোগ গড়ে তোলার আগে উদ্যোগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি আনুমানিক ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের পরীক্ষা চালানো হয়। সম্ভাব্যতা পরীক্ষা হল উদ্যোগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুমান করা অর্থাৎ বাস্তবে উদ্যোগটি রূপায়ণযোগ্য কিনা এবং উদ্যোগটি লাভজনক কিনা। কারণ উদ্যোক্তা লাভের আশাতেই উদ্যোগ গড়ে তোলে এবং এজন্যই মূলধন বিনিয়োগ করে। সুতরাং উদ্যোগটির ভবিষ্যতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কতখানি তা যাচাই করা হল এর প্রধান উদ্দেশ্য। একটি প্রকল্প বা উদ্যোগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার পিছনে যেসব উদ্দেশ্য থাকে সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

(i) **উদ্যোগের ধারণার যাচাইকরণ :** উদ্যোগ একটি ধারণার উপর গড়ে উঠে। সম্ভাব্যতা পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় যে ধারণাটি বাস্তবানুগ কিনা অর্থাৎ বাস্তবে রূপায়ণযোগ্য কিনা। এছাড়াও ধারণার মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন রয়েছে কিনা তাও যাচাই করে দেখা হয়।

(ii) **উদ্যোগ গঠন সংক্রান্ত সমীক্ষা :** উদ্যোগের ধারণা যদি বাস্তবানুগ ও সম্ভাবনাময় হয় তাহলে উদ্যোগ গঠন করা যুক্তিযুক্ত। উদ্যোগটি কীভাবে গড়ে উঠবে অর্থাৎ একমালিকী, অংশীদারি বা কোম্পানি বা যৌথ উদ্যোগ সেই বিষয়টিও স্থির করতে হয় এবং আইনগত বিধিনিষেধ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তাও দেখা হয়।

(iii) **কাজের প্রকৃতি :** উদ্যোগটি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠবে নাকি পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী উদ্যোগ হিসাবে গড়ে উঠবে তাও বিবেচনা করতে হয়। একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগের ক্ষেত্রে জটিলতা বিশেষ থাকে না। কিন্তু একটি উৎপাদন শিল্পে উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদান কতটা সহজলভ্য তা যাচাই করতে হয়। কারণ সঠিক মানের কাঁচামাল সঠিক পরিমাণে যেমন পাওয়া দরকার সাথে সাথে দক্ষ কর্মী, বিদ্যুৎ সংযোগ, জল সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক পরিষেবা সহজলভ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উদ্দেশ্যই হল যে এইসব ইনপুট পাওয়ার উৎসগুলিকে সনাক্ত করা। এসব বিষয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফল সদর্থক হলে তবেই উদ্যোগ গড়ে তোলা যায়। কিন্তু ফলাফল সদর্থক না হলে উদ্যোগ স্থাপনের বিষয়টি বাতিল করতে হয়।

(iv) **মুনাফাযোগ্যতা নির্ধারণ :** সম্ভাব্যতা সমীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল প্রস্তাবিত উদ্যোগের মুনাফাযোগ্যতা বিচার করা। যদিও বিষয়টি অনুমানের উপর নির্ভর করেই নির্ধারণ করা হয় তবুও এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উদ্যোক্তা মুনাফার আশায় উদ্যোগে মূলধন

বিনিয়োগ করে ও আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম সম্পাদন করে। মুনাফাই হল তার শ্রম ও মূলধনের প্রতিদান। এজন্য সাধারণত ব্যয়-প্রতিদান (Cost-benefit) বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ উদ্যোগ স্থাপন করতে ও উদ্যোগের কাজকর্ম চালাতে আনুমানিক ব্যয় কত এবং উদ্যোগের পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণ কত হতে পারে নির্ধারণ করা হয়। আয় ও ব্যয়ের পার্থক্যই লাভ বা ক্ষতিকে সূচীত করে। অর্থাৎ লাভ হলে উদ্যোগটি আশাব্যাঞ্জক। অন্যদিকে ক্ষতি হলে অর্থাৎ আয় থেকে ব্যয় বেশি হলে উদ্যোগটি বাতিলযোগ্য। সুতরাং সম্ভাব্যতা পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যতে উদ্যোগের মুনাফাযোগ্যতা সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করা যাতে উদ্যোক্তা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

(v) **অন্যান্য উদ্দেশ্য :** সম্ভাবত্যা সমীক্ষার উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও এর অন্যান্য উদ্দেশ্যও রয়েছে। উদ্যোগের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যাচাই করা হয় যে কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক বা পরিবেশগত বাধা রয়েছে কিনা। প্রযুক্তিগত সমস্যা নিরসনের জন্য উপযুক্ত পরিষেবা কেন্দ্র রয়েছে কিনা এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ থাকলে তার প্রকৃতি কীরূপ অর্থাৎ কঠোর না নমনীয় ইত্যাদি।

(vi) **উদোক্তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা :** যাইহোক এককথায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষাই উদ্যোক্তাকে পথ দেখায় আর সেই পথ ধরেই উদ্যোক্তা এগিয়ে যায় অথবা সম্ভাব্য উদ্যোগটিকে পরিত্যাগ করে। কাজেই উদ্যেক্তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করাও সম্ভাব্যতা সমীক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

6.6 নিয়ন্ত্রণ

একটি প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গড়ে ওঠে। আর ওই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাকে কিছু কাজ সম্পাদন করতে হয়। যেহেতু প্রতিষ্ঠান নিজে কাজগুলি সম্পাদন করতে পারে না, তাই তাকে কর্মী নিয়োগ করতে হয়। এই কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে।

এখন এই কাজ সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক ব্যয়ে সম্পাদন করতে হলে প্রতিটি কাজের পরিকল্পনা রচনা করতে হয় এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সংগঠন গড়ে তুলতে হয়। প্রতিষ্ঠানের সাংগঠিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের ভারাপর্ণ ঘটে। প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মী তার নিজ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী পরিকল্পনা অনুসারে সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সঠিক ব্যয়ে তার কাজ সম্পন্ন করবে—প্রতিষ্ঠান কর্মীর কাছে এই প্রত্যাশাই করে থাকে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই 'প্রত্যাশা' ও 'বাস্তব অবস্থার' মধ্যে ফারাক দেখা যায়। এই ফারাক যত বেশি হয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন ততই কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত নিয়ন্ত্রণ হল পরিকল্পনা ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে যাতে কোনো বিচ্যুতি বা ফাঁক না থাকে তারই এক সুসংহত প্রচেষ্টা অর্থাৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা

যাচাই করার কাজই হল নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 'প্রত্যাশিত ফল' ও 'প্রকৃত ফলের' তুলনা করা হয় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সনাক্ত করা হয়। এর সাথে ভবিষ্যতে যাতে ঐ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার ব্যবস্থা করা হয়। আর এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকেই বলে **নিয়ন্ত্রণ**।

সুতরাং নিয়ন্ত্রণ হল একটি মৌলিক ব্যবস্থাপনামূলক কাজ যা সাধারণ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজকে অনুসরণ করে। পরিকল্পনা বা নির্দেশনার মতো নিয়ন্ত্রণও ব্যবস্থাপনার একটি ধারাবাহিক কাজ। এর উদ্দেশ্য হল পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলি যাতে সম্পাদিত হয় সে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের সবক্ষেত্রেই অর্থাৎ বস্তু, ব্যক্তি, কাজ, অর্থ, সময় ইত্যাদি সর্বত্রই প্রযোজ্য হয়।

নীতি ও পদ্ধতি হিসাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার একেবারে শুরু থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হয়ে আসছে। কারণ ব্যবস্থাপকরা বরাবরই তাদের আদেশ ও পরিকল্পনার ফল জানতে বিশেষভাবে আগ্রহী হন। একটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা যায়। 'ভারতীয় রেলপথ' পরিবহনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে যুক্ত অসংখ্য রেলগাড়ি একই লাইনে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাতায়াত করছে। এই রেলগাড়ির চালকদের গতিশক্তির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং তারা যেভাবে খুশি রেলগাড়ি চালাতে পারে। কিন্তু যদি তারা নিজের ইচ্ছামতো সেগুলিকে চালায় তাহলে রেল চলাচলে বিশৃঙ্খলা ঘটবে এবং দুর্ঘটনা ঘটাও কোনো বিচিত্র ব্যাপার নয়। তাই তারা নিজের খেয়াল খুশিমতো রেলগাড়িটি চালাতে পারে না। বাস্তবে চালকদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় সিগন্যাল, গার্ড ও স্টেশন মাস্টার দ্বারা। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ হল সেই প্রক্রিয়া যা রেল চলাচলকে নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী ও ন্যূনতম বিচ্যুতির মাধ্যমে গতিশীল রাখে। একই ঘটনা একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল রাখতে এবং বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে বিচ্যুতি ন্যূনতম করাই হল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য।

6.6.1 নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

ছোটো, বড়ো ও মাঝারি সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই কম বেশি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠানে একটি সুষম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে না তুলতে পারলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন দুরূহ হয়ে পড়ে। একটি প্রতিষ্ঠানে যে সব উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

(i) কর্মসম্পাদনের ভুল-ত্রুটিগুলি সনাক্ত করা।
(ii) ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করা ও প্রতিরোধ করা।
(iii) পূর্ব নির্ধারিত মান অনুসারে কর্মসম্পাদনের জন্য নির্দেশদান
(iv) সঠিক সময়ে কার্য সম্পাদন
(v) সঠিক ব্যয়ে কার্য সম্পাদন
(vi) প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন

(i) কার্য সম্পাদনের ভুল-ত্রুটিগুলি সনাক্ত করা (To detect errors and defects in performance) : নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোনো কাজ পূর্বনিধারিত পরিকল্পনা অনুসারে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয় এবং যদি না হয়ে থাকে তাহলে কী কারণে হয়নি তা অনুসন্ধান করে সনাক্ত করা হয়। এর ফলে ভুল-ত্রুটির পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে না এবং কর্মসম্পাদনে দক্ষতা আসে।

(ii) ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করা ও প্রতিরোধ করা (To rectify and prevent the errors and defects) : নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল কাজের ক্ষেত্রে দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করা এবং যে সব ভুল-ত্রুটি ঘটে সেগুলি সংশোধন করা, এছাড়াও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হল ভবিষ্যতে যাতে ভুল-ত্রুটির পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(iii) পূর্ব নির্ধারিত মান অনুসারে কর্মসম্পাদনের জন্য নির্দেশদান (To provide direction in conformity with the predetermined standard) : প্রতিষ্ঠানের কোনো কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি পরিকল্পনা রচনা করা যায়। এই পরিকল্পনা কাজ সম্পাদন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশা। পরিকল্পনা কতকগুলি প্রমাণ মানের উপর গড়ে ওঠে। যেমন—কাজটি করতে কত সময় লাগবে, কত ব্যয় হবে, কী পরিমাণ উপাদানের প্রয়োজন হবে ইত্যাদি। যদি কোনো কাজ পূর্বনির্ধারিত মান অনুসারে সম্পাদিত না হয় তাহলে ব্যবস্থাপকরা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন যাতে পরিকল্পিত পথে কাজটির রূপায়ণ ঘটে।

(iv) সঠিক সময়ে কার্যসম্পাদন (Performance at right time) : ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি সঠিক পদ্ধতিতে ও সঠিক ব্যয়ে সম্পাদনের ব্যবস্থা করা। ব্যবস্থাপনার এই দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় বলে এটিও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়।

(v) সঠিক ব্যয়ে কার্যসম্পাদন (Performance of work at right time) : কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠান আশা করে ন্যূনতম প্রচেষ্টার দ্বারা ও ন্যূনতম ব্যয়ে কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা করা। নিয়ন্ত্রণ এই উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে কাজ করে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হ্রাসের বিষয়টিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

(vi) প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন (Attainment of organisational objectives) : নিয়ন্ত্রণ হল একটি ব্যবস্থাপনামূলক ধারাবাহিক কাজ। একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কাজগুলির যথাযথ সম্পাদনের উপর। আর কাজগুলির যথাযথ সম্পাদন নির্ভর করে ব্যবস্থাপনার কর্ম-দক্ষতার উপর। পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় বা সংযোজন যেমন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় বলে গণ্য হয়, তেমনি নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বলা হয় যে নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধন।

6.6.2 নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজগুলির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হল শেষ পর্যায়ের কাজ। নিয়ন্ত্রণ হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার শুরু হয় কোনো কাজের ক্ষেত্রে প্রমাণ মান স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে উদঘাটিত ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধনের মধ্য দিয়ে। নীচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ধাপসমূহ তুলে ধরা হল :

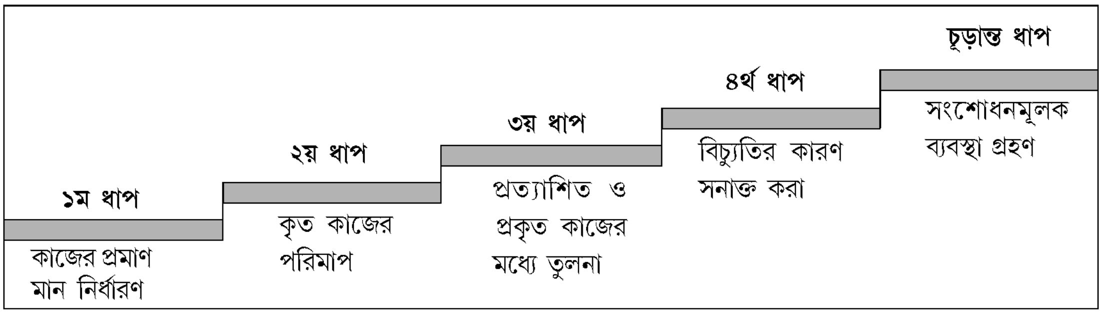

1. **কাজের প্রমাণ মান প্রতিষ্ঠা (Establishment of Standards) :** নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হল কাজের প্রমাণ মান নির্ধারণ যার সাথে তুলনা করে কত কাজের মূল্যায়ন করা হয়। এই মান বিভিন্ন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে। এই মান আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন উৎপদানের পরিমাণ, শ্রম-ঘণ্টা ইত্যাদি হল ভৌতমান (Physical standard) আবার বিক্রয়, আয়, ব্যয় ইত্যাদি হল আর্থিক মান (Financial standard) ইত্যাদি। এই মানগুলি স্পর্শনীয়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সুনাম সংক্রান্ত প্রমাণ মান হল অস্পর্শনীয়।

   কোনো কাজের প্রমাণ মান ওই কাজের সম্পাদনজনিত প্রত্যাশাকে সূচিত করে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সংহতি রেখে ব্যবস্থাপকরা এই মান নির্ধারণ করেন এবং এই মান-ই নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। সেজন্য অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে এই মান নির্ধারণ করতে হয়। সাধারণত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রমাণ মানের আবশ্যিক শর্তগুলি হল নিম্নরূপ :

   (i) প্রমাণ মান অবশ্যই সরল ও সহজে বোধগম্য হবে।

   (ii) প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ মান যেন সঙ্গত পরিমাণ প্রচেষ্টা ও সময়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়।

   (iii) প্রমাণ মান অবশ্যই নমনীয় হবে অর্থাৎ প্রয়োজন পড়লে সেগুলি যাতে পরিবর্তিত করা যায়।

   (iv) বিজ্ঞানসম্মতভাবে গতি সমীক্ষা ও সময় সমীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ মান স্থির করতে হবে।

   (v) পরিমাপের সুবিধার জন্য প্রমাণ মান যতটা সম্ভব পরিমাণগতভাবে প্রকাশ করতে হবে।

(vi) কর্মীদের সাথে যথাসম্ভব আলোচনার ভিত্তিতে এই মান নির্ধারণ করতে হবে।

2. **সম্পাদিত কাজের পরিমাপ (Measurement of performance) :** প্রত্যাশিত কাজের মান একবার স্থির হয়ে গেলে পরের ধাপটি হল **প্রকৃত কাজের পরিমাপ**। ধরা যাক একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় স্থির করা হয়েছে 50,000 ইউনিট। সুতরাং প্রকৃত বিক্রয় 50,000 ইউনিটের কম না বেশি তা দেখতে হয়। কাজ চলাকালীনও কাজের পরিমাপ করা হয়। এর ফলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ থাকে।

3. **প্রত্যাশিত ও সম্পাদিত কাজের কথা তুলনা (Comparison between the actual performance and standard performance) :** কাজের প্রমাণ মান হল প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত প্রত্যাশা। অন্যদিকে সম্পাদিত কাজ হল বাস্তব ঘটনা। প্রত্যাশার সাথে বাস্তবের তুলনা করে কর্মসম্পাদনে প্রতিষ্ঠানের শক্তি (Strength) বা দুর্বলতা (Weakness) পরিমাপ করা যায়। যদি সম্পাদিত কাজ প্রমাণ মানের সাথে মিলে যায় তাহলে ধরে নেওয়া হয় সে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যদি বিচ্যুতি দেখা যায় তাহলে বিচ্যুতির কারণগুলি চিহ্নিত করে তাদের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে ছোটোখাটো বিচ্যুতি অগ্রাহ্য করা হয়। যেমন, বিচ্যুতি যদি প্রমাণ মানের 'কম বেশি 5%' হয় তাহলে ব্যবস্থাপকরা তা অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু এর বেশি হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। বস্তুত **সঙ্কটজনক** বা **ব্যতিক্রমী বিচ্যুতির** (Critical or exceptional deviation) উপর গুরুত্ব আরোপ '**ব্যতিক্রমী নিয়ন্ত্রণ**' (Control by exception) নামে পরিচিত।

4. **বিচ্যুতির কারণ চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ (Indentifying cause of deviation) :** তৃতীয় ধাপে কাজের প্রমাণ মান ও সম্পাদনার মধ্যে তুলনা করে যে বিচ্যুতি দেখা যায় তা তাৎপর্যপূর্ণ হলে এর কারণ অনুসন্ধান করা হয়। এজন্য কাজ সম্পাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিচ্যুতির কারণটি চিহ্নিত করা হয়। সাধারণত বিচ্যুতির পিছনে যেসব কারণ বর্তমানে থাকে সেগুলি হল পরিকল্পনায় ভুল-ত্রুটি, সম্পাদনের ক্ষেত্রে অমনোযোগিতা অথবা পরিকল্পনার দুর্বল রূপায়ণ।

5. **সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ (Taking corrective actions) :** বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করে সেগুলি সংশোধনের ব্যবস্থা না করলে নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয় না। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি অনুসন্ধানেই নিবদ্ধ থাকে না, সেগুলি যাতে সংশোধন করা যায় ও ভবিষ্যতে যাতে তাদের পুনরাবৃত্তি না ঘটে তারও ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া শেষ হয় কাজ সম্পাদনে উদ্‌ঘাটিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। অবশ্য যেখানে বিচ্যুতি ঘটে না বা অত্যন্ত কম বিচ্যুতি ঘটে সেক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

উদাহরণস্বরূপ, কাজের প্রকৃত সম্পাদন প্রমাণ মানের চেয়ে খারাপ হওয়ার পিছনে কারণ হল কর্মীদের

প্রশিক্ষণের অভাব, পুরানো ও অকেজো যন্ত্রপাতি, লোডশেডিং, খারাপ মানের কাঁচামাল, কর্মীদের মধ্যে প্রণোদনার অভাব ইত্যাদি। সুতরাং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি স্থাপন, ভালো মানের কাঁচামালের ব্যবস্থা, কাজের পরিবেশের উন্নয়ন, পরিদর্শন ইত্যাদি গ্রহণ করলে কর্মসম্পাদন উন্নত হয়। তবে যেক্ষেত্রে কোনোভাবেই কর্মসম্পাদন প্রমাণ মানের স্তরে উন্নীত করা যায় না, সেক্ষেত্রে প্রমাণ মানকেই সংশোধন করতে হয় ও কমাতে হয়। এরূপ ঘটনাও দেখা যায় যখন বিচ্যুতির কারণ ব্যবস্থাপকদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে না।

নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার ধাপগুলি অন্য একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করা যায় :

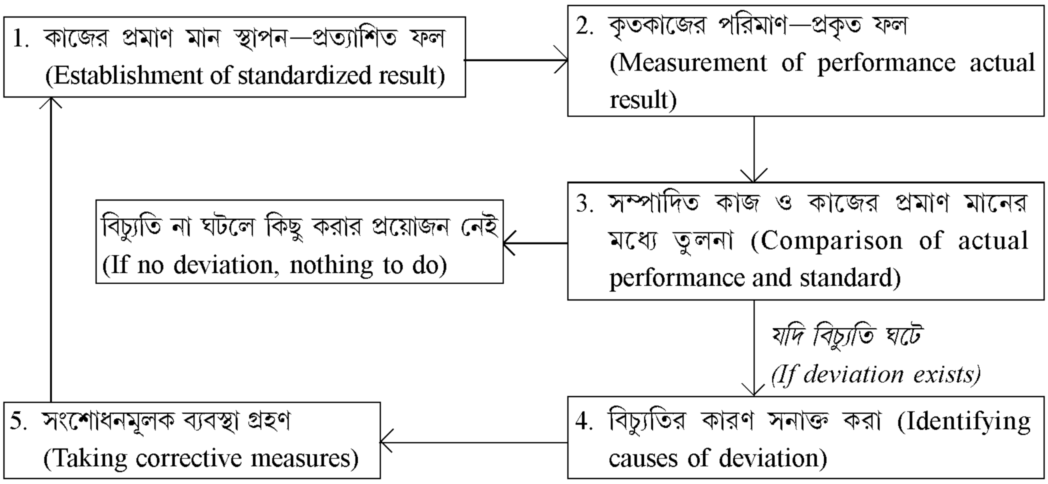

6.6.3 কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হিসাবে গণ্য হয় এবং এই দুটি বিষয়ই কর্মসম্পাদনের সূচিকে অনুসরণ করে। কারণ একবার পণ্য বা সেবার নকশা চূড়ান্ত হয়ে গেলে পণ্য বা সেবা উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ পণ্য বা সেবার দৈনন্দিন উৎপাদন প্রক্রিয়া যাতে সাবলীলভাবে অর্থাৎ বিনা বাধায় চলতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গুণমান (quality) বজায় রাখা। কারণ এটি কার্যসম্পাদন পরিমাপের ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গণ্য হয়। গুণমান প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কৌশল কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলে যে বিষয়টি সুনিশ্চিত হয় তা হল গুণমান নির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়া।

পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকলাপের মধ্যে নীচের কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে :

(i) উদ্দেশ্য স্থির করা অর্থাৎ আগাম যেন জানা যায় কি পরিকল্পনা কী করতে চায় ও কখন করতে চায়।

(ii) কাজ ও দায়িত্বের বণ্টন অর্থাৎ কারা নতুন পণ্য বা সেবার সাথে যুক্ত হবে এবং কীভাবে যুক্ত হবে।

(iii) কর্মসূচি প্রণয়ন এবং এর অন্তর্ভুক্ত হল কাজের ধরন, প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কার্যসূচি, যোগান ও চাহিদার কার্যসূচি।

(iv) সম্পদের প্রয়োজন, কর্মী ও তাদের দক্ষতা, অর্থ, সময়, কাঁচামাল, মেশিনপত্র ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মূল্যায়ন করা।

(v) কাজের পরিদর্শন এবং সম্পাদনযোগ্যতার মূল্যায়ন যা নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসাবে গণ্য হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত হল নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপ, কাজের পরিমাণ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতিসমূহ।

6.7 প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়ন

কোনো উদ্যোগের বাস্তব রূপায়ণের লক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত গুচ্ছ নির্দেশিকাই হল প্রকল্প প্রতিবেদন। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা যে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় তাই প্রকল্প প্রতিবেদন। নতুন উদ্যোগ স্থাপন অথবা চালু উদ্যোগের আধুনিকীকরণ বা সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন এই প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রতিবেদন অপরিহার্য বলে গণ্য হয়। বস্তুত প্রকল্প প্রতিবেদন হল প্রকল্প পরিকল্পনার লিখিত রূপ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা স্থির করা হয় সেগুলি প্রকল্প প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয় এবং রূপায়ণকালে সেগুলি অনুসরণ করা হয়। অন্যথায় প্রকল্পের সাফল্য পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে।

সাধারণত ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রায়তন কারবারি সংস্থার প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে খুব বেশি আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না যা বৃহদায়তন কারবারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় আবার প্রকল্প প্রতিবেদনে কত বেশি তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে তাও নির্ভর করে উদ্যোগের আকৃতি ও উৎপাদনের প্রকৃতির উপর। 1999 সালে **বিনোদ গুপ্তা** ((Vinod Gupta) একটি প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে যেসব তথ্যর প্রয়োজন তার একটি সাধারণ তালিকা তৈরি করেছিলেন। তিনি প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আটটি নির্দিষ্ট ও অনুক্রমিক স্তরে বিভক্ত করেছেন। এই নির্দিষ্ট ও অনুক্রমিক স্তরগুলি হল নিম্নরূপ :

1. সাধারণ তথ্যাবলি
2. প্রকল্প বিবরণ
3. বাজার সম্ভাবনা
4. মূলধনী ব্যয় ও অর্থের উৎসসমূহ
5. কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ
6. অন্যান্য আর্থিক বিষয়সমূহ

7. অর্থনৈতিক ও সামাজিক চলকসমূহ

8. প্রকল্প রূপায়ণ

এই প্রতিটি স্তর সংক্রান্ত যেসব তথ্য প্রকল্প প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয় সে সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল—

1. সাধারণ তথ্যবলি (General Information) : একটি প্রকল্প প্রতিবেদনে যেসব সাধারণ তথ্যাবলি উল্লেখ করতে হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ—

(i) **উদ্যোক্তা সম্পর্কিত তথ্যাবলি (Bio-data promoter) :** এই শিরোনামে উদ্যোক্তার নাম ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্য কোনো ধরনের যোগ্যতা, উদ্যোগ সংস্থাটি অংশীদারি কারবার হিসাবে গড়ে উঠলে প্রত্যেক অংশীদারের উপরোক্ত তথ্যগুলি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা আবশ্যক।

(ii) **শিল্পসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় (Industry Profile) :** প্রকল্পটি যে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রতিবেদনে স্থান পায়। এছাড়াও এই শিল্পের অতীত ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা সাংগঠনিক অবস্থা এবং সমস্যা সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হয়।

(iii) **গঠন ও সংগঠন (Constitution and Organisation) :** উদ্যোগের গঠন ও তার সাংগঠনিক কাঠামো, অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারি চুক্তির প্রধান বিষয়সমূহ, নিবন্ধন সংখ্যা যদি থাকে, ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।

(iv) **পণ্য বিবরণ (Product Description) :** যে সব পণ্য উৎপাদন করা হবে বলে স্থির হয় তাদের উপযোগিতা ব্যাপ্তি, পণ্য নক্শা, সমজাতীয় বিকল্প পণ্যের থেকে কী কী অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় ইত্যাদি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

2. প্রকল্প বিবরণ (Project Description) : প্রকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়। প্রকল্প বিবরণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ :

(i) **অবস্থান (Location) :** উদ্যোগী সংস্থার ঠিকানা, যে জায়গায় উদ্যোগ অবস্থিত সেটি ভাড়ায় নেওয়া নাকি নিজস্ব, চৌহদ্দি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে সংগৃহীত সম্মতিপত্র ইত্যাদি।

(ii) **ভৌত পরিকাঠামো (Physical Infrastructure) :** ভৌত পরিকাঠামো অন্তর্ভুক্ত নীচের বিষয়গুলি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়—

a) **কাঁচামাল (Raw Materials) :** কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পাওয়া যায় নাকি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, কাঁচামাল যোগানের উৎসসমূহ।

b) **দক্ষ শ্রমিক (Skilled Labour) :** স্থানীয় অঞ্চল থেকে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় কিনা, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(iii) **বিভিন্ন সরবরাহ (Utilities) :** এর অন্তর্ভুক্ত হল—

a) **শক্তি (Power) :** শক্তির প্রয়োজনীয়তা, উৎস এবং সরবরাহকারী সংস্থার যেমন 'বিদ্যুৎ পর্ষদ' থেকে অনুমতি।

b) **জ্বালানি (Fuel) :** যে সব জ্বালানির প্রয়োজন, যেমন—কয়লা, গ্যাস, ডিজেল, পেট্রল ইত্যাদির আনুমানিক পরিমাণ ও সরবরাহের উৎস।

c) **জল (Water) :** শিল্পোদ্যোগে জল অপরিহার্য। প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় জলের উৎস পরিস্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।

d) **দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Polution Control) :** যে সব শিল্পোদ্যোগে ধোঁয়া, রাসায়নিক ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ ইত্যাদি সৃষ্টি হয় তাদের ক্ষেত্রে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে যে দূষণ রোধে কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

e) **জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থা (Communication System) :** উদ্যোগের জ্ঞাতকরণ ব্যবস্থার অবস্থা যেমন—টেলিফোন, টেলিকম, ইন্টারনেট ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রতিবেদন সূচিত করতে হবে।

f) **যানবাহনের সুবিধা (Transport Facilities) :** উদ্যোগ যে জায়গায় অবস্থিত তার পরিবহন ব্যবস্থা যেমন—সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত কিনা তাও উল্লেখ করতে হয়।

g) **উৎপাদন প্রক্রিয়া (Production Process) :** যে প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল পণ্যে পরিণত হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

h) **মেশিনপত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি (Machineries and Equipments) :** প্রকল্প প্রতিবেদেন প্রয়োজনীয় মেশিন ও যন্ত্রপাতির একটি তালিকা পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ দিতে হবে অর্থাৎ মেশিনের দাম আকার ও আকৃতি, ধরন, দাম এবং যোগানের উৎসসমূহ।

i) **প্রযুক্তি (Technology) :** প্রযুক্তি নির্বাচন এবং প্রযুক্তি পাওয়ার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়।

3. বাজার সম্ভাবনা (Market Potential) : উদ্যোগের সম্ভাব্য পণ্যের বাজার সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা যাতে পাওয়া যায় তার জন্য নীচের বিষয়গুলি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়—

i) পণ্যের চাহিদা ও যোগানের অবস্থা;

ii) পণ্যের প্রত্যাশিত দাম;

iii) বিপণন কৌশল;

iv) বিক্রয় পরবর্তী পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থাসমূহ; এবং

v) পরিবহন ব্যবস্থা

4. মূলধনী ব্যয় ও অর্থের উৎসসমূহ (Capital Cost and Sources of Finance) : উদ্যোগে যে সব মূলধনী দ্রব্য যেমন—জমি ও বাড়ি, মেশিনপত্র ও আসবাবপত্র, মেশিন প্রতিস্থাপন ব্যয় ইত্যাদির জন্য যে মূলধনী ব্যয় করতে হবে তার একটি আনুমানিক হিসাব প্রকল্প প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাথে সাথে এসব ব্যয়ের জন্য অর্থের উৎসগুলিও উল্লেখ করতে হয়।

5. কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ (Estimation of Working Capital Requirement) : মূলধনী ব্যয়ের মতোই উদ্যোগের আনুমানিক কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ও সংগ্রহের উৎসগুলি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়।

6. অন্যান্য আর্থিক দিক (Other Financial Aspects) : এই শিরোনামে উদ্যোগের একটি সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির হিসাব তৈরি করতে হয়। এর থেকে মোট বিক্রয় উৎপাদন ব্যয়, অন্যান্য উপরিব্যয় এবং আনুমানিক লাভ সম্বন্ধে জানা যায়। এছাড়াও একটি সম্ভাব্য উর্দ্বতপত্র ও নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণী তৈরি করলে আরও ভালো হয়। এছাড়াও শিল্প-উদ্যোগের ক্ষেত্রে সমভঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমভঙ্গ বিন্দু অর্থাৎ যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় হলে লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না সেটিও প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।

7. অর্থনৈতিক ও সামাজিক চলকসমূহ (Economic and Social Variables) : কারবারের সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া প্রকল্প থেকে যেসব আর্থ-সামাজিক সুবিধা (Socio-economic benefits) পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে সেগুলিও উল্লেখ করতে হয়। এ ধরনের সুবিধার কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল :

i) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

ii) আমদানির বিকল্প;

iii) রপ্তানি;

iv) স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার;

v) এলাকার উন্নয়ন ইত্যাদি

8. প্রকল্প রূপায়ণ (Project Implementation) : প্রকল্প প্রতিবেদনের এটিই শেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক উদ্যোক্তারই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য একটি কর্মসূচি তৈরি করা আবশ্যক। এই কর্মসূচি প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ যথাসময়ে অর্থাৎ সময়সারণি অনুসারে রূপায়ণের ব্যবস্থা করবে। প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে সময়সূচি অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রকল্প রূপায়ণে দেরি হলে আনুষঙ্গিক ব্যয় বেড়ে যায় বা প্রকল্প রূপায়ণ ব্যর্থ হয়ে পড়ে। কাজেই প্রকল্প রূপায়ণের কার্যসূচি তৈরি করা এবং সেই অনুযায়ী প্রকল্প রূপায়ণ সময়মতো সম্পূর্ণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়ন বা প্রস্তুতি শেষ হয় একটি প্রকল্প রূপায়ণের কর্মসূচি ও সময়সূচির মধ্য দিয়ে।

6.8 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আমরা কারবারি ধারণার উৎসসমূহ এবং সম্ভাব্যতা পরীক্ষা সম্পর্কে এক সুন্দর ধারণা লাভ করতে পারলাম। কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রস্তাব, প্রস্তাবের তাৎপর্য, প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বপরি পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পর্কেও এক সুন্দর ধারণা লাভ করতে পারলাম।

6.9 প্রশ্নাবলী

ক. এমসিকিউ প্রশ্নাবলি

1. কারবারি ধারণার উৎস হিসাবে নীচের কোনটি গণ্য হয়?
   (ক) বাণিজ্যিক প্রদর্শনী ও মেলা
   (খ) উদ্যোক্তার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ
   (গ) অন্য উদ্যোক্তার কাছ থেকে সংগ্রহ করা
   (ঘ) (ক) ও (খ)
2. নীচের কোনটি কারবারি ধারণার উৎস হিসাবে গণ্য হয় না?
   (ক) উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ
   (খ) গবেষণা
   (গ) প্রচলিত পণ্যকে অনুকরণ করা
   (ঘ) কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত ধারণা
3. সম্ভাব্যতা পরীক্ষা মূলত কয় ধরনের?
   (ক) তিন ধরনের (খ) চার ধরনের
   (গ) পাঁচ ধরনের (ঘ) ছয় ধরনের
4. নীচের কোনটি বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষার বিষয় হিসাবে গণ্য হয় না?
   (ক) লগ্নির উপর প্রত্যাশিত আয়ের হার (খ) বিক্রয় পূর্বানুমানের পরিমাণ
   (গ) কোন ধরনের ক্রেতা পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী (ঘ) কারবারের বিক্রয় পূর্বানুমানের পরিমাণ
5. নীচের কোন কাজটি একটি কারবার পরিকল্পনা বা প্রকল্প প্রতিবেদন কাজ হিসাবে গণ্য হয়?
   (ক) পথ প্রদর্শকের কাজ (খ) কারবার পরিচালনার কাজ
   (গ) বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করার কাজ (ঘ) (ক) ও (গ)

উত্তর: 1. (ঘ) 2. (গ) 3. (ক) 4. (গ) 5. (ঘ)

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. সম্ভাব্যতা পরীক্ষা কাকে বলা হয়?
2. কারবার পরিকল্পনা বলতে কি বোঝেন?
3. বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা কাকে বলে?
4. কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।
5. কারবারের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার রূপরেখার দুটি সুবিধা লেখ।
6. কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়া প্রণয়নের দুটি নীতি সম্বন্ধে লেখ।

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. কারবারি ধারণার উৎসসমূহ আলোচনা করুন।
2. বাজার সম্ভাব্যতা এবং বাণিজ্যিক সম্ভাব্যতা কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে?
3. কারবার পরিকল্পনার তাৎপর্য আলোচনা করুন।
4. কারবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।
5. কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া প্রণয়নের নীতিসমূহ আলোচনা করুন।
6. প্রকল্প প্রতিবেদনের বিভিন্ন স্তর যে সমস্ত তথ্য উল্লেখ করে তা আলোচনা করুন।

একক–7 : সম্পদ সংগ্রহ এবং ভারতবর্ষে পারিবারিক কারবারি উদ্যোগ
[Complementary Factors of Entrepreneurship]

7.0 উদ্দেশ্য

7.1 প্রস্তাবনা

7.2 সম্পদ সংগ্রহ সংজ্ঞা

7.3 সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতার ধরণ

7.4 সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতার গুরুত্ব

7.5 সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

7.6 উদ্যোগে অর্থের প্রয়োজনীয়তা

7.7 পারিবারিক কারবার—অর্থ ও সংজ্ঞা

7.8 ভারতবর্ষে পারিবারিক ব্যবসা বা উদ্যোগের ভূমিকা

7.9 পারিবারিক কারবারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

7.10 ভারতের সমকালীন রোল মডেল সমূহ—তাদের মূল্যবোধ, কারবারি দর্শন ও আচরণগত অভিযোজন

7.11 পারিবারিক কারবারি উদ্যোগ বিরোধ ও দ্বন্দ্ব

7.11.1 পারিবারিক কারবারে বিরোধির কারণসমূহ

7.11.2 পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি

7.12 সারাংশ

7.13 প্রশ্নাবলি

7.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে উদ্যোগ উন্নয়ন সম্পর্কিত নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত হবেন—

- সম্পদ সংগ্রহ-এর সংজ্ঞা ও ধরণ
- সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ
- উদ্যোগে অর্থের প্রয়োজনীয়তা

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP Book/ NEC-MG-03 (Entrepreneurship Development)
Unit- 1-8 \ 1st Proof \ (Dt. 12.03.2025)

- পারিবারিক কারবার এর সংজ্ঞা
- ভারতবর্ষে পারিবারিক ব্যবসায় ভূমিকা
- পারিবারিক কারবারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
- ভারতবর্ষের পারিবারিক কারবারের কিছু গুরুত্ব ব্যক্তি, তাদের মূল্যবোধ, দর্শন ও আচরণ
- পারিবারিক কারবারি উদ্যোগ বিরোধ, তার কারণ সমূহ ও বিরোধ নিষ্পত্তি

7.1 প্রস্তাবনা

সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদের গতিশীলতা বলতে কোনো কারবারি সংস্থার নতুন ও অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব কার্যকলাপ করা হয় তাদের বোঝায়। এর মধ্যে সম্পদের অধিক ব্যবহার এবং বিদ্যমান সম্পদের সর্বাধিকীকরণ করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। অনেক সময় একে নতুন কারবারের উন্নয়ন হিসাবেও গণ্য করা হয়। এই একক থেকে আপনারা সম্পদ সংগ্রহ-এর বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হবেন।

7.2 সম্পদ সংগ্রহ—অর্থ ও সংজ্ঞা

সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদের গতিশীলতা বলতে কোনো কারবারি সংস্থার নতুন ও অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব কার্যকলাপ করা হয় তাদের বোঝায়। এর মধ্যে সম্পদের অধিক ব্যবহার এবং বিদ্যমান সম্পদের সর্বাধিকীকরণ করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। অনেক সময় একে নতুন কারবারের উন্নয়ন হিসাবেও গণ্য করা হয়।

'সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদের গতিশীলতার অপর একটি সংজ্ঞা হল যে বিভিন্ন সম্পদ সরবরাহকারীদের থেকে বিভিন্ন উপায়ে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের একটি প্রক্রিয়া'। এই সম্পদগুলির কাম্য ব্যবহারের মাধ্যমেই কারবারি সংস্থার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়। অর্থাৎ এর কাজ হল সময়মতো স্বল্পব্যয়ে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

অপর একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতা হল একটি নতুন উদ্যোগ বা বিদ্যমান কারবারি সংস্থার নতুন বা অতিরিক্ত অর্থ, মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদ সংগ্রহের জন্য গৃহীত কার্যকলাপ যার দ্বারা উদ্যোগের লক্ষ্যপূরণ সম্ভব হয়। এর উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের সুষম উন্নয়নকে (Sustainability) সুনিশ্চিত করা।

একটি উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন পক্ষের সমর্থন যেমন বন্ধুবান্ধবদের সমর্থন, পরিবারের সমর্থন, ডিলারদের সমর্থন, কর্মচারীদের সমর্থন, পরিকাঠামো ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। অর্থাৎ অর্থ সমেত এসব সম্পদকেই সম্মিলিতভাবে সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদের গতিশীলতা বলে।

কাজেই এটি হল প্রকৃতপক্ষে উদ্যোগের স্বপক্ষে বিভিন্ন ধরনের সমর্থন সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া এবং এর অন্তর্ভুক্ত হল নগদ অর্থ ও বস্তুগত সমর্থন। সম্পদ গতিশীলতার উদ্দেশ্য হল সঠিক সময়ে সঠিক দামে সংগ্রহ করা ও সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাতে সেগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়।

7.3 সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতার ধরন

প্রতিটি উদ্যোগের নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে এবং ওই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও এসব কাজকর্ম চালানোর জন্য উদ্যোগকে সম্পদ সংগ্রহ করতে হয় এবং সংগৃহীত সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হয়। এসব সম্পদের সাহায্যেই উদ্যোগ পণ্য বা সেবা উৎপাদন করতে সমর্থ হয় এবং আয় অর্জন করে। এই সম্পদগুলির মধ্যে যেগুলি মূল সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় সেগুলি হল—

i) ভৌত বা বস্তুগত সম্পদ

ii) আর্থিক সম্পদ

iii) মানবিক সম্পদ

উদাহরণস্বরূপ যেসব উৎপাদক 'মাইক্রোচিপ' তৈরি করে তারা মূলধন-নিবিড় উৎপাদন সুবিধা পেতে চায়। অন্যদিকে মাইক্রোচিপের নকশা তৈরি করার পরে এরূপ উদ্যোগ মানবিক সম্পদের উপরই বেশি নির্ভর করে। তবে একটি নতুন উদ্যোগে যদিও আর্থিক সম্পদই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয় তবুও নীচে উল্লিখিত সম্পদগুলির প্রয়োজনীয়তাও কোনো অংশে কম নয়। এগুলি হল—

i) আর্থিক সম্পদ

ii) মেধা সম্পদ

iii) মানবিক সম্পদ

iv) ভৌত সম্পদ

v) শিক্ষামূলক সম্পদ

vi) আবেগমূলক সম্পদ

vii) নৈতিক সম্পদ

viii) সাংস্কৃতিক জ্ঞানজনিত সম্পদ

ix) সম্পর্কভিত্তিক সম্পদ

নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

i. আর্থিক সম্পদ (Financial Resources) : একটি কারবারি উদ্যোগ শুরু করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হল প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা। কারণ অর্থই হল বিনিময়ের মাধ্যম। আর্থিক সম্পদের সাহায্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সহজেই সংগ্রহ করা যায়। এছাড়াও কারবারের আকৃতি-প্রকৃতি

যাই হোক না কেন কম-বেশি প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেই হয়। তাই এধরনের ব্যয় হল প্রাক্ উদ্যোগ সংক্রান্ত ব্যয়। সুতরাং আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করা হল উদ্যোগ গঠনের প্রাথমিক কাজ। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করা যায় কিন্তু এদের মধ্যে সম্পদ সংগ্রহের সহজ উৎসগুলি হল—

(a) উদ্যোক্তার নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করা সবচেয়ে সহজ কাজ।

(b) বিকল্প উপায় হল ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সংগ্রহ করা।

(c) এছাড়াও আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকেও উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত ঋণ নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

(d) যেসব ব্যক্তি উদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক।

এগুলি ছাড়াও নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদ যেসব উৎস থেকে সংগ্রহ করা যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(e) **ভালোবাসার অর্থ (Love Money) :** সাধারণ উদ্যোক্তা স্বামী/স্ত্রীর কাছ থেকে, পিতা-মাতার কাছ থেকে, পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেও ঋণ হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করে। যেহেতু অর্থের উৎসের সাথে উদ্যোক্তার ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে এবং এই ভালোবাসার উপর ভিত্তি করেই অর্থ সংগৃহীত হয়, তাই একে ভালোবাসার অর্থ বলা হয়। ভবিষ্যতের উদ্যোগের লাভ হলে এদের অর্থ ক্রমান্বয়ে পরিশোধ করা হয়।

(f) **উদ্যোগ মূলধন (Venture Capital) :** উদ্যোগ মূলধন তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ উদ্যোগের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস, তবে সব ধরনের উদ্যোগের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই উৎসটি উপযোগী নয়। কারণ উদ্যোগ মূলধন সরবরাহকারী সংস্থা কেবলমাত্র সেসব উদ্যোগেই অর্থ সরবরাহ করতে সম্মত হয় যারা প্রযুক্তি নির্ভর কারবার করে এবং যাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। এরা তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বায়ো-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প উদ্যোগে লগ্নি করতে বেশি আগ্রহী হয়। এছাড়াও, এসব প্রতিষ্ঠান নতুন উদ্যোগের মালিকানার অংশের অর্থ লগ্নি করতে সম্মত হয় যা সব উদ্যোগের ক্ষেত্রে উপযোগী হয় না, তবে সাথে সাথে এরা ঝুঁকির অংশও বহন করে।

(g) **দেবদূত লগ্নিকারী (Angel Investers) :** দেবদূত লগ্নিকারী বলতে বোঝায় যেসব বিত্তশালী ব্যক্তি তাদের সঞ্চিত অর্থ নতুন উদ্যোগে লগ্নি করে। এরা সাধারণত সম্পদশালী পরিবারের সদস্য বা অবসরপ্রাপ্ত কোম্পানি পরিচালক বা প্রধান কার্যনির্বাহী। এদের কারবার পরিচালনায় প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকে। তারা সদ্য গড়ে ওঠা উদ্যোগে মালিকানার বিনিময়ে সরাসরি অর্থ বিনিয়োগ করে। এছাড়াও এরা উদ্যোগ পরিচালনায় অংশগ্রহণও করে যাতে উদ্যোগের কাজকর্মে স্বচ্ছতা থাকে। এসব লগ্নিকারীরা উদ্যোগের ঝুঁকিও বহন করতে সম্মত থাকে।

(h) **কারবারি ইনক্যুবেটর (Business Incubator) :** কারবারি ইনক্যুবেটর বলতে বোঝায় যেসব প্রতিষ্ঠিত কারবার বা কোম্পানি নতুন উদ্যোগকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। এসব

কোম্পানি নতুন উদ্যোগের উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে সহায়তা প্রদান করে, যেমন—উদ্যোগ গড়ে তোলার জায়গা, অফিস সংক্রান্ত সহায়তা প্রযুক্তি ও অন্যান্য সহায়তা, কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের সহায়তা, উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিপণন সংক্রান্ত পরামর্শ ইত্যাদি। অর্থাৎ যে কোম্পানি ইনক্যুবেটর হিসবে কাজ করে তারা নতুন উদ্যোগের সাথে তাদের প্রশাসনিক, পণ্য চলাচল ও প্রযুক্তিগত সম্পদের সুবিধা পেয়ে থাকে। সাধারণত এ ধরনের সাহায্য দেওয়া হয় উদ্যোগ স্থাপনের পর থেকে দুই বছরের জন্য। অর্থাৎ নতুন উদ্যোগের পণ্য বা সেবা বাজারে উপস্থাপিত হওয়ার পর এরা সরে যায় ও নতুন উদ্যোগকে নিজের মতো চলতে দেয়।

(i) **সরকারি অনুদান ও ভর্তুকি (Grants and Subsidy) :** অনেক সময়ই নতন উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি নতুন উদ্যোগকে অনুদান ও ভর্তুকি দিয়ে থাকে। এর পিছনে কারণ হল যাতে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় থাকে ও জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। নতুন উদ্যোগের গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়, বিপণন ব্যয়, বেতন বাবদ ব্যয় এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য অনুদান দিয়ে থাকে। অনুদান (grant) বলতে বোঝায় যেসব সরকারি সাহায্য পরিশোধ করার প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে ভর্তুকি হল উদ্যোগের ব্যয়ের অংশবিশেষ যা সরকার পূরণ করে দেয়, যদি সরকারি শর্ত উদ্যোগ পূরণ করতে সমর্থ হয়।

ii. মেধাসম্পদ (Intellectual Resource) : মেধাসম্পদ বলতে বোঝায় কারবারের এমন এক সম্পদ যা দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না অথচ কারবারের অন্তর্নিহিত মূল্য বাড়িয়ে দেয়। সাধারণত উদ্যোগের কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মেধাসম্পদ বলে গণ্য হয়। এটি হল উদ্যোগের সবকিছুর যোগফল যা উদ্যোগের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এগুলি উদ্যোগের উদ্‌বর্তপত্রে দেখানো হয় না কিন্তু মেধাসম্পদ উদ্যোগকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। বৃহৎ কোম্পানির ক্ষেত্রে মেধাসম্পদ পরিচালনাকে 'জ্ঞান ব্যবস্থাপনা' (kowledge management) হিসাবে অভিহিত করা হয়। বস্তুত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এটি 'মেধা মূলধন' (intellectual capital) হিসাবে গণ্য হয়।

iii. মানবিক সম্পদ (Human Resource) : যেকোনো কারবারি উদ্যোগেরই সাফল্য নির্ভর করে উদ্যোগের মানবিক সম্পদের গুণমানের উপর। কারণ নির্ভরযোগ্য হলে উৎপাদনশীলতা যেমন বৃদ্ধি পায় সাথে সাথে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করাও সহজ হয়। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ কর্মীরাই উদ্যোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেকারণেই উদ্যোগের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যাতে সঠিক কাজের জন্য সঠিক কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ করা সম্ভব হয়। যদিও একটি নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে খুব বেশি সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হয় না তবুও এমন কর্মী নির্বাচন করতে হবে যাদের মধ্যে 'উচ্চ সম্ভাবনা' (High potentiality) থাকে। সুতরাং উদ্যোগের মানবসম্পদ যেন পরিমাণে বেশি না হয়ে গুণগত মানে ভালো হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হয়।

iv. ভৌত ও বস্তুগত সম্পদ (Physical Resource) : কারবারি উদ্যোগ ছোটো বা বড়ো যাই হোক না কেন তাদের কিছু পরিমাণ ভৌত সম্পদের প্রয়োজন হয় এবং একে পরিকাঠামোগত সম্পদও বলা হয়।

ভৌত সম্পদ দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, তার আকার ও আকৃতি থাকে এবং কিছু স্থান জুড়ে থাকে। ঘর-বাড়ি, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যোগাযোগ করার যন্ত্রপাতি, কার্যকরি বিপণন সংক্রান্ত জিনিসপত্র ইত্যাদি। উদ্যোগের সংগৃহীত অর্থের অনেকটাই এইসব ভৌত বা বস্তুগত সম্পদ সংগ্রহের পিছনেই ব্যয় হয়ে যায়। বাস্তবে দেখা গেছে যে অধিকাংশ ছোটো ছোটো উদ্যোগ ভাড়া বাড়িতে বা গ্যারেজে বা খুব ছোটো জায়গা শুরু করা হয়েছে।

v. শিক্ষামূলক সম্পদ (Educational Resources) : একটি নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তা কিছু বাস্তব শিক্ষালাভ করে বা ভবিষ্যতে তাকে উদ্যোগের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। উদ্যোক্তা হিসাবে তার শিল্পোদ্যোগ সম্বন্ধে ধারণা যেমন পরিস্কার হয় তেমনি প্রতিযোগীদের সম্বন্ধেও সে ধারণা পায়। এর ফলে তার কারবারি জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষামূলক সম্পদের উৎসগুলি হল বিভিন্ন বাণিজ্যিক সমিতি (Trade Associations), স্থানীয় চেম্বার অফ্ কর্মাস ইত্যাদি। এছাড়াও উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রশাসনিক সংস্থাগুলি থেকেও বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ পাওয়া যায় যা শিক্ষামূলক সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়।

vi. আবেগজনিত সম্পদ (Emotional Resource) : মানুষ মাত্রই আবেগপ্রবণ এবং উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। একটি উদ্যোগ গড়ে তোলা অত্যন্ত মানসিক চাপের ব্যাপার। আবেগকে সংযত রাখার জন্য উদ্যোক্তার প্রয়োজন হল একটি সহায়ক দল তৈরি করা প্রয়োজনে যাতে তারা উদ্যোক্তাকে সঠিক পরামর্শ দিতে সমর্থ হয় ও উৎসাহিত করতে পারে। এই দলে বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের সদস্য ও দক্ষ পেশাজীবিদের নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। এভাবে তৈরি দলকেই আবেগজনিত সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

vii. নৈতিক সম্পদ (Moral Resource) : নৈতিক সম্পদ গড়ে ওঠে সংহতি বা পারস্পরিক নির্ভরতাজনিত সমর্থন, আইনগত সমর্থন ও সহানুভূতিশীল সমর্থন নিয়ে। এই সম্পদগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া যায় বলে এগুলি সংগ্রহ করা খুব সহজ হয় না।

viii. সাংস্কৃতিক জ্ঞান সম্পদ (Cultural Knowledge Resource) : সাম্প্রতিকালে সাংস্কৃতিক জ্ঞান সম্পদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সম্পদ খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এরূপ সম্পদের উদাহরণ হল কীভাবে একটি দায়িত্ব পালন করতে হয়, কীভাবে রিপোর্টারদের সাথে একটি আলোচনা চক্র চালানো হয়, কীভাবে একটি সভা অনুষ্ঠিত করা হয়, কীভাবে সংগঠন গড়ে তোলা হয়, কীভাবে বিশ্বব্যাপী জ্ঞাতকরণের অন্তর্জাল (www) অনুসন্ধান করতে হয়, একটি উৎসব কীভাবে শুরু করা হয় ইত্যাদি।

ix. সম্পর্ক ভিত্তিক সম্পদ (Relational Resource) : সম্পর্কভিত্তিক সম্পদের মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলি হল ক্রেতা সম্পর্ক, সরবরাহকারী সম্পর্ক, ট্রেড মার্ক বা ট্রেড নাম এবং প্রতিনিধি সম্পর্ক। উদ্যোগের মূল্য বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা অপরিসীম। এর উপর নির্ভর করেই একটি কারবারের সুনাম গড়ে ওঠে। কাজেই সম্পর্কভিত্তিক সুনাম শিরোনাম কারবারের হিসাবে বিশেষ করে উদ্বর্তপত্রে দেখানো হয়।

7.4 সম্পদ সংগ্রহ বা গতিশীলতার গুরুত্ব

একটি কারবারি উদ্যোগ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গড়ে ওঠে। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উদ্যোগ বিভিন্ন কার্যকলাপ গ্রহণ করে। এসব কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য উদ্যোগের বিভিন্ন ধরনের সম্পদের প্রয়োজন হয়। যেহেতু উদ্যোগ একটি কৃত্রিম ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হয় সেকারণে উদ্যোগ নিজে নিজে কোনো কাজ করতে পারে না। তাই তাকে বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ করতে হয় যাদের মধ্যে প্রধান হল বস্তুগত সম্পদ অর্থাৎ কারবারের পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা, আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ করার সাথে সাথে আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি ও মানবিক সম্পদ সংগ্রহ করা যাদের সাহায্যে ও যাদের মাধ্যমে কারবারি উদ্যোগ তার কার্যকলাপ সম্পাদন করে। সংগৃহীত সম্পদের গতিশীলতার মাধ্যমে কারবারি উদ্যোগ পণ্য বা সেবার উৎপাদন করে ও ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে সেগুলির বিপণন করে।

সম্পদ সংগ্রহ ও সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারই একটি কারবারি উদ্যোগে সাফল্য এনে দেয়। এর গুরুত্ব বোঝার জন্য নীচের যুক্তিগুলি তুলে ধরা হল।

(i) উদ্যোগের সম্পদের বিভিন্নতা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধির জন্য সম্পদ গতিশীলতার প্রয়োজন হয়।

(ii) এটি একটি স্বাধীন বাজেট তৈরি করতে সাহায্য করে।

(iii) উদ্যোগের পছন্দসই প্রকল্পে ব্যয় বরাদ্দ করা ও কর্মসূচি সফল করার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা রয়েছে।

(iv) অন্যদের উপর নির্ভরতা কমায়।

(v) এটি প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে।

(vi) এর মাধ্যমে দেশীয় মূলধন ও প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভব হয়।

(vii) উদ্যোগে যাদের স্বার্থ থাকে তাদের সাথে ও সামগ্রিভাবে সমাজের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়।

(viii) কারবারের মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে যার ফলে দীর্ঘকালীন সুবিধা পাওয়া যায়।

7.5 সম্পদ সংগ্রহ বা সম্পদ গতিশীলতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

সংগৃহীত সম্পদ ও তাদের গতিশীলতার ক্ষেত্রে যেসব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) সম্পদের সনাক্তকরণ

(ii) সম্পদ সরবরাহকারীর সনাক্তকরণ

(iii) সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অনুসৃত হয় সেগুলির চিহ্নিতকরণ

(iv) সম্পদ সরবরাহকারীর সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন

(v) সম্পদের সঠিক ব্যবহার

(vi) মানবিক দক্ষতা, সেবা, তথ্য ও যন্ত্রপাতি

(vii) নতুন সম্পদ খুঁজে বের করা

(viii) উদ্যোগের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা

(ix) আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করা।

7.6 উদ্যোগে অর্থের প্রয়োজনীয়তা

উদ্যোগ হল একটি নতুন সংস্থা যা কোনো বিশেষ পূরণের জন্য গড়ে উঠে। আর কারবারি উদ্যোগ হল একটি কারবারি সংস্থা যা উদ্ভাবনের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে এবার যার উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন। কারবার যেমন মূলধন ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না, তেমনি একটি কারবারি উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন হয়। সবধরনের উদ্যোগই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু না কিছু কার্যকলাপ চালায় যা তাদের উদ্দেশ্যপূরণ সাহায্য করে এবং এই কার্যকলাপ চালানোর জন্য তাদের অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থকে যেমন কারবারের জীবন-রক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়, উদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজনীয়তা ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। একটি উদ্যোগের ক্ষেত্রে সম্পদ বা অর্থ, যাই বলা হোক না কেন, সংগ্রহ করা হয় উদ্যোগ গঠনের জন্য, প্রাথমিক ব্যয় মেটানোর জন্য, উদ্যোগের-কার্যকলাপ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সর্বোপরি উদ্যোগের উন্নয়নের জন্য। সম্পদ বা অর্থ ছাড়া উদ্যোগ এক পাও এগোতে পারে না। অর্থই উদ্যোক্তাকে প্রাথমিক বাধাগুলি দূর করতে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে, উদ্ভাবন করতে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে, দীর্ঘকালীন কারবারি স্থায়িত্ব বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি সাফল্য পেতে সাহায্য করে। তাই উদ্যোগে অর্থের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যেসব কারণে উদ্যোগে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেগুলি নীচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

(i) উদ্যোগ শুরু করার জন্য (For starting the venture) : উদ্যোগ শুরু করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় বীজ মূলধনের (seed capital)। সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড় করে এবং সংগৃহীত অর্থ দিয়ে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে, কাজের জায়গা গড়ে তোলে, আসবাবপত্র কেনে এবং প্রাথমিক কার্যনির্বাহী ব্যয় মেটায়।

(ii) উদ্যোগের উন্নয়ন (Growth of entrepreneurship) : উদ্যোগের কাজকর্ম যত বৃদ্ধি পেতে থাকে তত বেশি করে অর্থের প্রয়োজন হয় যাতে উদ্যোগের স্থায়িত্ব বজায় থাকে। অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করে উদ্যোক্তা তার ব্যবসা বাড়ায়, নতুন বাজারে প্রবেশ করে, নতুন পণ্য বা সেবার প্রবর্তন ঘটায় এবং আরও কর্মী নিয়োগ করে।

(iii) উদ্ভাবন ও প্রতিযোগিতামূলক শক্তি (Innovation and competitiveness) : উদ্যোক্তার উদ্ভাবন ও প্রতিযোগিতামূলক শক্তি বৃদ্ধির জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়। কারণ গবেষণার জন্য

প্রযুক্তির সহায়তা নিতে হয় এবং স্বভাবতই অর্থ ব্যয় করতে হয়। দক্ষ কর্মী নিয়োগের জন্যও অর্থ আবশ্যক। এগুলি ছাড়া উদ্ভাবন নিজে নিজে হয় না। একটি উদ্যোগ যদি উপরোক্ত সহায়তা নিতে পারে তাহলে উদ্ভাবন সফল হয় এবং এর ফলে উদ্যোগ প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পায় এবং এই সুবিধাই হল উদ্যোক্তার শক্তি যা তাকে সফল হতে সাহায্য করে।

(iv) দক্ষ কর্মী নিয়োগ (Employment of efficient workers) : একটি উদ্যোগের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে উদ্যোগের মানবিক সম্পদের গুণগত মানের উপর। উদ্যোগের মানবিক সম্পদ অর্থাৎ কর্মীরা যদি দক্ষ হয়, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়, কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে, কাজের প্রতি যত্নশীল হয় ও পরিশ্রমী হয় তাহলে তারা প্রকৃতই উদ্যোগের সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু সবসময় দক্ষ কর্মী পাওয়া যায় না, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হয়। এছাড়াও দক্ষ কর্মীর জন্য উদ্যোগকে বেশি দাম দিতে হয় অথবা প্রশিক্ষণ দিতে হয়। এই উভয় ব্যবস্থাতেই উদ্যোগে অর্থের প্রয়োজন হয়।

(v) ঝুঁকি হ্রাস (Mitigation of risk) : উদ্যোগে প্রয়োজন মতো অর্থের যোগান থাকলে কারবারের ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হয়। যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন থাকলে অর্থের আপৎকালীন চাহিদা মেটানো সহজ হয় এবং কারবারকে অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করতে সাহায্য করে।

(vi) বাজারে প্রবেশ করা (Market penetration) : অর্থ প্রতিযোগিতার বাজারে উদ্যোক্তাকে তার উৎপাদিত পণ্য বা সেবার প্রচার চালাতে, ক্রেতা-ভিত্তি গড়ে তুলতে ও পণ্য শ্রেণি তৈরি করতে সাহায্য করে। এর ফলে উদ্যোক্তা বাজারে প্রবেশ করে বাজার অংশ দখল করতে সমর্থ হয়।

(vii) জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন (Access to expertise) : উদ্যোগের আর্থিক দিকগুলো ভালো হলে উদ্যোক্তা বিভিন্ন অভিজ্ঞ দক্ষ ও জ্ঞানসম্পন্ন শিল্প-উপদেষ্টার পরামর্শ নিতে পারে। তাদের পরামর্শ উদ্যোগের কাজের ক্ষেত্রে জটিলতা হ্রাস করতে সাহায্য করে।

(viii) ব্র্যান্ড তৈরি (Brand building): ব্র্যান্ড হল পণ্যের নাম বা চিহ্ন বা সংকেত যার মাধ্যমে ক্রেতার কাছে পণ্যের পরিচিতি ঘটে। কোনো পণ্যের ব্র্যান্ড একদিনে গড়ে ওঠে না। ধীরে ধীরে ক্রেতাদের পছন্দের মাধ্যমে ব্র্যান্ড হিসাবে গড়ে ওঠে। একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড গড়ে তুলতে পারলে ক্রেতাদের আস্থা ও আনুগত্য অর্জন করা সহজ হয়। অবশ্য এর জন্য পণ্যের প্রসার কর্মসূচি চালানো আবশ্যক এবং এজন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়।

(ix) দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব অর্জন (Sustainability): একটি দীর্ঘকালীন উদ্যোগের স্থায়িত্ব অনেকাংশেই নির্ভর করে তার সম্পদ প্রবাহের ধারাবাহিকতার উপর। সম্পদের লভ্যতার উপরই একটি উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তাই যেসব কারবারের আর্থিক সচ্ছলতা থাকে সেসব কারবারের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব দেখা যায়। কারণ কারবারের কাজকর্ম চালাতে এদের আর্থিক বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। কাজেই উদ্যোগের দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব অর্জনেও অর্থের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

(x) সুযোগের সদ্ব্যবহার (Utilisation of opportunity): কারবারি সুযোগ হঠাৎ করেই উদ্ভুত হয়। কারণ বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তন কখন হবে এবং কখন নতুন সুযোগের সৃষ্টি হবে তা আগাম ধারণা করা সম্ভব নয়। তাই উদ্যোগের আর্থিক অবস্থা ভালো হলে নতুন সুযোগ কাজে লাগাতে অসুবিধা হয় না। অন্যথায় সুযোগকে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। কাজেই কারবারি সম্পদ কারবারের নতুন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কারবারকে এগিয়ে নিয়ে যেতেও সাহায্য করে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় উদ্যোগ বা কারবারের ক্ষেত্রে কারবারি সম্পদ বা অর্থই হল কারবারের জীবন-রক্ত। মানবদেহে রক্তের যতটা গুরুত্ব একটি উদ্যোগ বা কারবারের ক্ষেত্রেও কারবারের সম্পদের গুরুত্বও ততটাই। রক্তের অভাবে মানুষের জীবন যেমন শেষ হয়ে যায় তেমনি অর্থের অভাবে একটি উদ্যোগ রুগ্ন হয়ে পড়ে ও কালক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। তাই উদ্যোগ গড়ে তুলতে, উদ্যোগের কাজকর্ম গতিশীল রাখতে ও উন্নয়ন ঘটাতে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

7.7 পারিবারিক কারবার—অর্থ ও সংজ্ঞা

বিশ্বে অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও পারিবারিক উদ্যোগে বহু কারবারি সংস্থা প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে। পারিবারিক উদ্যোগ বা কারবার বোঝাতে বিভিন্ন শব্দবন্ধের প্রয়োগ হতে দেখা যায়। এই প্রতিশব্দগুলি হল 'পারিবারিক মালিকানা', 'পরিবার নিয়ন্ত্রিত', 'পরিবার পরিচালিত', 'বিজনেস হাউসেস', 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসেস' ইত্যাদি কারবারি সংস্থা।

পারিবারিক উদ্যোগে গঠিত কারবারের যেসব সংজ্ঞা পাওয়া যায় তাদের দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়—পরিকাঠামোগত সংজ্ঞা ও প্রক্রিয়াগত সংজ্ঞা। **পরিকাঠামোগত সংজ্ঞার** (Structured definition) কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হল—

বেরী (Baury) প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হল যে, 'কারবারের মালিকানা একটি মাত্র পরিবারের উপর ন্যস্ত থাকলে তাকে পারিবারিক কারবার বলা হয়।'

রোসেন ব্লাট, ডে মিক, অ্যান্ডারসন ও জনসন (Rosenblate, De Mik, Anderson and Johnson) বলেছেন—'যে কারবারের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানা একটিমাত্র পরিবারের থাকে এবং কারবারের কাজকর্মে অন্তত দুজন সদস্য যুক্ত থাকে তাই হল পারিবারিক কারবার।'

লীচ (Leach) প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'যে কারবারে একটিমাত্র পরিবার কার্যকরভাবে কারবার নিয়ন্ত্রণ করে এবং 50 শতাংশের বেশি ভোটাধিকার থাকে এবং সংস্থার উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপনা পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠে তাই হল পারিবারিক কারবার।'

অন্যদিকে **প্রক্রিয়াগত** সংজ্ঞায় কীভাবে একটি পরিবার কারবারে জড়িত হয় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নীচের সংজ্ঞাগুলি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া হয়েছে।

আর. জি. ডোনেলি (R. G. Donneley)-এর মতানুসারে 'পারিবারিক কারবার হল এমন এক সংস্থা যা পরিবারের অন্তত দুটি প্রজন্ম ওই কারবারের সাথে যুক্ত থাকে এবং সংস্থার নীতিকে প্রভাবিত করে ও সাথে সাথে পরিবারের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে।'

পি. ডেভিস (P. Davis) পারিবারিক উদ্যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'যখন কারবারের নীতি এবং সিদ্ধান্ত পরিবারের একাধিক সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন তাকে পারিবারিক উদ্যোগ বা কারবার বলে। এই প্রভাব সদস্যরা মালিকানা মাধ্যমে বা ব্যবস্থাপনায় যুক্ত থাকার ফলে প্রয়োগ করে। এটি পরিবার ও কারবার এই দু-ধরনের সংগঠনের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠে যা হল পারিবারিক কারবারের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে সংক্ষিপ্ত ও সরলভাবে পারিবারিক কারবারের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, যে কারবার পরিবারের দুই বা ততোধিক সদস্যদের দ্বারা গড়ে ওঠে ও যাদের হাতে কারবারের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ থাকে। অন্যভাবেও বলা যায় যে, পারিবারিক কারবার হল যে কারবারের মালিকানা অথবা ব্যবস্থাপনা একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে।

7.8 ভারতবর্ষে পারিবারিক ব্যবসা বা উদ্যোগের ভূমিকা

ভারতবর্ষে পারিবারিক উদ্যেগে কারবার বা ব্যবসা গড়ে তোলাই প্রাচীন পদ্ধতি। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে সব উদ্যোগ গড়ে উঠেছে তাদের বেশিরভাগই পরিবারের সাহায্য ও সমর্থনে গড়ে উঠেছে। পরিবারের প্রয়োজনে, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এবং পরিবারের সদস্যদের পরিচালনায় ওইসব উদ্যোগ গড়ে উঠেছিল। টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, থাপার, সিংহানিয়া, আম্বানি, আদানি, ডালমিয়া প্রভৃতি পরিবার সফল পারিবারিক উদ্যোগ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল।

পারিবারিক কারবার বা উদ্যোগের উৎস সন্ধান করলে দেখা যায় যে প্রাচীনকালের 'বাজার পদ্ধতি' (bazar system) পারিবারিক উদ্যোগ গঠনে সাহায্য ও সহায়তা করেছে। প্রাথমিকভাবে পারিবারিক কারবার পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও টাকা দাদন দেওয়ার কাজে নিযুক্ত ছিল। এধরনের কারবার কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায় যেমন উত্তর ভারতে জৈন এবং মাড়ওয়ারিদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল। তবে পারিবারিক উদ্যোগে শিল্পসংস্থা গড়ে তুলতে দেখা যায় আধুনিককালেই—ব্রিটিশ রাজত্বকালে ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে।

কাওয়াসজি দাভর (Cawasji Davar) 1854 সালে প্রথম একটি কাপড়ের কল স্থাপন করেন অধুনা মুম্বাইতে। এর ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কিছু ব্যবসায়িক সম্প্রদায় মুম্বাই ও আমেদাবাদে কিছু বস্ত্র বয়ন কারখানার পত্তন করেন। এই সময়ে যেসব ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল তাদের মধ্যে উত্তর ভারতে আগরওয়াল ও গুপ্তা, দক্ষিণে ছেটিয়ার, পশ্চিম ভারতে পার্শি, গুজরাটে জৈন এবং বেনিয়া, মুসলিম খোজা ও মেমনরা এবং সারাভারত জুড়ে মাড়ওয়ারিরা।

ভারতবর্ষে পারিবারিক উদ্যোগের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে পরিবারের নাম করতে হয় সেটি হল একটি পার্শি পরিবার যার কর্ণধার ছিলেন জামসেদজি রুস্তমজি টাটা। তিনি অধুনা

ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাকাত গ্রামে একটি বিশাল ইস্পাত কারখানার পত্তন করেন যা বিশ্ববিখ্যাত। পরবর্তীকালে তাঁর নামে এই এলাকার নাম হয় জামসেদপুর বা টাটানগর। এই শিল্প কারখানা ছাড়াও জামসেদজি টাটা বিভিন্ন ধরনের শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলেছিলেন যাদের মধ্যে নাগপুরে কাপড় কল, মুম্বাই তাজ হোটেল এবং বেশ কিছু আবাসন গড়ে তোলার ব্যবস্থা। টাটাদের এই উদ্যোগ অন্যান্য উদ্যোগী পরিবারকেও উৎসাহিত করে। এর ফলশ্রুতিতে একাধিক পরিবার যেমন বিড়লা, খৈতান, বাঙুর, গোয়েঙ্কা কলকাতায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা গড়ে তোলেন এবং এর ফলে কলকাতা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিকভাবে পারিবারিক ব্যবসায় গড়ে ওঠে ক্ষুদ্রায়তন কারবার যাতে কম মূলধনের প্রয়োজন হত এবং কারবার পরিচালনাও সরল ছিল। কিন্তু যখন উৎপাদন ও নির্মাণ শিল্পেও পারিবারিক উদ্যোগ প্রবেশ করে তখন অনেক বেশি মূলধনের প্রয়োজন পড়ে এবং এই বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ কেবলমাত্র পরিবারের সদস্যদের দিয়ে পরিচালনা করাও দুরূহ হয়ে পড়ে। অথচ তারা বাইরের কোনো ব্যক্তিকে পরিচালনায় অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক হয়, কারণ তারা জানত যে বাইরের ব্যক্তি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করলে পরিবারের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য তারা পরিবারের সদস্যদের বাইরেও আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত করে ও তাদের কারবারের অংশ দিতে শুরু করে। এর ফলে মূলধন সংগ্রহের সমস্যা অনেকটাই মেটে। তবে কারবারের মালিকানার বেশি অংশই পরিবারের হাতে থাকে। এভাবেই যৌথ মূলধনী কারবারের পথ প্রশস্ত হয়। বৃহদায়তন কারবারের নিয়ন্ত্রণ পরিবারের হাতে রাখার জন্য এসময়ই ম্যানেজিং এজেন্সি সিস্টেম চালু হয়েছিল যা 1970 সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। 1970 সালে এই পদ্ধতির বিলোপ ঘটে। ইতিমধ্যে কোম্পানি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পায় এবং ভারতের অধিকাংশ কারবারি প্রতিষ্ঠান কোম্পানি হিসাবে গড়ে ওঠে ও পরিচালিত হতে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে অধিকাংশ কোম্পানিরই নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কতিপয় পরিবারের হাতেই ছিল। 1950-এর দশকে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ **আর. কে. হাজারী** (R. K. Hazari) একটি বিস্তৃত সমীক্ষায় দেখেন যে, ওই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসংস্থাগুলির মালিকানা 18টি ভারতীয় পরিবারের ও 2টি ব্রিটিশ পরিবারের মালিকানায় ছিল। অবশ্য 1950 সালের পর যেহেতু ভারতে কারবারি পরিবেশের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, এর ফলে পারিবারিক কারবারের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। পারিবারিক কারবার ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করে এসেছে সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

(i) স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারতবর্ষের দারিদ্র দূরীকরণে ও বেকারসমস্যা সমধানে পারিবারিক উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ পালন করে আসছে। পারিবারিক কারবারি উদ্যোগের ব্যাপ্তি বিশাল। বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রায় 90 শতাংশ কারবারি সংস্থা এর অন্তর্গত যার মধ্যে অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রায়তন, মাঝারি শিল্পসংস্থা (MSME) যেমন রয়েছে তেমনি অংশীদারি, ঘরোয়া কোম্পানি ও সার্বজনিক কোম্পানিও পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। দেশের শিল্পায়নে পারিবারিক কারবারি উদ্যোগের ভূমিকা সর্বাধিক।

(ii) পারিবারিক উদ্যোগের ভূমিকা বিচার করে বলা হয় এরাই হল ভারতীয় অর্থনীতির মেরুদন্ড। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) 70 শতাংশের বেশি উৎপাদন এই পারিবারিক

উদ্যোগগুলি থেকে আসে। কাজেই দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নিরিখে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(iii) পারিবারিক কারবারগুলি মূলধন গঠনেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। মূলধন লভ্যতার কারণে অতি-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রায়তন, মাঝারি ও বৃহদায়তন পারিবারিক উদ্যোগ গড়ে উঠেছে। এর ফলে মূলধনের কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই মূলধন গঠনে ও মূলধনের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এধরনের কারবার প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

(iv) ভারতীয় অর্থনীতি পারিবারিক উদ্যোগের সাফল্য ও ব্যর্থতার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ সেনসেক্স-এর 500টি কোম্পানির 73 শতাংশ কোম্পানিই পারিবারিক মালিকানাধীন কোম্পানি। নিফ্‌টির 30টি কোম্পানির মধ্যে প্রায় অর্ধেক কোম্পানি পারিবারিক কোম্পানি। অর্থাৎ মূলধন বাজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এসব কারবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই মূলধন বাজারেও এদের অসামান্য ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়।

7.9 পারিবারিক কারবারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

পারিবারিক কারবারের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

1. এক বা একাধিক পরিবারের কিছু সদস্য কেবলমাত্র একটি পারিবারিক কারবারি সংস্থা গড়ে তোলে।
2. পরিবারের সদস্যদের আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে পারিবারিক কারবারে একজন সদস্যের পদমর্যাদা নির্ভর করে।
3. পরিবার কারবারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে মালিকানার ভিত্তিতে অথবা কারবারি সংস্থার পরিচালনার ভিত্তিতে এবং পরিবারের সদস্যরাই পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল দায়িত্বে থাকেন।
4. পরিবার কারবারি নীতি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে যাতে কারবার ও পরিবার উভয়েরই স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।
5. পারিবারিক কারবারি সংস্থার মালিকানা ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মের উপর বর্তায়।
6. ভারতবর্ষের পারিবারিক ব্যবসায় মূলত জাতভিত্তিক (Caste based), প্রত্যেক জাতের নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে যা তাদের পারিবারিক ব্যবসাতেও প্রতিফলিত হয়।

7.10 ভারতের সমকালীন রোল মডেলসমূহ—তাদের মূল্যবোধ, কারবারি দর্শন ও আচরণগত অভিযোজন

ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোল মডেল রয়েছে। তবে কারবারি ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা বিপুল। বিশেষত স্টার্ট-আপ কারবারি ক্ষেত্রে অধুনা অনেক রোল মডেল দেখতে পাওয়া যায় যারা কারবারি ক্ষেত্রে

বিশেষ সাফল্য পেয়েছে এবং অনেকেই সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে গেছে। ভারতের সমকালীন রোল মডেল সম্বন্ধে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমরা এমন কয়েকজন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আলোচনা করছি যারা স্বাধীনোত্তর যুগে ভারতের শিল্প ব্যবস্থাকে অনেক উচ্চতায় তুলে দিয়েছেন এবং অনেক কারবারির আদর্শ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এদের মধ্যে দু-জন পুরুষ ও দু-জন মহিলা রোল মডেল, তাঁদের মূল্যবোধ, কারবারি দর্শন ও আচরণগত অভিযোজন নীচে তুলে ধরা হল।

ধীরুভাই আম্বানি (1932-2002)

ধীরুভাই আম্বানির প্রকৃত নাম ধীরজ লাল হীরাচাঁদ আম্বানি। তিনি গুজরাটের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কালক্রমে একজন ব্যতিক্রমী উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 1960 সালে তিনি মশলার কারবার শুরু করেন মুম্বাইতে এক কামরার একটি ঘরে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির নাম রাখেন **রিলায়েন্স কমার্শিয়াল কর্পোরেশন**। 50 বছরের আগেই কোম্পানিটি ভারতবর্ষের বৃহত্তম বেসরকারি কোম্পানি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'ফরচুন-500' কোম্পানির স্বীকৃতি পায়। তিনি যখন স্কুল ছাত্র ছিলেন তখনও তিনি কারবারি কার্যকলাপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রান্নার ভোজ্য তেল বিক্রয় করতেন এবং গ্রামীণ বাজারে সপ্তাহান্তে গ্রামীণ মেলায় আলু ও পেঁয়াজ ভাজা বিক্রয় করতেন। উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ওই স্কুলের সাধারণ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার সময় জুনাগড় ছিল নবাবের সাম্রাজ্য। ধীরুভাই জুনাগড়কে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তির আন্দোলনে সামিল হন এবং আন্দোলনে সাফল্য লাভ করেন। তাঁর চরিত্রের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি ছিল যার মধ্যে ছিল পরিশ্রম করার ক্ষমতা ও দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি। স্বাধীনতার পর তিনি সমাজবাদী আন্দোলনে যোগদান করেন। রাজনৈতিক সাফল্য পাওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেন কারণ তাঁর হৃদয়ে ব্যবসার প্রতি অদম্য টান ছিল। পারিবারিক দূরবস্থা এবং বাবার অসুস্থতার ফলে তিনি তাঁর স্নাতক স্তরের শিক্ষা করতে পারেননি। ওই সময় সুয়েজ ক্যানেল-এর উপর অবস্থিত **এডেন** (Aden) বন্দরটি অত্যত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং খনিজতেল মজুতের বন্দর হিসাবে বিশ্বে সুপরিচিত ছিল। বছরে প্রায় 6,300 জাহাজ এই বন্দরে নোঙর করত ও ব্যবসায়িক কাজকর্ম করত। সুয়েজ খালের পূর্বদিকে **এ. বেসে এন্ড কোম্পানি** একটি বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ইউরোপীয়, এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার বহু কোম্পানির ব্যবসায়িক প্রতিনিধি ছিল। 1954 সলে এডেনে **শেল রিফাইনারি কোম্পানি** (Shell Refinary Co.) গঠিত হয় ও কোম্পানিটি তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য এ. বেসে এন্ড কোম্পানিকে প্রধান বণ্টনকারী হিসাবে নিয়োগ করে। ধীরুভাই এই কোম্পানির কর্মী হিসাবে বন্দরের ফিলিং স্টেশনগুলি দেখভাল করার দায়িত্ব পান। এখান থেকেই তিনি ভবিষ্যতের নিজস্ব রিফাইনারি গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন।

1958 সালে ধীরুভাই তাঁর স্বল্প সঞ্চয় নিয়ে মুম্বাইতে ফিরে আসেন ও তাঁর মশলার ব্যবসা শুরু করেন। এই ব্যবসাতে তিনি মশলার উচ্চ মান ও ক্রেতাদের সময়মতো মশলা সরবরাহের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্যবসাতে তাঁর মন ভরছিল না এবং তিনি আরও বড়ো কিছু কবার সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি লক্ষ করেন যে সুতো ব্যবসাতে ভালো মুনাফা রয়েছে কিন্তু সাথে সাথে অনেক বেশি

মূলধনের প্রয়োজন, তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে অল্প করে সুতো ব্যবসা শুরু করেন এবং কালক্রমে এই ব্যবসার একজন অগ্রণী ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ধীরুভাই দেখেন যে সুতো বিক্রয় না করে যদি বস্ত্র শিল্প গড়ে তোলা যায় তাহলে মুনাফা আরও বেশি হবে। তাই তিনি 1966 সালে আমেদাবাদের কাছে **নারোদা শিল্প তালুকে** 5000 বর্গগজ পরিমাণ জমি নিয়ে একটি বস্ত্রবয়ন কারখানা গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে এই কারখানা 125 একর জমির উপর বিস্তার লাভ করে। এই কারখানায় উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য তিনি কেবলমাত্র **বিমল** (Only Vimal) নামে সর্বত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। 1990 সাল নাগাদ এই কারখানায় 85,000 শ্রমিক কাজ করত ও বার্ষিক উৎপাদন ছিল 28 লক্ষ কোটি টাকা। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ-এর উন্নয়ন আরও গতি পায় যখন তাঁর দুই ছেলে মুকেশ আম্বানি ও অনিল আম্বানি কারবারে যোগ দেয়। বর্তমানে এই কোম্পানি বস্ত্র শিল্প, পেট্রো-রসায়ন শিল্প, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, টেলি যোগাযোগ (Jio), তথ্য প্রযুক্তি, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে, খুচরো কারবার, মূলধন বাজার ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে কারবার করে। 2002 সালে ধীরুভাই আম্বানির মৃত্যুর পর দুই ভাইয়ের মধ্যে কোম্পানির মালিকানা বণ্টন হয় ও ফ্ল্যাগশিপ রিলায়েন্স কোম্পানি মুকেশ আম্বানির ভাগে পড়ে। উদ্যোক্তা হিসাবে ধীরুভাই আম্বানি সারা বিশ্বজুড়েই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এবং ফেডারেশন ও ইন্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (FICCI) তাঁকে **'বিংশ শতকের উদ্যোক্তা'** (Entrepreneur of the 20th century) শিরোনামে ভূষিত করে।

মূলবোধ (Values) :

(i) আত্মবিশ্বাস

(ii) সততা

(iii) কঠোর পরিশ্রমী

(iv) দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা

(v) কারবারি নৈতিকতা

কারবারি দর্শন (Business Philosophy) : তাঁর কারবারি দর্শন ছিল যে 'তুমি যদি তোমার স্বপ্ন না পূরণ করো তাহলে অন্য কেউ তোমাকে ভাড়া নিয়ে তাদের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে'। বড় কিছু করার চিন্তা করো, দ্রুত চিন্তা করো এবং অন্যদের আগেই চিন্তা করো। ব্যবসায়িক ধারণা কারও একচেটিয়া মালিকানা নয়। মুনাফা পাবার জন্য কেউ তোমাকে আমন্ত্রণ করবে না, তোমাকেই যা করার করতে হবে।

ব্যবহারিক অভিযোজন (Behavioural Orientation) :

(i) সাহসী,

(ii) কৌশলী,

(iii) সৃজনশীলতা,

(iv) সারল্য।

রতন টাটা (Ratan N. Tata)

রতন টাটা, টাটা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ-এর টাটা সন্স অ্যান্ড হোল্ডিং কোম্পানির চেয়ারম্যান ছিলেন 1991 সাল থেকে 2012 সালে অবসর নেওয়ার দিন পর্যন্ত। এছাড়াও তিনি টাটা কোম্পানির অন্যান্য কোম্পানি যেমন—টাটা স্টিল, টাটা গ্লোবাল বেভারেজ, টাটা টেলিসার্ভিস, টাটা মোটর, টি.সি.এস, টাটা কেমিক্যাল ও ইন্ডিয়া হোটেল ইত্যাদিরও চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর কার্যকালে টাটা গ্রুপের আয় অনেক গুণে বেড়ে যায় এবং এর পরিমাণ 2011-12 সালে ছিল 100 বিলিয়ন ডলার। টাটা গ্রুপের অনেক কোম্পানিও বিশ্বে বাজারে নেতৃত্ব দেয়। যেমন টাটা স্টিল বিশ্বের অগ্রণী ইস্পাত উৎপাদক 15টি কোম্পানির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। অনুরূপভাবে টাটা মোটর বিশ্বের 10টি প্রথম সারির বাণিজ্যিক গাড়ি উৎপাদকের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে, টি. সি. এস বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি, টাটা বেভারেজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা-কোম্পানি এবং টাটা কেমিক্যাল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সোডা অ্যাশ তৈরির সংস্থা।

মূলবোধ (Values) :

(i) তোমার দলগত প্রচেষ্টাকে সম্মান জানাও,

(ii) অন্যদের উপর বিশ্বাস (Trust) রাখো

(iii) নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ো না।

কারবারি দর্শন (Business Philosophy) :

(i) কখনোই শেখা ও শোনা বন্ধ করো না,

(ii) একটি ধারণাই পার্থক্য টেনে দেয় (an idea makes a difference),

(iii) সাম্রাজ্যের প্রাপ্য ফিরিয়ে দাও।

ব্যবহারগত অভিযোজন (Behavioural Orientation) :

(i) তোমার সিদ্ধান্তের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখো

(ii) কর্মীদের স্বার্থ দেখা ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।

রোল মডেল হিসাবে মহিলা উদ্যোক্তা

কিরণ মজুমদার শ (Kiran Mazumdar Shaw)

কিরণ মজুমদার একজন ভারতীয় উদ্যোক্তা যিনি ‘বায়োকন লিমিটেড’-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ওষুধ কোম্পানিগুলির মধ্যে ‘বায়োকন’ একটি পরিচিত নাম যেটি বাঙ্গালোরে অবস্থিত। 1953 সালে তাঁর জন্ম এবং বিশপ কটন স্কুলে তাঁর স্কুল শিক্ষা শেষ করে প্রাণীবিদ্যায় অনার্স নিয়ে মাউন্ট কারমেল কলেজ থেকে পাস করেন 1971 সালে। তিনি তাঁর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

পড়াশোনা শেষ করে কিরণ মেলবোর্নে বিয়ার তৈরির শিক্ষানবীশ হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন।

এছাড়াও তিনি কলকাতায় জুপিটার নামক একটি মদ তৈরির কারখানায় প্রযুক্তিগত পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং 1975 থেকে 1977 সাল পর্যন্ত তিনি বরোদায় স্ট্যান্ডার্ড মেকিং কর্পোরেশন-এর প্রযুক্তি ব্যবস্থাপক হিসাবে চাকুরি করেছিলেন।

1978 সালে তিনি **'বায়োকন'** প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রথমদিকে কোম্পানি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম প্রস্তুত করত। পরে এটি একটি বায়োফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। কোম্পানি গবেষণার ক্ষেত্রে বহুমূত্র (Diabetes), ক্যান্সার (Oncology) এবং স্ব-নিরোধক অসুখের উপর গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়। তাঁর এই কাজের জন্য তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে অন্যতম হল 1989 সালে **'পদ্মশ্রী'** ও 2005 সালে **'পদ্মভূষণ'** পুরস্কার। সম্প্রতি **টাইম ম্যাগাজিন** পৃথিবীর 100 জন ক্ষমতাবান মানুষের যে তালিকা প্রকাশ করেছে সেই তালিকায় তিনি স্থান পেয়েছেন। এছাড়াও **ফর্বস** প্রকাশিত বিশ্বের 100 জন ক্ষমতাধর মহিলা হিসাবে এবং টাইমস ম্যাগাজিন বিশ্বের 50 জন মহিলা উদ্যোগপতির যে তালিকা প্রকাশ করেছেন, সেগুলিতেও কিরণ মজুমদার শ-এর নাম রয়েছে। তাছাড়াও তিনি ইন্ডিয়ান স্কুল অফ্ বিজনেস (Indian School of Business) এবং হায়দ্রাবাদে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT)-র মতো দুটি প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমন্ডলীর সদস্য।

মূলবোধ (Values) :

(i) নিজের প্রতি বিশ্বাস (Belief in herself),

(ii) নেতৃত্বদান (Leadership),

(iii) দূরদৃষ্টি (Vision),

(iv) উদ্যমী

(vi) ব্যর্থতাকে ভয় না পাওয়া।

কারবারি দর্শন (Business Philosophy) :

(i) কারবারি নৈতিকতা (Ethics in business),

(ii) নির্ভুল কাজ (Precision in work)

(iii) গুণগত মান বজায় (Quality)।

আচরণমূলক অভিযোজন (Behavioural Orientation) :

(i) সাহসী (Courageous),

(ii) দুঃসময়েও অচঞ্চল (Undeterred by set-backs)

(iii) কর্পোরেট নাগরিকত্ব (Corporate citizenship)।

কল্পনা সরোজ (Kalpana Saroj)

কল্পনা সরোজ একজন দলিত মহিলা, ভারতীয় উদ্যোক্তা, মহারাষ্ট্রের রোশেরখেদা গ্রামে জন্মে ছিলেন।

বর্তমানে তিনি **'কামানি টিউব কোম্পানির'** প্রধান কার্যনির্বাহী (CEO)। কামানি টিউব কোম্পানি ক্রমাগত লোকসানে চলার ফলে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। কল্পনা সরোজ কোম্পানিটি কিনে নেন এবং পুনর্গঠন করেন। অচিরেই কোম্পানি লাভের মুখ দেখে। কিন্তু উদ্যোক্তা হিসাবে কল্পনা সরোজের জীবন সংগ্রাম এতটা সহজ ছিল না।

কল্পনা 12 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় এবং সে তার স্বামীর পরিবারের সাথে মুম্বাইয়ের একটি বস্তিতে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তাকে নানাভাবে নিগ্রহ করায় তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তার বাবা তাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করে গ্রামে ফিরিয়ে আনেন এবং সে মা-বাবার সাথে বসবাস করতে থাকে। গ্রামবাসীরাও তাদের পরিবারকে একঘরে করে দেয় এবং সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। 16 বছর বয়সে সে তার কাকার সাথে মুম্বাইতে বসবাস করার জন্য আসে এবং একটি পোশাক তৈরির কারখানায় কাজ নেয়। এরপর নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য সরকারি ঋণ নিয়ে প্রথমে একটি দর্জির দোকান ও পরে একটি আসবাবপত্রের দোকান শুরু করেন। পরে তিনি আবার তাঁর বিভিন্ন যোগাযোগ ও দক্ষতার জন্য বাড়ি-জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসাতেও সাফল্য অর্জন করেন। ওই সময়ই তিনি 'কামানি টিউব'-এর পরিচালকমন্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হন এবং কোম্পানি দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার ফলে তিনি কোম্পানিটি কিনে নেন ও পুনর্গঠিত করে তাকে মুনাফার মধ্যে নিয়ে আসেন। বর্তমানে তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর আনুমানিক মূল্য 112 মিলিয়ন ডলার। 2013 সালে ভারত সরকার তাঁকে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য **'পদ্মশ্রী'** প্রদান করেন।

মূলবোধ (Values) :

(i) সাফল্যের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,

(ii) অন্যদের অনুপ্রাণিত করাই প্রধান লক্ষ্য

(iii) সামাজিক ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়ানো।

কারবারি দর্শন (Business Philosophy) : একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উদ্যোক্তার থামার কোনো জায়গা নেই।

আচরণগত অভিযোজন (Behavioural Orientation) :

(i) সাহসী (Courageous),

(ii) বেপরোয়া ও অসমসাহসী (Daring)

(iii) লড়াকু (Fighter)।

7.11 পারিবারিক কারবারি উদ্যোগ বিরোধ বা দ্বন্দ

পরিবার-ভিত্তিক কারবারে পরিবারের সদস্য এবং বাইরের যেসব সদস্য কারবার পরিচালনার অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কারণ পারিবারিক কারবার হল বিভিন্ন ব্যক্তির এমন এক সংমিশ্রণ যেখানে কোনো বিষয়ে তাদের মতামত বিভিন্ন হয় এবং মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এছাড়া পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে স্বার্থজনিত টানাপোড়েনের ফলে বিরোধের সৃষ্টি হয় কারণ পরিবারের প্রত্যেক

সদস্যই কারবারের সুবিধা সমানভাবে ভোগ করে যদিও মহিলা সদস্যদের সে অধিকার থাকে না। প্রকৃতপক্ষে যদি পারিবারিক কারবারে কোনো বিরোধ না থাকে তাহলে মনে করা হয় যে সদস্যদের কারবারের ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই বা কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। কাজেই দ্বন্দের অনুপস্থিতি পারিবারিক কারবারের শুভ লক্ষণ নয়। আবার চরম দ্বন্দও কারবারের সমাপ্তি ঘটাতে পারে। তাই বলা হয় যে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে দ্বন্দ থাকা পারিবারিক ব্যবসার পক্ষে মঙ্গল। তবে বিরোধ যাতে চরম জায়গায় না পৌঁছায় এবং শুরুতেই বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারলে পারিবারিক কারবার সুস্থিত হয় এবং সদস্যদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক অনেক মজবুত হয়। তাই পারিবারিক কারবারে বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হলে বিরোধের কারণ বা উৎসকে চিহ্নিত করা দরকার। অন্যথায় বিরোধ-নিষ্পত্তি সহজ হয় না।

7.11.1 পারিবারিক কারবারে বিরোধের কারণ বা উৎসসমূহ

পারিবারিক উদ্যোগের উপর বিভিন্ন সমীক্ষায় পারিবারিক উদ্যোগে বিরোধের যেসব কারণ তুলে ধরা হয়েছে সেগুলি তুলে ধরা হল।

পারিবারিক কারবারে বিরোধের কারণ বা উৎসসমূহ :

1. সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making)
2. কারবারের দিক্‌নির্দেশ (Direction for the business)
3. সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব (Roles and responsibilities)
4. সুযোগ-সুবিধা (Opportunities and Benefits)
5. মালিকানা (Ownership)
6. ব্যক্তিত্বের প্রভেদ (Personality difference)
7. বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা (Estate Plan)
8. বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় (In-laws)
9. জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা (Accountability)
10. ভাইয়ে ভাইয়ে প্রতিদ্বন্দিতা (Sibling rivalry)
11. উত্তরাধিকার (Succession)
12. জ্ঞাতকরণ (Communication)

নীচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল।

1. **সিদ্ধান্তগ্রহণ (Decision making) :** পারিবারিক কারবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি স্বচ্ছতা না থাকে তাহলে বিরোধের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে কার কতটা ক্ষমতা তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিতে হবে। অন্যথায় নির্দেশের একতা

বজায় রাখা যায় না এবং একাধিক সদস্য একাধিক সিদ্ধান্ত নিলে কারবার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেকারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণজনিত মতবিরোধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা দরকার এবং এ-ধরনের বিরোধ পারিবারিক কারবারের সর্বাধিক ক্ষতি করে।

2. **কারবরের দিক্ নির্দেশ (Direction for the business) :** পারিবারিক কারবারের লক্ষ্য কী তা সদস্যদের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। যদি সদস্যদের মধ্যে কারবারের লক্ষ্যপূরণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকে তাহলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

3. **সদস্যদের ভূমিকা ও দায়িত্ব (Role and responsibilities) :** পারিবারিক কারবারের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হল যে সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া হয় না। এর ফলে কারবারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের টানাপোড়েন দ্বন্দের সৃষ্টি করে।

4. **সুযোগ-সুবিধা (Opportunities and benefits) :** বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার তারতম্যও অনেক সময় মতবিরোধের কারণ হয়। ওই সুযোগ-সুবিধা প্রদানে অন্যায় ও অসাম্য থাকলে দ্বন্দ আরও প্রকট হয় বিশেষত পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে।

5. **মালিকানা (Ownership) :** পারিবারিক কারবারের কর্তার দায়িত্ব সর্বাধিক। প্রকৃত মালিকানা ও পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ওই মালিকানার হস্তান্তরের বিষয়টি স্থির করে প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত করা ও পরিবারের সদস্যদে জানানো বাঞ্ছণীয়। এর অন্যথা হলে সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

6. **ব্যক্তিত্বের প্রভেদ (Personality difference) :** কারবারে যেমন পারিবারিক সদস্যরা থাকে তেমনি বাইরের কর্মচারী সদস্যও থাকে। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রভেদ বা পার্থক্য থাকেই। কারবারের কাজ হল এই বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষদের কারবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে লক্ষ্যের দিতে এগিয়ে চলা, যাতে ব্যক্তিত্বের সংঘাত না দেখা দেয়। এজন্য সদস্যদের মধ্যে যাতে খোলামেলা জ্ঞাতকরণ ঘটে তার পরিবেশে গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়।

7. **বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা (Estate Plan) :** বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা যদি পরিস্কার না হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের কাছে তা স্পষ্ট না করা হয় তাহলে তাদের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। আর এই উদ্বেগ থেকেই মতবিরোধ দেখা দেয়। মতবিরোধ চূড়ান্ত আকার নিলে পারিবারিক কারবার বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

8. **বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় (In-laws) :** পুত্রবধূ বা জামাতা বা সদস্যদের স্ত্রী প্রত্যেকেরই পারিবারিক কারবারের প্রতি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থ থাকে। অনেক সময়ই তারা না বুঝেই দ্বন্দের অবতারণা করে ফেলে। সেজন্য তাদের কারবারে কী ভূমিকা তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় মতবিরোধ বৃদ্ধি পায়।

9. **জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা (Accountability) :** পারিবারিক সদস্যদের আবশ্যিকভাবে

জবাবদিহি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তারা যদি প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ সম্পাদনে অপারগ হয় তাহলে এজন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে। অর্থাৎ সকলের জন্য একই নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

10. **ভাইয়ে ভাইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Sibling rivalry) :** বাবা-মায়ের মনোযোগ পাওয়ার জন্য শৈশবকালে ভাই ও বোনেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুবই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু যদি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় হওয়ার পরও তাদের মধ্যে দেখা দেয় তখন তা আর সাধারণ ব্যাপার থাকে না, পরিবারের বা পারিবারিক কারবারের মধ্যে সঙ্কটজনক সমস্যার সৃষ্টি করে। এমনকি এর ফলে পারিবারিক কারবার বিভক্ত হয়ে দুই বা তিনভাগে পরিণত হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 2005 সালে মুকেশ আম্বানি ও অনিল আম্বানির বিরোধ। এর ফলশ্রুতিতে ধীরুভাই আম্বানির ব্যবসা দুই ছেলে ও স্ত্রীর মধ্যে 30 : 30 : 40 অনুপাতে ভাগ হয়ে যায়।

11. **উত্তরাধিকার (Succession) :** একটি প্রচলিত প্রবাদ হল যে পারিবারিক কারবার হল তিন প্রজন্মের। প্রথম প্রজন্ম কারবার গড়ে, দ্বিতীয় প্রজন্ম কারবারকে মজবুত করে ও তৃতীয় প্রজন্ম কারবারকে শেষ করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে 97 শতাংশ পারিবারিক কারবার তৃতীয় প্রজন্মেই শেষ হয়ে গেছে। তাই বলা হয় যে পারিবারিক কারবারের উত্তরাধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিচার-বিবেচনা করে স্থির করতে হয়। উত্তরাধিকার বলতে এখানে প্রধানত ভবিষ্যতে কারবারের নেতৃত্বদানের অধিকারী কে হবে তাকে বোঝায়। প্রত্যেক সদস্যের অভিমতকে গুরুত্ব দিয়ে উত্তরাধিকারী চূড়ান্ত করতে হয়। অন্যথায় মতবিরোধ চূড়ান্ত আকার নেয় ও কারবার গভীর সঙ্কটে পড়ে।

12. **জ্ঞাতকরণ (Communication) :** পারিবারিক কারবারের জ্ঞাতকরণ প্রক্রিয়া দুর্বল হলে অর্থাৎ সদস্যদের কারবারের বিভিন্ন বিষয় সঠিক সময়ে সঠিকভাবে জ্ঞাত করা না হলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয় যা পরবর্তী সময়ে মতবিরোধের সৃষ্টি করে। অস্পষ্ট, অনিয়মিত ও অসম্পূর্ণ বার্তা জ্ঞাপন ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে যা থেকেই মতবিরোধ ও নানা ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের উদ্ভব হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে পারিবারিক দ্বন্দ বা মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার পিছনে উপরের এক বা একাধিক কারণ থাকতে পারে। গঠনমূলক মতবিরোধ বা দ্বন্দ গ্রহণযোগ্য হলেও ধ্বংসাত্মক মতবিরোধ কখনই কাম্য নয় কারণ এর ফলে পারিবারিক কারবারে অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দেয়।

7.11.2 পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি

অল্পমাত্রায় বিরোধের উপস্থিতি প্রতিটি কারবার-সংস্থারই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু যখন সহকর্মী ও কারবারের কর্মচারীরা পরিবারের সদস্য হয় সেক্ষেত্রে পারস্পরিক বিরোধ কারবারের একটি জ্বলন্ত সমস্যা হিসাবে গণ্য হয়। কারণ সদস্যদের মধ্যে বিরোধ পারিবারিক কারবারের অস্তিত্বের উপরই আঘাত করে।

সেকারণেই বলা হয় যে পারিবারিক কারবার তৃতীয় প্রজন্মেই শেষ হয়ে যায়। এর পিছনে প্রধান কারণ হল কারবারের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ। সুতরাং পারিবারিক কারবারের বিরোধ সবসময়ই অন্য মাত্রা পায়। যৌথ মুলধনী কারবারের ক্ষেত্রে সহকর্মীদের মধ্যে বা কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে বিরোধ যাতে সমস্যা সৃষ্টি না করে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং কোম্পানির মানবসম্পদ বিভাগ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু পারিবারিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে যেহেতু পরিবারের সদস্যরাই কারবারের কর্মচারী বা ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করে তাই পরিবার ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য টানা মুশকিল হয়ে পড়ে। কারণ পারিবারিক বিরোধের প্রভাব যেমন কারবারের উপর পড়ে তেমনি কারবারের বিরোধ পরিবারের উপরও পড়ে। কাজেই সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে বিরোধের নিষ্পত্তি করতে না পারলে তা কারবার ও পরিবার উভয়ের মধ্যেই চরম সঙ্কট সৃষ্টি করে। নীচে পারিবারিক কারবারের বিরোধ নিষ্পত্তির পাঁচটি উপায় তুলে ধরা হল।

পারিবারিক কারবারের বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়সমূহ :

(i) নিয়মানুগ প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি
(Reliance on formal Governance structure)

(ii) পরিবারের সদস্যদের ক্ষোভ প্রকাশের ব্যবস্থা করা
(Give family members space to air grievance)

(iii) পারিবারিক ক্ষেত্রে কারবারের আলোচনা নয়
(No business discussion in family domain)

(iv) বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাতকরণ সময়মতো ও দ্রুত করতে হবে
(Timely and fast communication)

(v) বিরোধ বড় ধরনের হলে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে
(Appoint expert to mediate major conflicts)

নীচের এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল :

(i) **নিয়মানুগ প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি (Reliance on formal governance structure) :** অধিকাংশ পারিবারিক কারবারের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পরিবারের সদস্য কারবারের বিভিন্ন বিষয় বিশেষত যেগুলি বিরোধের জন্ম দেয় সেগুলি আলোচনার জন্য কোনো ফোরাম পায় না। নিয়মানুগ প্রশাসনিক কাঠামোতে কিন্তু 'পারিবারিক সংসদ' (family council) এবং 'পারিবারিক ফোরাম' (family forum) থাকে যেখানে সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের বিষয়গুলির নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে। কাজেই নিয়মানুগ প্রশাসন পারিবারিক বা আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মেটাতে সমর্থ হয় কারণ এই কাঠামোর মাধ্যমে কারবারের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনাকে আলাদা করা হয়।

(ii) **পরিবারের সদস্যদের ক্ষোভ প্রকাশের ব্যবস্থা করা (Give family members space to**

air grievances) : পারিবারিক কারবারের সদস্যদের অসন্তুষ্টি, ক্ষোভ, হতাশা ইত্যাদি কারবারে বিরোধের সৃষ্টি করে। এই ক্ষোভ প্রশমিত না হওয়ার ফলেই তা বিক্ষোভে পরিণত হয়। এই বিষয়টি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পরিবারের প্রথম প্রজন্মের সদস্যদের মধ্যে, কারণ তারা তাদের প্রয়োজন ও উদ্বেগ জানানোর কোনো নিরাপদ জায়গা পায় না। যখন এসব সদস্যদের কথা শোনার কেউ থাকে না, তখন ছোট সমস্যাই বড় হয়ে যায়। সেকারণেই বিরোধ এড়ানোর সর্বোত্তম উপায় হল পারিবারিক কারবারের নেতৃত্ব যার হাতে থাকে তাকে ধৈর্যসহকারে অন্যান্য সদস্যদের ক্ষোভ ও উদ্বেগ শুনতে হবে এবং মতবিরোধের বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে দিতে হবে। সুতরাং বয়স্ক ব্যক্তিদের অন্যান্য সদস্যদের কথা শোনার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে এবং মতপার্থক্যের বিষয়গুলি তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে ও উৎসাহিত করতে হবে। তবে বয়স্ক সদস্যরা অবশ্যই বিচারকের মতো আচরণ করবেন না, পারিবারিক কারবারের নেতা হিসাবে তাদের আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলবেন।

(iii) **পারিবারিক ক্ষেত্রে কারবারের আলোচনা নয় (No business discussion in the family domain) :** পারিবারিক কারবারের একটি বড় সমস্যা হল যে পরিবার ও কারবার অনেক সময়ই সমর্থক হয়ে পড়ে। অথচ এরা পৃথক দুটি সত্তা। পরিবার হল একটি সামাজিক সংগঠন, অন্যদিকে কারবার হল একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যেহেতু পরিবারের সদস্যদের দ্বারাই পারিবারিক কারবার পরিচালিত হয় তাই তাদের মধ্যে পার্থক্য টানা দুরূহ হয়ে ওঠে। অনেক সময় পরিবারের সমস্যা কারবারকে প্রভাবিত করে, আবার কারবারি সমস্যা পারিবারিক সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে। কাজেই এই দুই সংগঠনের মধ্যে পৃথকীকরণ ঘটালে সমস্যা অনেকটাই নিরসন হবে বলে মনে করা হয়।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল যে কারবারে কারবারি বিষয়গুলি আলোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করতে হবে। পরিবারের সদস্যরা কারবার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ওই নির্দিষ্ট সময়ে তাদের মতামত দেবে বা অন্যান্যদের সাথে মতামত বিনিময় করবে। এর বাইরে অন্যান্য সময় পারিবারিক সদস্যরা কারবার সংক্রান্ত আলোচনা করবে না, কেবলমাত্র পারিবারিক বিষয়ে তাদের দায়-দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে পরিবারের সদস্যরা 'আলোচনা কেন্দ্রের' (No discussion zone) বাইরে থাকবে বলে তারা অনেক হালকা মনে পরিবারে থাকতে পারবে।

(iv) **বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞাতকরণ সময়মতো ও দ্রুত করতে হবে (Timely and fast Communication) :** কারবারের অধিকাংশ বিরোধের উৎপত্তি ঘটে সঠিক মাত্রায়, সঠিক সময়ে ও সঠিকভাবে কোনো বিষয় পরিবারের সদস্যদের না জানানোর জন্য। সঠিকভাবে জ্ঞাতকরণ করা হলে অনেক সমস্যা শুরুতেই মিটে যায় এবং বিরোধ বাড়তে পারে না। যেসব সদস্যরা নিয়মিতভাবে কারবারের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে তাদের সাথে কারবারের বিভিন্ন

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করার জন্য নিয়মানুগ সভার ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে জটিল বিষয়গুলির উপর সদস্যদের ঐকমত্য হওয়ার সুযোগ ঘটে এবং বিরোধ উৎপত্তির জায়গা থাকে না। অর্থাৎ খোলামেলা জ্ঞাতকরণ বিরোধ-সৃষ্টি ও বিরোধ বেড়ে যাওয়াকে প্রতিরোধ করে। এর দ্বারা সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয় কারণ তারা বুঝতে পারে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের অগোচরে নেই এবং তাদের মতামতও শোনা হয়েছে।

(v) **বড় আকারে বিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ (Appointment of an expert when the problem has been aggravated) :** যখন পারিবারিক বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধারাবাহিক আলোচনা করেও বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না তখন বাইরের কোনো বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এরূপ বিশেষজ্ঞ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার পরও কোনো সমাধানসূত্র পাওয়া না যাওয়ায় মধ্যস্থতাকারীর উপস্থিতিতে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে এবং বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটেছে। কারণ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সদস্যের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় অনুধাবন করে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান সূত্র পেশ করেন যা সকলেই মেনে নেয়। সেকারণেই পরিবারের বাইরের কোনো অভিজ্ঞ, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ করলে অনেক সময়ই ভালো ফল পাওয়া যায় এবং দীর্ঘকালীন পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে অনেক পারিবারিক সমস্যা যা দীর্ঘদিন যাবৎ মেটানো সম্ভব হয় না তা বাইরের দক্ষ মধ্যস্থতাকারীর উপস্থিতিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিটে গেছে। অনুরূপ সমস্যা হয়েছিল 2003 সালে রিলায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ধীরুভাই আম্বানির মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলে মুকেশ ও অনিল আম্বানির মধ্যে প্রায় দু-বছর পর বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে 2005 সালে এবং এই কাজে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

7.12 সারাংশ

উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহ আবশ্যিক। এখানে সম্পদ এর সংজ্ঞা, তার ধরণ, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যিক। শুধু তাই নয়, উদ্যোগে অর্থের প্রয়োজনীয়তা বিষয়টি জানাও জরুরী। এরই সাথে পারিবারিক কারবার বলতে কী বোঝায়, ভারতবর্ষে পারিবারিক কারবারের ভূমিকা জানাও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষে পারিবারিক কারবার কীভাবে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং যার এই কাজে নিয়েজিত ছিলেন এমন কিছু ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। তবে পারিবারিক কারবারে বহু বিরোধ দেখা দেয় এবং কীভাবে সেসব বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয় তা জানাও আবশিক। এই এককটি থেকে আপনারা উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হবেন।

7.13 প্রশ্নাবলি

(ক) এম সি কিউ প্রশ্নাবলি :

1. নীচের কোনটি উদ্যোগের সম্পদগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—
   (ক) বস্তুগত সম্পদ (খ) আর্থিক সম্পদ
   (গ) মানবিক সম্পদ (ঘ) অলীক সম্পদ
2. উদ্যোগের মেধাসম্পদ বলতে কী বোঝায়?
   (ক) মেধা দ্বারা গঠিত সম্পদ
   (খ) উদ্যোগের কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি
   (গ) যে সম্পদ খালি চোখে দেখা যায় না
   (ঘ) যে সম্পদ খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়
3. নীচের কোন্‌টি উদ্যোগের ভৌতসম্পদ হিসাবে গণ্য হয়?
   (ক) অর্থ (খ) শ্রমিক
   (গ) কাঁচামাল (ঘ) সুনাম
4. বিশ্বের প্রাচীনতম পারিবারিক কারবারটি হল ——— এবং এটি ——— এ অবস্থিত। (শূন্যস্থান পূরণ কর)
   (ক) ম্যাকডোনাল্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (খ) ফ্ল্যাট গোষ্ঠী, ইতালি
   (গ) কঙ্গো গুমি, জাপান (ঘ) আলিবাবা, চিন
5. সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পারিবারিক কারবার গড়ে তুলেছিলেন কোন্ সম্প্রদায়?
   (ক) মাড়োয়ারি সম্প্রদায় (খ) পার্শি সম্প্রদায়
   (গ) ছোটিয়ার সম্প্রদায় (ঘ) মেনন সম্প্রদায়

উত্তর ঃ 1. (খ), 2. (খ), 3. (গ), 4. (গ), 5. (ক)।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. সম্পদ সংগ্রহ কাকে বলে?
2. মেধা সম্পদ কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
3. নৈতিক সম্পদ কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
4. মানবিক সম্পদ বলতে কী বোঝায়?

5. আর্থিক সম্পদ সংগ্রহের যেকোনো দুটি উৎস উল্লেখ করুন।
6. উদ্যোগ মূলধন বলতে কী বোঝায়?
7. দেবদূত লগ্নিকারী বলতে কী বোঝায়?
8. আবেগজনিত সম্পদ কাকে বলে?
9. পারিবারিক কারবার কাকে বলে?
10. পারিবারিক কারবারের যে কোনো দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
11. ভারতবর্ষে পারিবারিক উদ্যোগের ভূমিকা (যে কোনো দুটি) উল্লেখ করুন।
12. পারিবারিক কারবারে বিরোধের যে কোনো দুটি কারণ উল্লেখ করুন।
13. পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির যে কোনো দুটি উপায় উল্লেখ করুন।

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. সম্পদ সংগ্রহের বিভিন্ন ধরন আলোচনা করুন।
2. সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
3. সম্পদ গতিশীলতার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
4. পারিবারিক কারবারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
5. ভারতের পারিবারিক উদ্যোগের ভূমিকা আলোচনা করুন।
6. পারিবারিক কারবারে বিরোধের কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।
7. পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন উপায় ব্যাখ্যা করুন।

একক–8 : নতুন উদ্যোগ [Start-up]

8.0 উদ্দেশ্য

8.1 প্রস্তাবনা

8.2 নতুন উদ্যোগ-ধারণা ও সংজ্ঞা

8.3 নতুন উদ্যোগের আবাসস্থল ও উপযোগসমূহ

8.4 বিক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্কার, মূখ্য ক্রেতাদের সাথে প্রাথমিক চুক্তি

8.5 চুক্তির অপরিহার্য বিষয়সমূহ

8.5.1 চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নীতিসমূহ

8.6 নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য অর্থ সংস্থান

8.7 নতুন উদ্যোগের মৌলিক সমস্যাসমূহ

8.8 নতুন উদ্যোগের সমস্যা সমাধানের উপায় সমূহ

8.9 সারাংশ

7.10 প্রশ্নাবলি

8.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি থেকে নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণাগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন—

- নতুন উদ্যোগের ধারণা ও সংজ্ঞা
- নতুন উদ্যোগের আবাসস্থল ও উপযোগসমূহ
- বিক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্কার, মূখ্য ক্রেতাদের সাথে প্রাথমিক চুক্তি
- চুক্তির অপরিহার্য বিষয় ও নীতি সমূহ নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য অর্থসংস্থান
- নতুন উদ্যোগের মৌলিক সমস্যাসমূহ
- নতুন উদ্যোগের সমস্যা সমাধানের উপায় সমূহ

8.1 প্রস্তাবনা

নতুন উদ্যোগ বর্তমানে খুব প্রচলিত উদ্যোগ যা সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠেছে এবং যার ভিত্তি হল পণ্য বা সেবার সম্ভাব্য চাহিদা পূরণ। বাজারে বিভিন্ন ধরনের দাহিদা অবিরত সৃষ্টি হয় এবং সেই সব

D: \ Suvendu \ NSOU\NEP Book/ NEC-MG-03 (Entrepreneurship Development)
Unit- 1-8 \ 1st Proof \ (Dt. 12.03.2025)

চাহিদা পূরণ ও প্রতিযোগিতামূলক দামে তা সরবরাহ করার জন্য নতুন উদ্যোগ হল একটি সমাধান। এই একক থেকে নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে আপনারা ধারণা করতে পারবেন।

8.2 নতুন উদ্যোগ-ধারণা ও সংজ্ঞা

একটি সদ্য গড়ে ওঠা উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপ হল একটি কারবারি সংস্থা বা কোম্পানি যা এখনও উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। এসব কারবারি সংস্থা কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ নতুন উপায়ে করার জন্য চেষ্টা চালায়। কারবারি জগতে এদের সম্বন্ধে এমন কোনো নিয়ম নেই যেগুলি মানলে একটি উদ্যোগকে স্টার্ট-আপ বলা হবে। তবুও স্টার্ট-আপ বলতে বোঝায় উন্নত প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে যেসব উদ্যোগ সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠছে এবং যারা নতুন কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বা কোনো প্রচলিত কাজকে সৃজনশীল উপায়ে রূপায়ণ করে। কাজেই একটি স্টার্ট-আপ হল এমন এক কারবারি সংস্থা যা সাম্প্রতিককালে গড়ে উঠেছে এবং যার ভিত্তি হল পণ্য বা সেবার সম্ভাব্য চাহিদা। এদের উদ্দেশ্য হল বাজারে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা যত শীঘ্র সম্ভব পূরণের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন গ্রন্থকার বা সংগঠন স্টার্ট আপ সংস্থা যেসব সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হল।

অর্থনৈতিক গবেষণার জাতীয় সংস্থা (NBER) প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে "স্টার্ট-আপ হল একটি নতুন গড়ে ওঠা কারবারি সংস্থা, যাদের কোনো অতীত কার্যকলাপ ছিল না এবং এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে খুব দ্রুততার সাথে এদের বৃদ্ধি ঘটে"।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্রায়তন কারবারের প্রশাসন (U.S. Small Business Administration)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী স্টার্ট-আপ হল—"একটি সদ্য গঠিত কারবার যার বিশেষ ভরবেগ থাকে এবং যার লক্ষ্য হল দ্রুত বৃদ্ধি ও বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার"।
- এরিক রাইজ (Eric Ries) একজন গ্রন্থকার যিনি 'The Lean Start-up' গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তাঁর মতে 'স্টার্ট-আপ হল একটি মানবিক প্রতিষ্ঠান যে নতুন পণ্য বা সেবা চরম অনিশ্চয়তার অবস্থান তৈরি করে'।

পরিশেষে বলা যায় স্টার্ট-আপ কারবার মূলত একুশ শতকের অবদান। ই-কমার্স বিপ্লবের সাথে সাথে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে অনলাইন বিপণন সংস্থাও গড়ে উঠতে শুরু করে। 'ফ্লিপকার্ট' গড়ে উঠে 2007 সালে, 'স্নাপডিল' প্রতিষ্ঠিত হয় 2010 সালে এবং অনলাইন খুচরা কারবারের ক্ষেত্রে এদের সাফল্য চমকপ্রদ। ভারত সরকার 2016 সালে স্টার্ট-আপ কারবারের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার মধ্যে উৎসাহ, অনুদান, করছাড় এবং লগ্নি সহায়তা রয়েছে। ভারতবর্ষের পটভূমিকায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও প্রথম সারির স্টার্ট-আপ উদ্যোগ হল ওলা (Ola), পেটিএম (Paytm), জোমাটো (Zomato), বাইজুস (Byju's) ইত্যাদি।

8.3 নুতন উদ্যোগের আবাসস্থল ও উপযোগসমূহ

উদ্যোগের সম্পদ সংক্রান্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেলে উদ্যোক্তা স্পষ্ট ধারণা পায় যে উদ্যোগ গঠনের জন্য কত পরিমাণ এবং কী ধরনের জায়গা লাগবে। সাথে সাথে তাকে এও স্থির করতে হয় যে উদ্যোগস্থলে কী কী পরিষেবা তথা উপযোগিতা থাকা দরকার। কারণ উদ্যোগ যদি উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত না হয় এবং যেসব সুবিধা কারবার চালাতে গেলে অবশ্যই থাকা দরকার সেগুলির ব্যবস্থা আগাম করা না হলে পরে অসুবিধায় পড়তে হয়। কাজেই এই বিষয়গুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। অন্যথায় ভবিষ্যতে কারবার চালিয়ে নিয়ে যাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। কারণ উদ্যোগের জায়গা পরিবর্তন করা সহজ কাজ নয় এবং বারে বারে তা করা সম্ভবও নয়। তাই যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করে স্থান নির্বাচন ও উদ্যোগের জায়গার পরিমাণ স্থির করতে হবে এবং সাথে সাথে এটাও দেখতে হবে যে ওই স্থানে প্রয়োজনীয় পরিষেবার সুবিধা রয়েছে কিনা।

কারবারের অবস্থান ও স্থান নির্বাচন (Location and space selection of Business)

একটি কারবারি উদ্যোগ যখন গড়ে ওঠে তখন তার অবস্থান ও স্থান বা জায়গা নির্বাচনের সময় নীচের বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হয়। এগুলি হল—

(i) কারবার শৈলী অর্থাৎ চিরাচরিত খুচরা বিপণি নাকি বিশেষত্বসূচক বিপণি, নাকি কিয়স্ক ইত্যাদি।

(ii) উদ্যোগের সম্ভাব্য ক্রেতা কারা, তাদের নৈকট্য এবং কত সহজে তারা কারবারের জায়গায় পৌঁছাতে পারবে।

(iii) কারবারের সামনে হেঁটে চলা লোকেদের সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ।

(iv) গাড়ি, বাইক, সাইকেল ইত্যাদি রাখার সুবিধা।

(v) কারবার যে এলাকায় অবস্থিত সেটি পরিবেশ বান্ধব কিনা।

(vi) কারবারের এলাকা কারবার ও ক্রেতাদের পক্ষে নিরাপদ কিনা।

(vii) অন্যান্য কারবার ও বিভিন্ন পরিষেবার অবস্থান কতটা নিকটে।

(viii) কারবারের সরবরাহকারীদের অবস্থান থেকে কারবারের দূরত্ব।

(ix) কী কী পরিকাঠামো তৈরি করার প্রয়োজন পড়বে।

(x) বিভিন্ন পরিষেবা বা সুবিধার অবস্থান ও সে সংক্রান্ত ব্যয়।

(xi) ওই জায়গায় কারবার স্থাপন আইনসম্মত কিনা।

(xii) শ্রমিক, পরিবহন, জ্বালানি, শক্তি, কাঁচামাল ইত্যাদি সহজলভ্য কিনা।

(xiii) ভবিষ্যতে প্রসারণ করার সম্ভাবনা।

উপযোগিতা বা সুবিধাসমূহ (Utilities)

জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য পরিষেবাগুলিকে এককথায় উপযোগিতা বা সুবিধা বলে গণ্য করা হয়। একটি সফল উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলির উপস্থিতি আবশিক। উদাহরণস্বরূপ জল, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কী ধরনের উপযোগিতা উদ্যোগের জন্য প্রয়োজন তা নির্ভর করে কারবারের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর। এসব উপযোগিতা কারবারি কার্যকলাপ ভালোভাবে চালাতেই সাহায্য করে না, সাথে সাথে কর্মীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। একটি নতুন উদোগে যেসব উপযোগিতা থাকা অবশ্যই দরকার যেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল।

(i) **জল** : নতুন উদ্যোগে যথেষ্ট পরিমাণ জলের ব্যবস্থা থাকা দরকার। জল দু-ভাবে কাজে লাগে—উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এবং কর্মীদের খাওয়া, হাত-মুখ ধোওয়া ও টয়লেট-এর জন্য। জল ছাড়া উদ্যোগ একদিনও চলতে পারে না।

(ii) **পয়ঃপ্রণালী** : উদ্যোগের কার্যকলাপের ফলে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থের উদ্ভব হয়। এছাড়া কর্মীরাও টয়লেটে মল-মূত্র ত্যাগ করে যা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কাজেই পয়ঃপ্রণালীর সুবিধা থাকা দরকার।

(iii) **টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা** : বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে টেলিযোগাযোগ ছাড়া কারবার চালানো কল্পনাই করা যায় না। সেকারণে উদ্যোগে সেসব পরিষেবাজনিত সুবিধা থাকা দরকার সেগুলি হল টেলিফোন, অন্তর্জল বা ইন্টারনেট, ফ্যাক্স মেশিন ইত্যাদি।

(iv) **বিদ্যুৎ** : বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলে এক পাও চলা যায় না, উদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানোর জন্যও বিদ্যুতের প্রয়োজন হতে পারে আবার আলো, পাখা, এ.সি. মেশিন ইত্যাদি চালানোর জন্যও বিদ্যুতের দরকার। তাই বিদ্যুতের সুবিধা না থাকলে কারবার গড়ে উঠতে পারে না।

(v) **পার্কিং** : বৃহদায়তন উদ্যোগের ক্ষেত্রে যেমন খুচরা পণ্য বিক্রয়কারী সুপারস্টোর, শপিংমল প্রভৃতি জায়গায় ক্রেতার আগমন ঘটে ও তারা দূর-দূরান্ত থেকে এসব জায়গায় জিনিসপত্র ক্রয় করতে আসে। কাজেই তাদের গাড়ি বাইক ইত্যাদি রাখার জন্য পার্কিং-এর ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

(vi) **ক্যান্টিন** : টিফিন-এর সময় কর্মীরা যাতে খাবার পায় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তবে ছোটো কারবারে যেখানে কর্মী সংখ্যা কম সেখানে এ ব্যবস্থা না থাকলেও চলে। কিন্তু বড়ো উদ্যোগে যেখানে বহু লোক কাজ করে সেখানে ক্যান্টিনের সুবিধা থাকা আবশ্যক।

(vii) **টয়লেট** : উদ্যোগ-স্থানে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট থাকা আবশ্যিক শর্ত। মৌলিক স্বাস্থ্য কল্যাণ, গোপনীয়তা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য টয়লেট অপরিহার্য এবং টয়লেট অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে এবং মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

উপরোক্ত উপযোগ বা পরিষেবা ছাড়াও আরও কিছু পরিষেবা বা সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে কারবারভেদে এসব পরিষেবা কমতেও পারে বা নাও পারে। উদাহরণস্বরূপ পোশাক পাল্টানোর জন্য ঘর—নার্সিংহোম বা হাতসপাতালের ক্ষেত্রে নার্সদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু অন্যত্র সেভাবে প্রয়োজন নাও হতে পারে। তেমনি ফটোকপির সুবিধা, এল.সি.ডি. প্রজেক্টার, ভিডিও কনফারেন্সিং-এর সুবিধা, খাবার ঘর, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি সবক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না।

8.4 বিক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্কার, মূখ্য ক্রেতাদের সাথে প্রাথমিক চুক্তি

প্রাথমিক চুক্তি বলতে বোঝায় একটি উদ্যোগ গঠিত হওয়ার আগে অর্থাৎ উদ্যোগ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্য উদ্যোক্তারা যেসব চুক্তি করে। উদাহরণস্বরূপ উদ্যোগ গঠনের জন্য যদি কোনো সম্পত্তি যেমন বাড়ি, কারখানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য চুক্তি করা হয় বা নতুন কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য চুক্তি করা হয় তাহলে এগুলি এধরনের চুক্তির অন্তর্গত। বস্তুত এই স্তরে যেহেতু উদ্যোগ গঠিত হয়না তাই উদ্যোক্তার সাথেই চুক্তি সম্পন্ন হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত উদ্যোগটি নিবন্ধিত হচ্ছে অর্থাৎ আইনগতভাবে গড়ে উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত এধরনের চুক্তির জন্য উদ্যোগ দায়ী থাকে না। এরূপ চুক্তির আইনগত অবস্থা 1963 সালের Specific Relief Act. 1963 দ্বারা স্থির হয়। এধরনের চুক্তির বৈধতা সংক্রান্ত এই আইনের নির্দেশগুলির তুলে ধরা হল।

(i) 1963 সালের Specific Relief Act প্রবর্তিত হওয়ার আগে এধরনের প্রাথমিক চুক্তি বাতিল (void) বলে গণ্য হত। এর ফলে উদ্যোক্তাদের চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে অসুবিধা হত।

(ii) কিন্তু 1963 সালের Specific Relief Act চালু হওয়ার ফলে উদ্যোক্তারা স্বস্তি পায় কারণ 1963 সালের আগে যেসব চুক্তি করা হয়েছিল সেগুলি বৈধ বলে গণ্য হয়।

(iii) বর্তমানে আইন অনুসারে কোনো কোম্পানির উদ্যোক্তারা কোম্পানির প্রবর্তন তথা নিবন্ধনের আগে যদি কোম্পানির হয়ে এবং কোম্পানির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো ন্যায্য চুক্তি করে থাকে তাহলে কোম্পানি সেই চুক্তি বলবৎ করতে পারে।

8.4.1 বিক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্ক ও প্রধান ক্রেতাদের সাথে প্রাথমিক চুক্তি

যখন একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করা হয় তখন উদ্যোগসংক্রান্ত কার্যকলাপ যাতে সাবলীলভাবে চলতে পারে ও বিভিন্ন পক্ষের সাথে সুসম্পর্ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পক্ষের সাথে যে চুক্তি করা হয় সেগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতে হয়। উদ্যোক্তার প্রাথমিক চুক্তি যাদের সাথে করা হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হল বিক্রেতা, সরবরাহকারী, ব্যাঙ্ক ও প্রধান ক্রেতাসমূহ। এই চুক্তির মাধ্যমেই ভবিষৎ কার্যকলাপের ভিত্তি স্থাপিত হয়। যখন এধরনের প্রাথমিক চুক্তি বিভিন্ন পক্ষের সাথে করা হয় সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

(ক) **বিক্রেতা ও সরবরাহকারীর সাথে প্রাথমিক চুক্তি** (Preliminary Contract with vendor and supplier) : এরূপ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ—

(i) সম্ভাব্য সকল বিক্রেতা ও সরবরাহকারীকে চিহ্নিত করা ও তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য বা সেবা সরবরাহের জন্য প্রস্তাব দেওয়া।

(ii) আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির খসড়া চুড়ান্ত করতে হবে যার মধ্যে এই বাণিজ্যিক অংশীদারির যেসব বিষয় উল্লেখ করতে হয় সেগুলি হল—পণ্য বা সেবার দাম, দাম প্রদানের শর্তসমূহ, পণ্য সরবরাহের সময়সূচি, পণ্যের গুণগত মান এবং অন্য কোনো বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়।

(iii) উদ্যোক্তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে চুক্তিতে পণ্য বা সেবার ওয়ার‍্যান্টি, বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি, চুক্তি রদ্ সংক্রান্ত বিষয়গুলি ও গোপনীয়তার শর্ত স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(iv) উভয়পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ।

(v) চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে উদ্যোক্তাকে অবশ্যই বিক্রেতা ও সরবরাহকারীদের সুনাম, নির্ভরযোগ্যতা ও তাদের কাজের ধারা সম্পর্কে জানতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা না হয়। উদ্যোক্তা সন্তুষ্ট হলে তবেই চুক্তি সম্পাদন করা যায়।

(খ) **ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি** (Contract with Bankers) : উদ্যোগ শুরু করতে ও পরবর্তীকালে উদ্যোগের কাজকর্ম চালিয়ে নিয়ে যেতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এজন্য ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রেও ক্ষণদানকারী সংস্থার সাথে চুক্তি করতে হয়। এধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে নীচের বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

(i) উদ্যোক্তাকে সম্ভাব্য ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হয় এবং যাতে প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাওয়া যায় তার জন্য আবেদন জানাতে হয়।

(ii) ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে উদ্যোক্তার ব্যাঙ্কিং পরিষেবার প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। এর মধ্যে ব্যাঙ্কে একটি ব্যাঙ্ক হিসাব তা সঞ্চয়ী আমানত হিসাব বা চলতি আমানত হিসাব যাই হোক্ না কেন খোলার জন্য আবেদন করতে হবে। এর সাথে কী ধরনের ঋণ বা অন্য কোনো পরিষেবা প্রয়োজন সে ব্যাপারেও আলোচনা করতে হবে।

(iii) ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চুক্তির রূপরেখা তৈরি করতে হয়। এই খসড়া চুক্তিতে চুক্তির মেয়াদ ও শর্তসমূহ, যেমন—ব্যাঙ্কিং পরিষেবা এবং তার জন্য যে ফী দিতে হবে, সুদের হার, ফেরতের সময় ও আনুষঙ্গিক শর্তসমূহ উল্লেখ করতে হয়। এছাড়াও যদি অতিরিক্ত কোনো শর্ত থাকে তাহলে তাও উল্লেখ করতে হয়।

(iv) চুক্তিটি পরীক্ষা করে উদ্যোক্তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে চুক্তিটি নমনীয় এবং ভবিষ্যতে

উদ্যোগের বিস্তার ঘটালে বা অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তা পূরণ করা সম্ভব হবে।

(v) উদ্যোক্তাকে ব্যাঙ্কিং আইন সম্বন্ধে ভালোভাবে জানতে হবে এবং এই আইন অনুসারে যেসব উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেগুলি যাতে সঠিকভাবে মেনে চলা হয় সেব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।

(গ) প্রধান বা মুখ্য ক্রেতাদের সাথে চুক্তি (Contract with principal customers) : উদ্যোগ সফল হতে হলে তার কার্যকলাপ ক্রেতাকেন্দ্রিক হতে হবে। অর্থাৎ ক্রেতাদের দিকে লক্ষ রেখে ও তাদের সন্তুষ্টিবিধানের লক্ষ্যে কারবারি কার্যকলাপ চালাতে হবে। প্রধান বা মুখ্য বা গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতার সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময় উদ্যোক্তার করণীয় বিষয়গুলি নীচে তুলে ধরা হল।

(i) উদ্যোক্তাকে কারবারি ক্ষেত্রে যেসব ক্রেতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাদের সনাক্ত করতে হবে।

(ii) এরপর প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতাদের উদ্যোগের পণ্য বা সেবা সম্বন্ধে বিশদে জানাতে হবে।

(iii) এরপর প্রধান বা মুখ্য ক্রেতাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন, পছন্দ ও প্রত্যাশা সম্বন্ধে উদ্যোক্তাকে জানতে হবে।

(iv) এরপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চুক্তি সম্পূর্ণ করতে হবে এবং চুক্তির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে কারবারি সম্পর্ক, দাম, সরবরাহের সময়সুচি এবং অন্য কোনো শর্ত থাকলে সেগুলি উল্লেখ করতে হবে।

(v) সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে দেখতে হবে যাতে চুক্তির মধ্যে সেবা সরবরাহের বৈধ প্রতিশ্রুতি, মেধাস্বত্ব অধিকার, গোপনীয়তা, দায় এবং বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির উপায়গুলি যেন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

(vi) চুক্তির মধ্যে যেসব গোপন তথ্য ক্রেতাদের জানানো হয় সেগুলির সুরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলিও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার।

(vii) সর্বোপরি উদ্যোক্তাকে চেষ্টা করতে হবে যাতে ক্রেতাদের সাথে দীর্ঘকালীন সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হয় এবং এজন্য ক্রেতাদের ব্যতিক্রমী পরিষেবা দিতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিশেষে বলা যায় যে যদিও প্রাথমিক চুক্তিগুলি আইনত বাধ্যতামূলক নয় তবুও এগুলি রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে এবং যতটা সম্ভব বিশদে চুক্তির শর্তগুলি উল্লেখ করতে হবে। এজন্য উদ্যোক্তার উচিত একজন আইনী পরামর্শদাতার সাথে আলোচনা করা যাতে উদ্যোগের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়। ক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক যত মজবুত হবে কালক্রমে এই প্রাথমিক চুক্তিগুলিই আইনত বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতি হিসাবে গণ্য হবে এবং চুক্তির মাধ্যমে চুক্তির সকল পক্ষের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে।

8.5 চুক্তির অপরিহার্য বিষয়সমূহ

একজন ব্যক্তি বা সংস্থা অপর একজন ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় কারণ বৈধ চুক্তি তাকে আইনানুগ নিরাপত্তা প্রদান করে, এছাড়াও চুক্তির বিষয় সম্পর্কিত একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো দ্রব্য ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহলে চুক্তিতে এই দ্রব্যের আইনানুগ বিবরণ দিতে হবে যাতে বোঝা যায় যে কোন্ দ্রব্য ক্রয়ের চুক্তি হয়েছে। এছাড়াও যাদের মধ্যে চুক্তি হচ্ছে তাদের নাম এবং লেনদেন তাদের কী ভূমিকা তা সুস্পষ্টভাবে দিতে হবে। এছাড়াও একটি বৈধ চুক্তির ক্ষেত্রে যেসব বিষয় অপরিহার্য বলে গণ্য হয় সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল।

ভারতীয় চুক্তি আইনের 10 ধারা অনুযায়ী সমস্ত সম্মতিই চুক্তি বলে গণ্য হবে যদি—

(i) চুক্তিরত বিভিন্ন পক্ষের চুক্তিতে আবদ্ধ হবার যোগ্যতা থাকে;

(ii) আইনসঙ্গত প্রতিদানের সঙ্গে সম্মতি বা সায় স্বেচ্ছাপ্রদত্ত হয়;

(iii) সম্মতির বিষয়বস্তুর বৈধতা থাকে, এবং

(iv) যদি সেই সম্মতি সরাসরি বাতিল বলে ঘোষিত না হয়।

অর্থাৎ কোনো সম্মতি যদি কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পালন করতে পারে, তবেস সেই সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎ-যোগ্য হয়ে চুক্তিতে পরিণত হয়। যে নির্দিষ্ট শর্তগুলি পূরণের ফলে কোনো সম্মতি চুক্তি বলে গণ্য হতে পারে, সেই শর্তসমূহকে চুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বলা হয়।

চুক্তির উপাদানগুলি নীচের রেখাচিত্রে দেখানো হল—

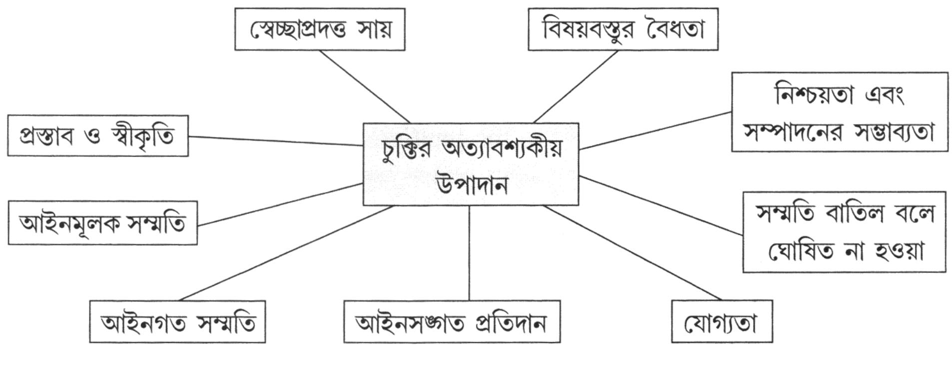

উপরের রেখাচিত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি নীচে বিশদভাবে আলোচনা করা হল :

1. **প্রস্তাব ও স্বীকৃতি** (Offer and acceptance) : চুক্তির উৎপত্তির জন্য ন্যূনতম দুটি পক্ষ থাকা প্রয়োজন। এদের মধ্য এক পক্ষ প্রস্তাব দেয় এবং অপর পক্ষ সেই প্রস্তাব স্বীকার করে। এই প্রস্তাবটি সুনিশ্চিত (Definite) হতে হবে এবং প্রস্তাবের স্বীকৃতিও নিঃশর্ত এবং সম্পূর্ণ (Unqualifid and absolute) হতে হবে। চুক্তি গঠনের জন্য এই ধরনের প্রস্তাব ও তার

স্বীকৃতি আইনসঙ্গত হতে হবে এবং চুক্তি আইনে প্রস্তাব ও স্বীকৃতি সম্বন্ধে যেসব নিয়মকানুন আছে, সেই সব নিয়ম অনুসারেই প্রস্তাব এবং স্বীকৃতি সম্পাদিত হতে হবে।

2. **আইনমুক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা** (Intention to create legal relationship) : যখন দুটি পক্ষ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন অবশ্যই তাদের মধ্যে পারস্পরিক আইনগত সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। আইনমূলক সম্পর্ক বলতে পারস্পরিক দলীয় এবং অধিকারের সম্পর্ককে বোঝায়। যদি তাদের মধ্যে এই সম্পর্ক গড়ে তোলার কোনো অভিপ্রায় না থাকে, তবে তাদের মধ্যে কোনো চুক্তি হওয়া সম্ভব নয়।

   কোনো সামাজিক সম্মতি (Social agreement) যেহেতু দুটি পক্ষের মধ্যে কোনো আইনমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে না, সেজন্য এগুলি চুক্তি হতে পারে না।

   বাণিজিক বা অর্থনৈতিক সম্মতি হওয়া সত্ত্বেও তা চুক্তি বলে বিবেচিত নাও হতে পারে, যদি দেখা যায় যে সম্মতির বিভিন্ন পক্ষ আদৌ নিজেদের মধ্যে আইনমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহী নয়।

3. **আইনসঙ্গত প্রতিদান** (Lawful consideration) : 'প্রতিদান' কথাটির অর্থ হল কোনো সুবিধা বা লাভ যা এক পক্ষের কাছ থেকে অপর পক্ষের কাছে যায়। কোনো 'সম্মতি' আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য হয়ে চুক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য চুক্তিসংশ্লিষ্ট প্রতিটি পক্ষকেই কিছু দিতে হবে এবং তার পরিবর্তে অপর পক্ষের কাছ থেকে কিছু পেতে হবে। চুক্তি বাবদ এই যা কিছু দেওয়া হল বা 'যা কিছু পাওয়া গেল' তাকেই বলে প্রতিদান। এই প্রতিদান যে টাকা বা কোনো দ্রব্য হতে হবে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন, কোনো কাজ করা বা কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকা বা কোনো কাজ না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া, এগুলিও প্রতিদান হিসেবে গণ্য হয়। তবে এই প্রতিদান অবশ্যই আইনসঙ্গত হওয়া চাই। কোনো কিছু না পেয়ে কোনো কাজ করার বা কোনো কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সাধারণত আইনের দ্বারা বলবৎযোগ্য নয় [Abdul Aziz vs. Masum Ali S1914V]।

4. **পঞ্চগণের যোগ্যতা** (Capacity to the parties): চুক্তি আইনের 11 এবং 12 ধারায় বলা হয়েছে যে চুক্তি করার জন্য চুক্তির বিভিন্ন পক্ষের কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। সবাই চুক্তি করতে পারে না। চুক্তি আইন অনুসারে চুক্তির পক্ষগণ নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করতে পারলে তবেই চুক্তি করার যোগ্য বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ, সেই ব্যক্তিই চুক্তি করতে পারে যে-

   (i) প্রাপ্তবয়স্ক (Major);

   (ii) সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (Sound mind);

   (iii) আইনের দ্বারা চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত নয় (Not disqualified from contracting by any law to which he is subject)।

অন্যভাবে বলা যায় যে, কিছু বিশেষ ক্ষেত্র বাদে অপ্রাপ্তবয়স্ক, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, উন্মত্ত বা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিরা এবং আইনানুসারে চুক্তি সম্পাদনে অযোগ্য ব্যক্তিরা চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

5. **প্রকৃত এবং স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায়** (Free and genuine consent) [ধারা 13 এবং 14] : চুক্তি সম্পাদনের জন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, তখন বলা হয় যে তারা, স্বেচ্ছাপ্রদত্তভাবে সায় দিয়েছে। যদি বলপ্রয়োগ (Coercion), অনুচিত প্রভাব (Undue influence), প্রতারণা (Fraud) মিথ্যা বর্ণনা (Misrepresentation), ভুল (Mistake) ইত্যাদির দ্বারা সায় প্রদত্ত হয় তখন তাকে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সায় হিসেবে গণ্য করা হয় না।

6. **বিষয়বস্তুর বৈধতা** (Lawful object) [ধারা 23] : চুক্তির বিষয়বস্তু অবশ্যই আইনসঙ্গত ও বৈধ হওয়া প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায় যে, সম্মতির বিষয়বস্তু কখনোই অবৈধ, নীতিবিগর্হিত বা জনস্বার্থের বিরোধী হতে পারবে না। কেননা এসব ক্ষেত্রে ঐ সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়।

7. **সম্মতি বাতিল ঘোষিত না হওয়া** (Agreement declared void) [ধারা 24-30] : চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে দেখা দরকার যে সম্মতি যেন দেশের আইনে বাতিল বলে ঘোষিত না হয়। ভারতীয় চুক্তি আইনে নিম্নলিখিত পাঁচ ধরনের সম্মতি বাতিল বলে ঘোষিত:

   (i) বিবাহ-প্রতিবন্ধক সম্মতি [ধারা 26];

   (ii) বাণিজ্য-প্রতিবন্ধক সম্মতি [ধারা 27];

   (iii) মামলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সম্মতি [ধারা 28];

   (iv) অনিশ্চিত সম্মতি [ধারা 29];

   (v) বাজি ধরার সম্মতি [ধারা 30];

8. **নিশ্চয়তা** (Certainty) [ধারা 29] : চুক্তির অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। সম্মতির মধ্যে কোনোরকম অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা থাকলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হয় না। যদি সম্মতি অনিশ্চিত এবং অস্পষ্ট হয় বা সম্মতির অর্থ বোঝা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে সেই সম্মতি কখনোই আইনের দ্বারা কার্যকরী হয় না। নীচের উদাহরণে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল।

9. **সম্পাদনের সম্ভাব্যতা** (Possibility of performance) [ধারা 56] : যে কাজ করা অসম্ভব তা সম্পাদন করার সম্মতি নিষ্ফল বলেই বিবেচিত হয়। অসম্ভব কোনো বিষয় বা কাজ সম্পাদন করার জন্য কোনো সম্মতি আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য হয় না। সম্মতির বিষয়বস্তু সম্পাদনযোগ্য হওয়া দরকার।

10. **আইনগত প্রক্রিয়া** (Legal formalities) [ধারা 10] : চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হতে পারে।

কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চুক্তি লিখিত হয়। আবার আইনগত দিক থেকে কোনো কোনো সময়ে চুক্তি নিবন্ধনের (Registration) প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে চুক্তির আইনগত প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হয়। এখানে আইনগত প্রক্রিয়া বলতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন, যথাযথ স্বাক্ষর ইত্যাদিকে বোঝানো হয়।

8.5.1 **চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিসমূহ** [General principles for entering into contracts]

একটি চুক্তির সৃষ্টি হয় যখন দু-জন ব্যক্তি পরস্পরের জন্য কিছু করতে সম্মত হয় এবং এদের 'চুক্তিবদ্ধ পক্ষ' বলা হয়। এরা কোনো ব্যক্তিবিশেষ হতে পারে বা ব্যাঙ্কার, ক্রেতা, ডিলার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কিছু মানুষের গোষ্ঠী বা কোনো কারবারের প্রতিনিধিও হতে পারে। সাধারণভাবে চুক্তির জন্য একটি দলিল তৈরি করা হয় যাতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর করে। মৌখিক চুক্তিও আইনানুসারে বৈধ হয়। তবে কারবারি ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তিই করা হয় কারণ ভবিষ্যতে যদি দু-পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে লিখিত চুক্তি সেই নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। আবার এমন কিছু চুক্তি আছে যেগুলি অবশ্যই লিখিত হতে হবে এবং আরও কিছু অতিরিক্ত শর্তপূরণ করতে তবেই চুক্তিটি বৈধ বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ-১. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোনো চুক্তি হলে তা অবশ্যই লিখিত হতে হবে।

উদাহরণ-২. একটি সম্পত্তির বান্ধিকী চুক্তি আবশ্যিকভাবে লিখিত হবে এবং 'নোটারি' দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে।

আবার, কিছু ক্ষেত্রে আইন লিখিত চুক্তির কথা না বললেও উদ্যোক্তাদের উচিত হল চুক্তি লিখিত আকারে করা। কেননা মৌখিক চুক্তির ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে চুক্তি সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যা দেখা দিলে সমস্যা সমাধান জটিল হয়ে পড়ে কারণ চুক্তির দু-পক্ষও পৃথক মতামত পোষণ করে। তাই চুক্তির সাধারণ নীতিটি হল যে বাণিজ্যিক চুক্তি লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং চুক্তি লিখিত হলে ভবিষ্যতে চুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে না বা সমস্যা দেখা দিলেও তা সহজেই নিরসন করা যায়। বাস্তবক্ষেত্রে উদ্যোক্তা যখন বিক্রেত, ক্রেতা, ব্যাঙ্কার, সরবরাহকারী ইত্যাদির সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায় সেক্ষেত্রে চুক্তি সংক্রান্ত নীচের বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়।

এই বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ :

(i) চুক্তিতে চুক্তির বিষয়সমূহ অবশ্য সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। চুক্তির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জায়গা থাকা চলবে না এবং পরিষ্কারভাবে চুক্তির শর্তসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

(ii) চুক্তির মধ্যে এমন কোনো বিষয় থাকবে না যা অস্বাভাবিক চরিত্রের। এরকম কোনো শর্ত থাকলে উভয়পক্ষের আগাম অনুমতি থাকতে হবে।

(iii) চুক্তির শর্তগুলি যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যেখানে সম্ভব সাধারণ ও বিশেষ শর্তগুলি একটি প্রমাণ আকৃতির চুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা বাঞ্ছনীয়।

(iv) যেক্ষেত্রে প্রমাণ আকৃতর চুক্তি ব্যবহার করা হয় না সেক্ষেত্রে আসনত ও আর্থিক পরামর্শ নিয়ে চুক্তির বিষয়গুলি চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় এবং চুক্তিতে উভয়পক্ষের সম্মতিসূচক স্বাক্ষরের আগেই ওই পরামর্শ নিতে হবে।

(v) চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগেই উদ্যোক্তাকে চুক্তিপত্রের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় ভালোভাবে জানতে হবে এবং দেকতে হবে যে চুক্তির বৈধতা যেন সুনিশ্চিত হয়।

(vi) চুক্তিবদ্ধ কোনো পক্ষ যদি পরবর্তীকালে চুক্তি পালনে অস্বীকার করে এবং আদালতে মামলা হয় তাহলে চুক্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ুপায় হল যদি মামলাকারী ঈশ্বরের কাজ (Act of God) প্রমাণ করতে পারে অর্থাৎ যে কাজ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। অবশ্য চুক্তিতে যদি উল্লেখ থাকে যে 'ঈশ্বরের কাজ'-এর উদনত্মভব হলেও চুক্তির দায় নিষ্কৃতি হবে না তাহলে মামলাকারী তার দায় অস্বীকার করতে পারে।

(vii) সাধারণভাবে একটি চুক্তি বাতিল হতে পারে না। তবে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে চুক্তি বাতিল বা রদ হতে পারে যদি চুক্তিবদ্ধ কখনো পক্ষের চুক্তি করার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে গণ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ একজন নাবালক বা উন্মাদ বা দেউলিয়া ব্যক্তি চুক্তি করার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে গণ্য হয় এবং এরূপ ব্যক্তি চুক্তির পক্ষ হলে সেই চুক্তি গোড়া থেকেই বাতিল বলে গণ্য হয় (void abinitio)।

(viii) যদি কোনো চুক্তি বাতিল হয় তাহলে চুক্তির উভয়পক্ষ পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ তারা চুক্তি সম্পাদনের আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায়। কারণ চুক্তি বাতিল হলে চুক্তির আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এমতাবস্তায় উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তিসংক্রান্ত যেসব লেনদেন ঘটেছিল তা ফেরত দিতে হয়।

(ix) সাধারণভাবে একটি চুক্তি উভয়পক্ষের আলোচনা ও সম্মতির মাধ্যমে চূড়ান্ত হয়। কিন্তু ভোগ্যপণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার কোনো সুযোগ থাকে না। এরূপক্ষেত্রে ক্রোতা/ভোক্তার নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থাও আইনে আছে। এধরনের চুক্তিতে যদি অন্যান্য কোনো শর্ত বিক্রেতা উল্লেখ করে তাহলে সেগুলি বাতিল বলে গণ্য হয় এবং এ ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে প্রমাণ আকৃতির চুক্তির (Standard from of Contract) নীতি অনুসৃত হয়।

8.6 নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য অর্থ সংস্থান

নতুন উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগপতিরা যে সকল সূত্রের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেন নিচে সে সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হল—

(i) **বুটস্ট্র্যাপিং** (Bootshapping) : যে সব উদ্যোগ প্রতিষ্ঠাতা তারা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় বা

তাদের ব্যবসার আয় বা পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে উদ্যোগ শুরু করতে চান, সেই পদ্ধতিকে বুটস্ট্যাপিং বলে। এই পদ্ধতিতে তারা মালিকানা বজায় রাখতে পারেন, কিন্তু তহবিলের সীমাবদ্ধতার কারণে নতুন উদ্যোগ বেশি বাড়তে পারে না।

(ii) **দেবদূত বিনিয়োগকারী** (Angle investor) : এনারা হলেন সেই সব বিত্তশালী ব্যক্তি যারা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ নতুন উদ্যোগে লগ্নি করে। এরা সাধারণত সম্পদশালী পরিবারের সদস্য বা অবসরপ্রাপ্ত কোম্পানি পরিচালক বা প্রধান কার্য্যনির্বাহী। ভারতবর্ষে বিশিষ্ট দেবদূত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বিশিষ্ট জন হলেন স্বর্গত রতন টাটা, কুনাল শাহ। এছাড়াও রয়েছে ইন্ডিয়ান আঞ্জেল নেটওয়াক, মুম্বাই অ্যাঞ্জেলস এবং চেন্নাই অ্যাঞ্জেলস।

(iii) **উদ্যোগ মূলধন** (Venture Capital) : উদ্যোগ মূলগঠন সংস্থার মাধ্যমে নতুন উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ হয়। তবে সব ধরনের উদ্যোগের ক্ষেত্রেই এই উৎসটি উপযুক্ত নয়। কারণ এরা সেইসব নতুন উদ্যোগে অর্থ সরবরাহ করে যারা প্রযুক্তি নির্ভর কারবার করে এবং যাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ভারতপর্বে কতগুলি শীর্ষস্থানীয় এই জাতীয় সংস্থা রয়েছে, যেমন সিকোইয়া ক্যাপিটাল, এক্সেল, বলউম ভেঞ্জারস ইত্যাদি।

(iv) **সরকারি প্রকল্প ও অনুদান** (government Schemes and Grants) : ভারত সরকার স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া ইনিসিয়েটিভ, মুদ্রা লোন্স (Mudra Loans) সিডবি-র 'ফান্ড অফ ফান্ড' এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড ট্রাস্ট ফর মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজ এর মতো সংস্থার মাধ্যমে নতুন উদ্যোগকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

(v) **ব্যাঙ্ক ঋণ এবং এন.বি.এফ.সি.** (Bank Loans and NBFC) : ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি ঋণ, কার্য্যকরী মূলধন, ঋণ এবং মেয়াদী ঋণ ব্যাঙ্ক এবং এন.বি.এফ.সি. নতুন উদ্যোগকে প্রদান করে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবসার জন্য নতুন উদ্যোগকে অর্থ সরবরাহ করে থাকে।

(vi) **ক্রাউডফান্ডিং** (Crowdfunding) : একাধিক ব্যক্তি অর্থ সরবরাহকারী হিসাবে পুরস্কার বা সামাজিক প্রভাবের জন্য যদি অর্থ সরবরাহ করে তাকে ক্রাউডফান্ডিং বলে। নতুন উদ্যোগ কেটো (Ketto), ইমপ্যাক্ট গুরু, উইসবেরি নামক ক্রাউডফান্ডিং সংস্থা থেকে প্রাথমিক অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

(vii) **কর্পোরেট ভেঞ্চার ক্যাপিটাল** (Corporate Venture Capital (CVC)) : বড় বড় কোম্পানিগুলি CVC-এর মাধ্যমে নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগ করে তাদেরকে উৎসাহ দেবার জন্য। রিল্যাসে জিও, টাটা ডিজিটাল এবং মাহিন্দ্রা গ্রুপের মতো ভারতীয় সংস্থাগুলি কৌশলগত বিনিয়োগের মাধ্যমে স্টার্ট-আপগুলিকে অর্থ দিয়ে থাকে।

(viii) **প্রাইভেট ইকুইটি এবং শেষ পর্যায়ের বিনিয়োগকারী** (Provate Equity (PE) and Late-stage Investors): বেসরকারী ইক্যুইটি সংস্থাগুলি এবং শেষ পর্যায়ের বিনিয়োগকারীরা স্টার্ট-আপগুলিকে তহবিল দের যেগুলি কাজগুলিকে স্কেল করছে এবং পাবলিক অফার বা অধিগ্রহনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রাইভেট ইক্যুইটি সংস্থা যেমন ব্ল্যাকস্টোন, ওয়ারবার্গ পিঙ্কাস এবং টেমাসেকের মতো সংস্থা প্রমানিত ব্যবসায়িক মডেল অনুসরণ করে স্টার্ট আপে বিনিয়োগ করে।

8.7 নতুন উদ্যোগের মৌলিক সমস্যাসমূহ

নতুন উদ্যোগের যাত্রাপথ অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল। কারণ যে পথে একটি উদ্যোগ যাত্রা শুরু করে তা পরীক্ষিত নয়। তাই শুরু সময়কে অত্যন্ত সঙ্কটজনক বলা হয়। কারণ নতুন উদ্যোগের মূলধন সংগ্রহ করা, উদ্যোগের পরিকাঠামো ও সংগঠন গড়ে তোলা, পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে ও প্রতিযোগীদের মোকাবিলা করা ইত্যাদি নানা কারণে সমস্যা দেখা দেয়। তাই উদ্যোগের প্রাথমিক কাজ হল সমস্যার নিরসন ঘটিয়ে উদ্যোগকে শক্ত ভিতরে উপর দাঁড়া করানো যাতে উন্নয়নের পথে উদ্যোগকে চালনা করা সম্ভব হয়। নতুন উদ্যোগের অর্থাৎ স্টার্ট-আপ সংস্থার সমস্যার তালিকা দীর্ঘ। তাই উদ্যোক্তাকে সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে আগাম ধারণা গড়ে তুলতে হয় এবং সমস্যা মোকাবিলার উপায়ও স্থির করতে হয়। সেজন্য সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব সেগুলিকে চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এবং বাকি সমস্যাগুলির সমাধানের উপায় আগাম স্থির করতে হয়। নতুন উদ্যোগের সম্ভাব্য মৌলিক সমস্যাগুলি সন্নিবেশিত করলে আমরা নীচের তালিকাটি পাই—

নতুন উদ্যোগ তথা স্টার্ট-আপের মৌলিক সমস্যাবলি

(i) কারবারি ধারণার উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা

(ii) মূলধন সংগ্রহজনিত সমস্যা

(iii) কারবারি মডেলের ব্যর্থতা

(iv) দুর্বল ব্যবস্থাপনা

(v) তারল্য বা অর্থের অভাব

(vi) পণ্যের সমস্যা

(vii) ভালো কর্মী পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা

(viii) ভালো ক্রেতা পাওয়ার সমস্যা

(ix) প্রতিযোগীদের মোকাবিলা

(x) কারিবারি বাধা এবং অপ্রত্যাশিত ব্যয়

এই সমস্যাগুলি নতুন উদ্যোগের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই বাধাগুলি মোকাবিলা করা উদ্যোক্তার প্রধান কাজ বলে গণ্য হয়। উদ্যোগের এই সমস্যাগুলিই হল মৌলিক প্রকৃতির। তবে সব উদ্যোগের ক্ষেত্রেই যে সব সমস্যা দেখা দেয় তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন সমস্যা কম-বেশি উদ্যোগের কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। নীচে সমস্যাগুলি আলোচনা করা হল।

(i) **বারবারি ধারণার উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা** (Problems relating to developing business idea): কারবারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে নতুন কোনো ধারণার উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ যে ধারণার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা উজ্জ্বল তাই হল উদ্যোগ ধারণা বা কারবারি ধারণা। তবে সকলে এই ধারণার সন্ধান পায় না। যারা এর সন্ধান পায় তারাই উদ্যোক্তা হিসাবে গণ্য হয় অবশ্য যদি তারা উদ্যোগ ধারণাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়।

বস্তুত বাণিজ্যিক পরিবেশের পরিবর্তন যেমন প্রচলিত বাণিজ্যিক ধারণাকে ধ্বংস করে তেমনি সাথে সাথে নতুন কারবারি সুযোগও সৃষ্টি করে। তথাপি সঠিক কারবারি সুযোগকে সনাক্ত করা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে কারবারি ধারণার পরিবর্তন করা খুব সহজ কাজ নয়। সেজন্য প্রচলিত আছে যে উদ্যোক্তার দেখার দৃষ্টি থাকতে হবে। অন্যান্যরা যাকে সমস্যা হিসাবে দেখে একজন উদ্যোক্তা তাকে সুযোগ হিসাবে দেখে। সুতরাং কারবারি ধারণার উন্মেষ সংক্রান্ত সমস্যা হল প্রাক-উদ্যোগ সমস্যা। আর এই সমস্যা সমাধানের উপরই ভবিষ্যত উদ্যোগের সম্ভাবনা নিহিত থাকে।

(ii) **মূলধন সংগ্রহজনিত সমস্যা** (Problems of raising capital): কারবারি ক্ষেত্রে মূলধনের ৩ প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। উদ্যোগের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। মূলধনকে কারবারের জীবনরক্ত (life blood) হিসাবে গণ্য করা হয়। নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহ করা অত্যন্ত জটিল কাজ। এর কারণ হল যে একটি স্টার্ট-আপ সম্পূর্ণ নতুন ধারণার উপর গড়ে ওঠে যা পরীক্ষিত হয় নি। তাই এরূপ উদ্যোগে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি সর্বাধিক হয়। কাজেই বিনিয়োগকারীরা নতুন উদ্যোগে লগ্নি করতে ইতস্তত করে। একারণেই নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহ করা জটিল হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লগ্নিকারীদের অর্থাৎ মূলধন সরবরাহকারীদের উদ্যোগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বোঝাতে হয় ও তাদের আস্থা অর্জন করতে হয়। আর মূলধন সংগ্রহের সমস্যা না মিটলে উদ্যোগ আর এগোতে পারে না এবং উদ্যোগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(iii) **কারবারি মডেলের ব্যর্থতা** (Failure of business model) : স্টার্ট-আপের ব্যর্থতার পিছনে অন্যতম কারণ হল কারবারি মডেলের ব্যর্থতা। কারবারি মডেল বলতে বোঝায় কারবারের নকা বা রূপরেখা বা যে পথ বা পরিকল্পনা অনুসারে একটি নতুন উদ্যোগ এগিয়ে চলে। অনেক সময়ই উদ্যোক্তারা স্টার্ট-আপের উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিপণন সাফল্য সম্বন্ধে খুব বেশি আশাবাদী হয়ে থাকে। তারা মনে করে যে যেহেতু তারা নতুন পণ্য বা সেবা বাজারে নিয়ে

আসছে যা আরও বেশি উন্নতমানের তাই ক্রেতারা পণ্য ক্রয়ের জন্য উদ্যোক্তার দরজায় লাইন দেবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না এবং উদ্যোক্তারা আশাহত হয়। এর ফলে বিপণন ব্যয়ও বেড়ে যায় এবং নতুন উদ্যোগের উপর আর্থিক চাপ পড়ে।

(iv) **দুর্বল ব্যবস্থাপনা** (Poor management): নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপের ক্ষেত্রে একটি জ্বলন্ত সমস্যা হল উদ্যোগের দুর্বল পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা। উদ্যোক্তা নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটায় একথা ঠিক কিন্তু তার ব্যবসায়িক জ্ঞানও যে প্রখর হবে তার কোনো মানে নাই। স্টার্ট-আপের ব্যবস্থাপনায় সঠিক পরিকল্পনা, সঠিক সংগঠন গড়ে তোলা, কর্মী ও কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো ও সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণ করা হল ব্যবস্থাপনার সাফল্যের পূর্বশর্ত। তাই স্টার্ট-আপ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যদি দুর্বল ব্যক্তিদের উপর দায়িত্ব থাকে তাহলে বিভিন্ন সমস্যা যেমন বিপণন কৌশল তৈরি ও প্রয়োগে দুর্বলতা, পণ্য নকশায় ত্রুটি ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয় যা উদ্যোগের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

(v) **আর্থিক তারল্য না থাকা বা অর্থের অভাব** (Liquidity or crash cunch): নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি অত্যন্ত প্রকট এবং একটি স্টার্ট-আপ কারবার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে এটি একটি অন্যতম কারণ। স্টার্ট-আপের সংগৃহীত অর্থ যদি স্থায়ী সম্পত্তি সংগ্রহ করতেই ব্যয় হয়ে যায় এবং দৈনন্দিন কারবারি কার্যকলাপ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধন অর্থাৎ নগদ অর্থ না থাকে তাহলে নতুন উদ্যোগ অত্যন্ত সমস্যায় পড়ে। কাজেই উদ্যোক্তাদের আগাম পরিকল্পনা করা প্রয়োজন যে সংগৃহীত অর্থ কীভাবে ব্যবহার করা হবে এবং যাতে দৈনন্দিন কাজকর্ম কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়। এজন্য উদ্যোগের একটি সম্ভাব্য নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করা দরকার এবং সাথে সাথে এও দেখা দরকার যে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তারল্য যেন কাম্য স্তরের নীচে না যায়।

(vi) **পণ্যের সমস্যা** (Product problem): একটি স্টার্ট-আপ কারবার নতুন কোনো পণ্য বা সেবার উৎপাদন বা আরও উন্নত পদ্ধতিতে সেগুলি উৎপাদনের লক্ষ্যে গড়ে ওঠে। নতুন পণ্য বা সেবার মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রচলিত পণ্য বা সেবার চেয়ে অধিক উপযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্য বা সেবা যেন ক্রেতাদের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়। আর পণ্য বা সেবা যদি বাজারের চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয় তাহলে নতুন উদ্যোগ কিছুতেই সফল হতে পারে না। এর পিছনে হয়তো প্রকল্প রূপায়ণে ঘাটতি থাকতে পারে বা কৌশলজনিত ঘাটতি থাকতে পারে। সুতরাং পণ্যের মধ্যে যাতে কোনো ত্রুটি বা কৌশলজনিত কোনো ঘাটতি না থাকে সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

(vii) **ভালো কর্মী পাওয়ার সমস্যা** (Problem of finding good employees): কারবারের কর্মীরাই হল প্রকৃত সম্পদ কারণ তারাই কারবারের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদন করে। সেজন্য ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিতে উদ্যোগের কর্মীদের মানবসম্পদ বলা হয় এবং এই

সম্পদ উদ্যোগের অন্যান্য সম্পদকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে উদ্দেশ্যপূরণে সাহায্য করে। একটি নতুন উদ্যোগ অর্থাৎ স্টার্ট-আপ যেহেতু ছোটো আকারে শুরু করা হয় এবং তার আর্থিক ক্ষমতাও সীমিত থাকে তাই ভালো কর্মী সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়। বস্তুত ভালো কর্মী বলতে বোঝায় যারা পরিশ্রমী, সৎ এবং দক্ষ। এ-ধরনের কর্মী পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার কারণ কর্মীদের মানসিকতা হল তারা আশা করে যে কম কাজ করবে কিন্তু বেশি মজুরি বা পারিশ্রমিক পাবে। সুতরাং ভালো কর্মী সংগ্রহ করাও একটি নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে বড়ো সমস্যা।

(viii) **ভালো ক্রেতা পাওয়ার সমস্যা** (Problem of finding good customers): স্টার্ট-আপ বা নতুন উদ্যোগের আরও একটি সমস্যা হল উদ্যোগের তৈরি পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত ও ভালো ক্রেতা পাওয়া। কারণ ক্রেতাদের মধ্যে ভালো ও খারাপ উভয় ধরনের ক্রেতাই থাকে। এই খারাপ ক্রেতাদের থেকে উদ্যোক্তাকে সাবধান থাকতে হবে। তবে শুধুমাত্র ভালো ক্রেতা পাওয়া সত্যিই দুরূহ। খারাপ ক্রেতারা উদ্যোগের সুনামকে নষ্ট করে এবং এরাই কু-ঋণের বড়ো কারণ। অন্যদিকে ভালো ক্রেতারা উদ্যোগ গড়ে তুলতে ও উদ্যোগের উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে। তাই উদ্যোক্তার উচিত কাজ হল খারাপ ক্রেতাদের যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা ও তাদের সাথে লেনদেন না করা।

(ix) **প্রতিযোগীদের মোকাবিলা** (Dealing with competitors) : একটি স্টার্ট-আপ উদ্যোগকে শুরুতেই তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হয়। বাজারের প্রতিযোগিতা উদ্যোগের কাছে একটি এমন সমস্যা তৈরি করে যাতে তার অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দেয়। যদিও অধিকাংশ উদ্যোক্তা একে অভিশাপ হিসাবে গণ্য করে তবুও স্বীকার করা হয় যে অল্পবিস্তর প্রতিযোগিতা থাকা ভালো। কারণ প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করার মাধ্যমে উদ্যোগ আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারে। এটি সৃজনশীলতার অনুঘটক হিসাবে কাজ করে এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে উন্নত মানের পণ্য ন্যায্য দামে পাওয়ার পথ প্রশস্থ করে। এও স্বীকার করা হয় যে প্রতিযোগিতা ছাড়া উদ্ভাবন সম্ভব নয় এবং উদ্ভাবন ছাড়া এ পৃথিবী স্থির থাকবে এবং কোনো উন্নয়ন হবে না। **ভিক্টর কিয়াম** (Victor Kiam) এ-ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছিলেন তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তার কথায় কারবারে প্রতিযোগিতা সবসময় কামড় দেবে যদি কারবারকে সচল রাখতে হয়, কিন্তু কারবার যদি এক জায়গায় স্থির থাকে তাহলে প্রতিযোগিতা কারবারকেই গিলে ফেলবে।" সুতরাং প্রতিযোগিতা এমন এক সমস্যা যাকে মোকাবিলা করা উদ্যোগের অন্যতম কাজ।

(x) **অপ্রত্যাশিত কারবারি বাধা ও ব্যয়** (Unexpected business challanges and expenses) : ভবিষ্যৎ সর্বদাই অনিশ্চিত। একজন নাবিক যেমন অপ্রত্যাশিত ঝড়ের জন্য তৈরি থাকে, একজন পাইলট যেমন খারাপ আবহাওয়া ও ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রতি সজাগ থাকে, তেমনি একটি নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপের উদ্যোক্তাকেও অপ্রত্যাশিত বাধা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ও

সতর্ক থাকতে হয়। একটি নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপের ক্ষেত্রে যেসব অপ্রত্যাশিত বাধা বা সমস্যার উদ্ভব হতে পারে সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল—

(ক) অপ্রত্যাশিত মামলা বা মোকদ্দমা

(খ) সরকারি নীতির অসংগতি

(গ) কোনো ভালো কর্মীর অপ্রত্যাশিত পদত্যাগ

(ঘ) ক্রেতাদের থেকে পাওনা অনাদায় অর্থাৎ কু-ঋণ

(ঙ) বাজার অংশের ক্ষতি

(চ) স্বল্প কার্যকরী মূলধন

(ছ) মজুত সম্ভারের অপ্রতুলতা

এই কারবারি বাধাগুলি যদি যথাযথভাবে নিরসন করা না হয় তাহলে নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপ ব্যর্থ বা ধ্বংস হয়ে যায়। এগুলির অতিরিক্ত আর একটি সমস্যা হল অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্যোগের ব্যয় বৃদ্ধি। অপ্রত্যাশিত ব্যয়কে তো বটেই উদ্যোগের সঠিক ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অচিরেই কারবার বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত বাধাগুলির সঠিক মোকাবিলার উপরই নতুন উদ্যোগ তথা স্টার্ট আপের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

8.8 নতুন উদ্যোগের সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

একটি নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপ তার কারবারি জীবনের নানাধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এসব সমস্যার মোকাবিলা বা সমাধানের উপর তার ভবিষ্যৎ অস্তিত্বই শুধু নয়, তার সাফল্যও নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে সাফল্যের সংজ্ঞা হল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা (The ability to solve the problems)। একজন সফল উদ্যোক্তা বলতে বোঝায় যে সহজেই কারবারের সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং ক্রেতাদের প্রয়োজন অধিক কার্যকরভাবে ও ভালোভাবে মেটাতে সমর্থ হয়। নতুন উদ্যোগের উপরে উল্লিখিত সমস্যাগুলির সমাধানে বা সমস্যা হ্রাস করার জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করা হয় সেগুলি নীচে রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

স্টার্ট-আপ সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ—

(i) সমস্যা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা

(ii) বিকল্প পথ অনুসরণ করা

(iii) সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা

(iv) সম্ভাব্য সকল সমাধান-সূত্র সনাক্ত করা

(v) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(vi) প্রাপ্তি স্বীকার ও সংশোধন

(vii) অভ্যন্তরীণ ব্যয় হ্রাস করা

(viii) ঝুঁকিবহনের ভয়কে জয় করা

(ix) মজবুত কারবারি কৌশল তৈরি করা

নীচে সমস্যা সমাধানের প্রতিটি উপায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হল। তবে মনে রাখা দরকার যে সমস্যার গভীরতা ও ব্যপ্তি অনুযায়ী উপায়গুলি এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে সমস্যার পুরোপুরি নিরসন না হলেও সমস্যার তীব্রতা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

(i) **সমস্যা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করা** (Create a clear idea of the problem): সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্যাকে ভালোভাবে জানা দরকার। একজন ডাক্তার যেমন একজন রোগীর সমস্যা মেটানোর জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অসুখ সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করে এবং চিকিৎসা করে তেমনি নতুন উদ্যোগের সমস্যাকে প্রথমে ভালোভাবে জানতে হবে, সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং সবশেষে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে আবার উদ্যোক্তা যেটি সমস্যা হিসাবে দেখে হয়তো তার মধ্যেই ভবিষ্যতের সুযোগ নিহিত আছে। সুতরাং সমস্যাকে ভালোভাবে অনুধাবন না করে সমাধানের পথে এগোনো ঠিক নয়। সমস্যা সমাধান করতে হলে সমস্যার বিভিন্ন দিক ভালোভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং তারপর সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ii) **বিকল্প পথ অনুসরণ করা** (Pursue alternative path): এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা উদ্যোগ দেখা দিলে সেগুলির সমাধান করা সম্ভব নয়। যেমন একজন দক্ষ কর্মীর মৃত্যু হলে সমস্যা সমাধানের সহজ পথ থাকে না। কারণ এগুলি হল জীবনের ঘটনা (event of life)। এরূপ ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণই একমাত্র সমাধান।

(iii) **সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা** (Identification of the cause of problem): সমস্যার সমাধান করতে হলে তার কারণ চিহ্নিত করতে হবে। তাই বলা হয় কারণের বহিঃপ্রকাশই হল সমস্যা। প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করতে পারলে সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সম্ভব। অন্যথায় সমস্যা বারে বারে বারে দেখা দেয় যদিও বহিঃপ্রকাশের ধরন বদলায়।

(iv) **একাধিক সম্ভাব্য সমাধান** (Identification of multiple possible solution): একটি সমস্যার জন্য যতগুলি সমাধানের সম্ভাব্য পথ থাকে সেগুলি চিহ্নিত করা দরকার। কারণ একাধিক সম্ভাব্য সমাধানের তেকে সঠিক সমাধানটি বেছে নেওয়া সহজ হয় এবং স্বীকার করা হয় যে সমাধানের গুণগণত সমাধোনের পরিমাণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে আনুপাতিক।

(v) **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ** (Promt decision making): সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি হলে তা সমস্যাকে আরও গভীর করে তোলে। যে-কোনো সমস্যার একটি সমাধান-সূত্র তৈরি করতে হবে এবং

দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্তের রূপায়ণ ঘটাতে হবে। কিন্তু যদি সমস্যা সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তাই চলতে থাকে যার ফলে সময়ের অপচয় হয় তাহলে সমাধান সূত্রের প্রভাব হ্রাস পায়। এর ফলে উদ্যোগের ব্যয়বৃদ্ধিও ঘটে। অনেক স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তা সিদ্ধান্তহীনতার জন্য বা সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার ফলে ব্যর্থ হয়েছে এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে।

(vi) **প্রাপ্তি স্বীকার ও সংশোধন** (Acknowledgement and correction): অনেক সময় পণ্য বিপণনে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় যা পণ্য বিক্রয়কে স্তিমিত করে দেয়। এই সমস্যার পিছনে যেসব কারণ অনুমান করা হয় সেগুলি হল পণ্যে ঘাটতি বা প্রতিযোগীদের পণ্য সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার যাতে তাদের পণ্য-বিক্রয় সহজ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের উপায় হল যে উদ্যোগের পণ্য-বন্টনকারী, খুচরা কারবারি ও ক্রেতাদের মতামত গ্রহণ করা এবং যেসব ত্রুটি থাকে সেগুলি সংশোধন করা।

(vi) **অভ্যন্তরীণ ব্যয় হ্রাস করা** (Reduction of internal cost): উদ্যোগের উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে ব্যয় হ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে এবং এই ব্যয় হ্রাসের প্রক্রিয়ায় কর্মীদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এছাড়াও যাতে তারা স্বেচ্ছায় ব্যয় হ্রাসের জন্য চেষ্টা চালায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এটি সমস্যা নিরোধক একটি প্রয়াস।

(vi) **ঝুঁকিবহনের ভয়কে জয় করা** (Overcome the fear of risk-taking): উদ্যোক্তারা নতুন ধারণার উপর নির্ভর করে উদ্যোগ শুরু করে। এ-ধরনের কারবারের কোনো অতীত রেকর্ড থাকে না যাতে উদ্যোক্তা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা পেতে পারে। স্টার্ট-আপের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা অনিশ্চিত পথে অগ্রসর হয় এবং ঝুঁকি বহন করে। এই ঝুঁকিবহনের ভয়কে দূরে সরিয়ে না রাখতে পারলে উদ্যোক্তার পক্ষে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই সমস্যা সমাধানের একটি উপায় হল ঝুঁকিবহনের ভয়কে কোনোভাবেই মনে স্থান না দেওয়া। প্রবাদ আছে যে 'সাহসীরাই জয়ী হয়'।

(vii) **মজবুত কারবারি কৌশল তৈরি করা** (Formulate strong business strategy): কৌশল ছাড়া পরিবর্তন কেবলমাত্র পরিবর্তন, অগ্রগমন নয়। যে-কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমেই একটি মজবুত কৌশল তৈরি করতে হয়। অনেকে স্টার্ট-আপ সমস্যার ব্যবচ্ছেদ করতে চায় অথচ সমস্যার মধ্যে যে পরিবর্তন কৌশল থাকে তা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং ছোটো-বড়ো যে-কোনো ধরনের সমস্যার সমাধানে কৌশল অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

8.9 সারাংশ

এই এককটি পড়ে আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ জানতে পারলেন—

- নতুন উদ্যোগে সম্পর্কে ধারণা ও সংজ্ঞা

- নতুন উদ্যোগের আবাসস্থল ও উপযোগসমূহ
- নতুন উদ্যোগ শুরু করা হয় তখন উদ্যোগ সংক্রান্ত কার্য়কলাপ যাতে সাবলীল ভাবে চলতে পারে ও বিভিন্ন পক্ষের সাথে সুসম্পর্ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পক্ষের সাথে যে চুক্তি করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা
- নতুন উদ্যোগের অর্থ সংস্থান
- নতুন উদ্যোগের মৌলিক সমস্যাসমূহ ও সেগুলি সমাধানের উপায়

8.10 প্রশ্নাবলি

(ক) এম সি কিউ প্রশ্নাবলি :

1. নিম্নলিখিত কোনটি নতুন উদ্যোগ গঠনে প্রয়োজনীয়?

   (ক) জল (খ) বিদ্যুৎ

   (গ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা (ঘ) সবকটি

2. নিচের কোন্টি উদ্যোগের উপযোগিতা হিসাবে গণ্য হয় না?

   (ক) জল (খ) বিদ্যুৎ

   (গ) বন্দর (ঘ) পয়ঃপ্রণালী

3. একটি চুক্তি প্রথম থেকেই বাতিল বলে গণ্য হয় যদি চুক্তির কোনো পক্ষ—

   (ক) সাবালক হয় (খ) সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হন

   (গ) ওই ব্যক্তি আর্থিকভাবে সচ্ছল (ঘ) নাবালক

4. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চুক্তি কী ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়?

   (ক) লিখিত চুক্তি (খ) মৌখিক চুক্তি

   (গ) লিখিত ও নিবন্ধিত (ঘ) কোনোটি নয়

5. নীচে উল্লিখিত কোন্টি একটি স্টার্ট-আপের মৌলিক সমস্যা হিসাবে গণ্য হয় না?

   (ক) কারবারি মডেলের ব্যর্থতা (খ) ভালো কর্মী পাওয়ার সমস্যা

   (গ) দেবদূত লগ্নিকারী পাওয়ার সমস্যা (ঘ) প্রতিযোগিদের মোকাবিলা

উত্তর ঃ 1. (খ), 2. (খ), 3. (গ), 4. (গ), 5. (ক)।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

1. নতুন উদ্যোগের সংজ্ঞা দিন।
2. উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য যে স্থান নির্বাচন করতে হয় তার জন্য যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হয় তার মধ্যে দুটি উল্লেখ করুন।

3. প্রতাব ও স্বীকৃতি বলতে কী বোঝেন?
4. আইনসঙ্গত প্রতিদান কী?
5. নতুন উদ্যোগের দুটি মৌলিক সমস্যা সম্বন্ধে লিখুন।
6. নতুন উদ্যোগের সমস্যা সমাধানের দুটি উপায় সম্পর্কে লিখুন।

গ. দীর্ঘ প্রশ্নাবলি

1. নতুন উদ্যোগের অবস্থান নির্ধারণকারী বিষয়গুলি আলোচনা করুন।
2. নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে যেসব উপযোগ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি আলোচনা করুন।
3. উদ্যোগ ক্ষেত্রে চুক্তির অপরিহার্য উপদেশগুলি আলোচনা করুন।
4. নতুন উদ্যোগের মৌলিক সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করুন।
5. নতুন উদ্যোগের অর্থসংস্থানের মাধ্যম সম্পর্কে ধারণা দিন।
6. নতুন উদ্যোগের সমস্যা সমাধানের উপায়গুলি আলোচনা করুন।

NOTE

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

NOTE

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

NOTE

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....